বাংলার-বাইরে

[উপন্যাসের ছাঁচে-ঢালা
ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনী]

উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আর চ্যাটার্জ্জী
৯১ বি, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়**
১১, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট—লক্ষ্মী সেন

মুদ্রাকর—মিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫।৩এ, শম্ভু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম তিন টাকা

কৈফিয়ৎ

জীবনে ব্যর্থতার বোঝা স্কন্ধে চেপেছিলো! সর্ব্বরিক্ততার জ্বালায় নানাস্থানে শান্তির আশায় ছুটে বেড়িয়েছি—ওতেও যদি ঐ বোঝা নেবে গিয়ে আমাকে কিছুটা মুক্ত ক'রে দেয়! শক্তির স্ফূরণ যখন সবচেয়ে মূর্ত্ত হবার কথা তখনি আমার জীবনের গতি-পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়! শুকিয়ে-যাওয়া জীবনে রসের বাষ্পবিন্দুও হয়তো আর নেই! তাই ভাবি, অকালে জীবন যার জরাতুর, সন্ধ্যার প্রেতচ্ছায়া যাকে ঘিরে, তার ব'লবার মতো আর কী থাকৃতে পারে? তবে আজ যে আমার ইতিকাহিনীটুকু সকলের কাছে রেখে দেবার প্রয়াস পাচ্ছি তাতে দুঃখের অগ্নিদাহ যদি বা কিছু থাকে নিজে তা' ভোগ ক'রেও মনে মনে এক কণা মধু রাখ্‌তে পেরেছি—সে আমার ভালোবাসা। তবু সকলের প্রাণস্পন্দনের সাথে যেন ঠিক-ঠিক মিল্‌তে পারি নে!

তবে কি এক সুমধুর স্পর্শ এসে যেন আমাকে স্নিগ্ধ সম্ভাষণ জানিয়ে যায়! আমি তাতে সাড়া দিই! ব্যথিত বেদন সম্বল ক'রে দেশে-দেশে ঘুরে যা-কিছু দেখি, যা-কিছু শুনি, তাই সকলের মাঝে বিলিয়ে দেবার সাধ মনে জাগে! জীবন-প্রভাতের আনন্দোজ্জ্বল ছবিগুলিই বা এই সাথে সকলের সাম্‌নে তুলে ধ'রবার সুযোগ হারাই কেন? সত্যিকার দরদীর দরদ আমার এই ক্ষুদ্র ইতিকাহিনী সার্থক ও সফল করুক!

ছাপার ভুল ও সাহিত্যরসসৃষ্টির দিক দিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি তো আছেই! তা'ছাড়া, ভারতের কয়েকটিমাত্র স্থানে ঘুরেই ভ্রমণ-কাহিনী লেখার ও সাধারণ্যে তা' পরিবেষণ ক'রবার স্পর্দ্ধা—এটাও মার্জ্জনীয় নয় নিশ্চয়ই! মাঝে মাঝে হিন্দী-উচ্ছ্বাস—তাও ত্রুটিহীন নয়! তবে ভাষার ও কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যকে রূপায়িত ক'রে উপন্যাসের ছাঁচে ঢালবার এই যে প্রচেষ্টা এ'র সাফল্য-অসাফল্য পাঠকসমাজের বিচার্য্য বিষয়!

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

আমার যে কোনো লেখাই ছিলো তোমার কাছে
আনন্দের উৎস। তাই তোমাকেই
দিলাম। আমি জানি, তুমি
যেখানেই থাকো এ তোমার
কাছে পৌছবেই।

(১)

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের কথা! সব কথা আজ ভাল ক'রে মনেও পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, তখন আনন্দের অবধি ছিল না। জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায় ব'সে আমি সে-সব মনে মনে আবৃত্তি করি আর নিজের পুলক সৃষ্টি ক'রে তুলি।

জীবনের যবনিকা তুলে ধরি। প্রথমেই একটা চিত্র চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে—হাজারীবাগের নগণ্য পল্লী ডুমচাঁচ! সে তার দরিদ্র প্রাকৃতিক সম্ভার নিয়ে আমার কাছে অপরূপ বিচিত্র হ'য়ে দেখা দেয়।

এক ম্লান মেঘমেদুর সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনের বিজলী-আলোকের মাঝে টিকিট নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ি। রাধু—ছোট বেলার পড়ার ও খেলার সাথী—সেখানে অভ্রখনিতে চাকরী করে। দু'জনায় মিলে-মিশে নানা সুখ-দুঃখে কৈশোর অতিক্রম ক'রেছি। স্কুল-জীবনের পর আর সে পড়াশুনা করতে চাইলো না। চাকরীতে বহাল হ'লো। নিমন্ত্রণ ক'রেছে স্বল্প কথার লিপিতে। তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, একবার যেন তার সাথে মিলিত হ'য়ে দু'টো দিন কাটিয়ে আসি।

গাড়ীতে উঠে ব'স্‌তেই এক অদ্ভুত কোলাহল আমাকে অভিভূত ক'রে তুল্‌লো। নীচে সীট ও ফ্লোর থেকে ওপরে বাঙ্ক্‌ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আমার শঙ্কিত দৃষ্টি ফেলে সামান্য মাত্র ব'স্‌বার জায়গাও আবিষ্কার করতে পারলাম না। নিরবচ্ছিন্ন কোলাহল আমাকে যেন অসাড় ক'রে

দিতে লাগ্‌লো। এই ভিড়ের মাঝেই কেউ-কেউ নিজের ইচ্ছামতো দিব্যি হাত-পা ছড়াবার জায়গা ক'রে নিয়েছিলো। কী-নগ্ন স্বার্থপরতা! সন্ন্যাসীরাও ধর্ম্মচ্যুত হয় এরই প্ররোচনায়! আমি চিরদিনই নিজেকে বিরাট জনসমাজের ক্ষুদ্র দরদী ব'লে কল্পনা ক'রে এসেছি। অতি সহজেই খোলা অন্তর নিয়ে সাধারণের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু সেদিনের সেই গরম, কাম্‌রা-ভর্‌তি নোংরামি আর অবিরাম কোলাহলের মাঝে কী যে বিরক্তিতে মন ভ'রে গেলো তা' আর ব'ল্‌বার নয়। দরজার পাশেই বাঙ্কের শিকল ধ'রে দাঁড়িয়ে গাড়ী ছাড়বার প্রতীক্ষা ক'রছিলাম। গাড়ীর গতির সাথে সাথে বায়ুর প্রবাহ আরম্ভ হবে, তাতে আর কিছু না হোক অন্ততঃ দম্‌-আট্‌কানো ভ্যাপ্‌সা গরমটা ক'মে যাবে। সিটি দিয়ে গাড়ীটা হঠাৎ দুলে ফুসে চল্‌তে আরম্ভ করলো। আঃ বাঁচলাম!

আকাশে মেঘ জ'মে থম্‌থম্‌ করছিলো। একটু পরেই বর্ষণ স্বরু হ'লো। দীর্ঘ প্রত্যাশিত ধারা! শীকরকণা বাতাসে ভর ক'রে ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্নিগ্ধ ক'রে গেলো। বহুদিন এই বৃষ্টিকে নাব্‌তে দেখেছি, কিন্তু গাড়ীতে ব'সে শতাধিক লোকের দীর্ঘশ্বাসের মধ্য থেকে আড়ষ্টতা ভেঙে বাইরের এই চঞ্চলতা সত্যই অপরূপ হ'য়ে আবির্ভূত হ'লো! এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত-বিস্তারী বিদ্যুৎরেখায় বিরাট কৃষ্ণকালো আকাশ মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। নিস্তব্ধতা মথিত করে শুধু গাড়ীর উৎকট একটানা খট্‌খট্‌ ধ্বনি আর মেঘগর্জ্জন!

জীবনের চল্‌তি পথে আমার আনন্দ কুড়িয়ে নেবার বয়স। ব্যথা-বেদনা তখন তো উপেক্ষা ক'রে চলাই স্বাভাবিক কিন্তু নিয়ম যে কেমন ক'রে আকস্মিক অনিয়মের ঘায়ে পদচ্যুত হ'য়ে যায় তা' যেন সেই দিনই বুঝলাম। কাম্‌রা-ভর্‌তি যাত্রীদের মুখে নিদ্রাজড়িমা আর

গ্রীষ্মান্তের স্নিগ্ধ শীকরধৌত প্রশান্তি! কারোও চোখ সম্পূর্ণ বুঁজে গেছে, কেউ আধ-বোঁজা ক'রে হেলান-দেয়া অবস্থায় এক-একবার বাজের শব্দে চোখ মেলে জানালার বাইরে চেয়ে দেখে, আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে ঢ'লে পড়ে! ধীরে-ধীরে নিদ্রা এসে সকলকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়! শুধু আমি একা শুনি বাইরের ঝম্‌ঝম্‌ অবিশ্রান্ত রাগিনী! তখন জানালার ধারেই সামান্য একটু ব'সবার জায়গা পেয়েছি। তাই অক্লান্ত তৃপ্তিতে বাইরে চেয়ে থাকি! নতুন দেশের যাত্রী হ'য়ে চির-অভ্যস্ত ঘরমুখো জীবনকে ছেড়ে বাইরে চ'লেছি—ভেতরে-ভেতরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ছে।

জানিনা কখন আমি এই এলোমেলো পাগল-করা চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গভীর তন্দ্রার কবলে গিয়ে পড়ি। যখন আবার চোখ মেলে চেয়ে দেখি তখন গাড়ীর গতি অনড় আর ওঠা-নাবার ব্যস্ততা! কাম্‌রার যাত্রীরাও অনেকে জেগেছে। প্লাটফরমের ধারের বেঞ্চের সকল যাত্রী জানালা দিয়ে মাথা বের ক'রেছে। "এই পানওয়ালা", "এই পানিপাড়ে"—নানাদিক থেকে এই ধ্বনি! আমি রসনামধুর কিছু একটা কিন্‌বো ভাব্‌ছিলাম, এমন সময় "মিহিদানা, সীতাভোগ" রবটি আমার কাণে গেলো! লোকের ভিড়-করা মাথাগুলোর মাঝ দিয়ে হাত বের ক'রে মিষ্টিওয়ালাকে ডাকি। দুই রকম মিষ্টি নিয়ে এসে বসি নিজের জায়গায়। নাম দুটো সার্থক হ'য়েছে! রসনার ওপর থেকে মাধুর্য্য যেন অপস্থত না হয়—এমনি একটা ইচ্ছা আমার মাঝে জেগে উঠ্‌লো! দু' গেলাস জল খেলাম। স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তিতে সারা মন ভ'রে উঠ্‌লো।

গাড়ী আবার ছাড়লো। দুর্দ্দম উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে চ'ল্‌লো! ওপাশের দুটি সুস্থ, সবল বিহারী যুবক তুলসীদাসের দোঁহা গাইতে

আরম্ভ ক'রেছে। পান-বিড়ি খেয়ে লোকগুলো যেন প্রাণে শক্তি আর স্ফূর্ত্তি খুঁজে পেয়েছে। সকলেই এবার নানা গল্পে দীর্ঘ সময়ের নীরবতা ভেঙে পাল্লা দিয়ে চীৎকার ক'রছে! একে অপরের সাথে পরিচয়ে-নিষ্পরিচয়ে বেশ আলাপ জমিয়ে নিচ্ছে। আমার কাণ এসব কথার ওপর যেন ধীরে ধীরে বুঁজে এলো। চোখ দু'টো শুধু বিদ্যুতের আলোকে মাঝে-মাঝে আবিষ্কার করছিলো গাড়ীখানা অতিবেগে অনেকগুলো মেটে দেয়ালঘেরা খড়ো বাড়ীর পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে!

অকস্মাৎ আমার মনে পড়ে রাধুর কথা। সে আমাকে লিখেছে আগামী কাল যেন তার সাথে গিয়ে মিল্‌তে পারি। কতো আগ্রহ, কতো সম্ভাবনা নিয়েই না সে আমার প্রতীক্ষা করছে! এই বৃষ্টি কি তার দেশেও নাব্‌ছে না? আমার চিত্তে তখন এই স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই যেন ক্রীড়াশীল নয়! কেমন আবিষ্ট, তন্ময় হ'য়ে একের পর আর-এক ষ্টেশন পেরিয়ে গেলাম। কয় ঘণ্টা এমন ক'রে কেটেছিলো জানিনা—হঠাৎ একবার কার ডাক কানে যেতেই স্বপ্নালোক থেকে যেন বাস্তবে এসে উপস্থিত হ'লাম। লোকটি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণশ্রী যৌবনদৃপ্ত আকৃতি। মুখের একটা শান্ত পৌরুষ তাকে সেই বিজলী আলোর মাঝে পার্শ্ববর্ত্তী বুড়ো, প্রৌঢ় ঘুমন্ত লোকগুলোর তুলনায় কী যে মনোরম আর চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলেছিলো তা' ব্যক্ত করি কি ক'রে? কখন যে যাত্রীরা পারিবারিক পরিচয়ের উৎসাহ থেকে স্খলিত হ'য়েছে আমি জান্‌তেও পারিনি। এমন সময় আকস্মিক মুখোমুখি এই যুবকের আহ্বান! তাই আমাকে যেন একটু চকিত ক'রে তুল্‌লো। তার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'তেই শুন্‌লাম, সে ব'ল্‌ছে—"বাবুজী, আপ্ কাঁহা জায়েঙ্গে? আপ্‌কো মুলুক কাঁহা?" তার

কৌতূহল সম্ভবতঃ বস্‌বার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার বিরক্তি দমন ক'রবার জন্যই উচ্চকিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। তার কথাগুলো কণ্ঠের কেমন একটা মাধুর্য্যে যেন তার প্রশ্নের বিরক্তিকে ক্ষীণ ক'রে তুল্‌ছিলো। আমি আকৃষ্ট হ'য়েই তার সাথে আলাপ ক'রলাম। নানা কথায় জান্‌লাম—ঐ যুবকের আর আমার গন্তব্য স্থান একই। কথাটা জেনে কতোকটা আশ্বস্ত হ'লাম। এই ধারাবর্ষণের রাত্রিতে এক অখ্যাত, অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা আমাকে ভেতরে-ভেতরে বেশ শঙ্কিত ক'রেই তুল্‌ছিলো!

যুবকের সাথে আলাপে জান্‌লাম কোডরমা ষ্টেশন থেকে মেটে রাস্তায় বেশ কিছুটা গিয়ে তবে ডুমচাঁচ। ষ্টেশন থেকে আরম্ভ ক'রে ডুমচাঁচের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলো ছোটো-ছোটো পাহাড়ে আর ঘন বনজঙ্গলে ভর্‌তি। রাত্রি বেশী হ'লেই পাহাড় ও বন থেকে ভালুক নেবে আসে। ঐ যুবক ষ্টেশনে শুয়ে থাক্‌বে, তারপর ভোরে ডুমচাঁচের দিকে রওনা হবে। বাবু-লোকদের জন্য লরীর ব্যবস্থা আছে। চোদ্দ মাইল পথ হাঁটা আমাদের মতো বাবুদের পোষায় না। কাজেই জড় জীবনে জড় মাল-পত্রের মতো লরী ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই! রাত্রিতে আমারও ষ্টেশনে একটা থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ও তো নির্বিকারচিত্তে বাইরে শুইয়ে কাটিয়ে দেবে! কিন্তু আমার যে কী গতি হবে তা' এক নারায়নই জানেন! ঠাকুর-দেবতারা বিপদের সময় দিব্বি সম্মান পেয়ে থাকেন। তাই বুঝি সম্পদের চেয়ে আমাদের জীবনে বিপদের মাত্রাই বেশী দিয়ে তাঁদের ভোগের বাহুল্য বাড়িয়েছেন! আমি তো ভালুকের আশঙ্কায় রীতিমতো ঘাব্‌ড়ে গেলাম! শুনেছি কোন্ দুই বন্ধুর একজন মৃতবৎ কুম্ভক ক'রে ভালুকের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলো—তার না জানি তৈলিঙ্গি বাবার কাছে কতো যোগশিক্ষাই ঘ'টেছিলো—আর আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়েও ন্যাস-প্রাণায়াম, পূরক-কুম্ভক দূরে থাক্, হয়তো

গায়ত্রী পর্য্যন্ত ভুলে ব'সে আছি! সুতরাং আমার অবস্থা? কথায়-কথায় জেনে নিলাম ষ্টেশনের ধারেই বাঙালী বাবুদের বাসা। মোটরলরী সার্ভিসের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙালী আর তাঁরা আড্ডা গেড়েছেন ষ্টেশনের কাছেই। একবার ভাব্‌লাম, আমি ক'ল্‌কাতা থেকে সদ্য-সমাগত বাঙালী ও তাঁরাও আমার স্বদেশবাসী! হয়তো আমাকে পেয়ে তাঁরা বেশ একটু পুলকিত হবেন। আবার বিপরীত চিন্তাও মাঝে-মাঝে অস্বস্তির সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ছিলো। এই সব এলোমেলো চিন্তা ক'রে ক'রে সময় কাট্‌ছিলো। দাঁড়ানো সঙ্গীটিও দেখ্‌ছিলাম কেমন অন্যমনস্কভাবে কুঁজো হ'য়ে দরজার ওপরকার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আকাশের বিদ্যুৎক্রীড়া দেখ্‌ছিলো। কিছুক্ষণ পরেই ব'ল্‌লো,—"বাবুজী, বহুত্‌ জোরোসে পানি আ রহা হৈ।" আকাশের অবস্থা যে এতো দূরেও অপ্রসন্ন থাক্‌বে তা' আমি আশা করি নাই।

রাত্রি তখন রেলের এগারোটা। আমরা দু'জন কোডরমা ষ্টেশনে নাব্‌লাম। আমার চামড়ার সুটকেশটি নবীন সঙ্গী স্বেচ্ছায় বহন ক'রে ষ্টেশন ঘরে গিয়ে উঠ্‌লো। পরে ওটাকে ওরই কাছে জিম্মা ক'রে দিয়ে আমি চট্‌পট্‌ বাঙালী বাবুদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হ'লাম। আমি যখন তাঁদের শীর্ষস্থানীয়দের কাছে আমার আসন্ন দুর্গতির কথা বেশ ফলাও ক'রে ব'ল্লাম তখন তাঁরা ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বেশ নীরস স্বরে তাঁদের আতিথেয়তার অসামর্থ্য জানিয়ে আমাকে বিদায় ক'রলেন! এতে অবশ্য আমার কোন অসম্মান হ'লো ব'লে আমি ভাব্‌তে পারলাম না! বরং গাড়ীতে ব'সে যে স্বপ্নমধুর বন্ধুত্বের সম্ভাবনা এঁদের ঘিরে রচনা ক'রছিলাম তা' যে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেলো এ আমার পক্ষে বড়ই বেদনাকর মনে হ'লো! আমার দেশবাসী এরা; এঁদের ভদ্রতা, এঁদের হৃদ্যতা—সব কিছু যেন আমার

জাতির অন্তঃপ্রকৃতির একটা বিশেষ ঐশ্বর্য্য। আজ রাত্রিতে তাঁরা সেই ঐশ্বর্য্যবঞ্চিত হ'য়ে যেন আমার জাতীয় গৌরব-বোধকেই হীন ক'রে দিলেন! আমি খেতে চাইনি, শয্যা চাইনি, শুধু আবরণের তলে, গৃহের মাঝে আমার নবাগত অসহায় অবস্থায় ভালুকের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটু বিশ্রামস্থল যাচ্ঞা ক'রেছিলাম। এঁরা তাও দিতে পারলেন না! নৈরাশ্য নিয়ে ষ্টেশনে ফিরে এলাম। এসে সঙ্গী যুবককে দুর্ভাগ্য জানিয়ে তার পাশেই রাত্রিবাসের ইচ্ছা জানালাম। সে যেন কেমন সঙ্কুচিত, সন্দেহভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার ঝক্‌ঝকে ধুতি-পাঞ্জাবীর দিকে তাকিয়ে রইলো। পরক্ষণেই ব'ল্‌লো,—"ইয় ক্যায়সে হো সক্‌তা হৈ, বাবুজী! আপ্‌ ইত্‌না তক্‌লিফ্‌ বর্‌দাস্ত্‌ নহী কর্‌ সকোগে।" সে আমাকে জানালো, ষ্টেশনের ছোটোবাবু তার দেশের, আর খুব দরদী 'সাচ্চা আদ্‌মী'। তাঁর কাছে আমার অবস্থা জানিয়ে আমার ব্যবস্থা ক'রবার কথা ব'ল্‌লো। সে ষ্টেশন ঘরে—যেখানে মাষ্টারজী থাকেন সেখানে—গিয়ে হাজির হ'লো। তার কৃতকার্য্যতায় আমি সন্দিহান ছিলাম। সে কি ব'ল্‌লো, কি ক'রলো, তা' আমি জান্‌তে পেলাম না। তবে পরক্ষণেই সে এসে তার সাফল্য জানিয়ে আমাকে নিয়ে মাষ্টারজীর কাছে যখন হাজির ক'রলো তখন তো আমি অবাক্‌! মাষ্টারজী তাঁর হৃদ্য ব্যবহারে আমাকে মুগ্ধ করলেন। তিনি ব'ল্‌লেন,—"আপ্‌ ইধর নয়ে আয়ে হৈ, বাবুজী। হিঁয়া তো ভালুওকা বহুত্‌ ডর হৈ। বাহর্‌ শোনা আপ্‌কো আদত্‌ নহী হৈ। আপ্‌কো সোনেকো লিয়ে First-Second Class মুসাফিরখানামে ইন্তজাম কর্‌ দিয়া। আপ্‌ মেরা মেহমান্‌ হৈ। হমারা তো কুছ্‌ হৈ নহী। দো-চার রোটী আপ্‌কো লিয়ে ভেজ দেঙ্গা।" আমি তো অতি বিস্ময়ে আমার সঙ্গীর দিকে

তাকিয়ে রইলাম। তার মুখ সাফল্যগর্ব্বে প্রসন্ন! আমি আনন্দে অভিভূত হ'য়ে মাষ্টারজীর হাত ধ'রে ব'ল্‌লাম, "মাষ্টারজী, আপ্‌কো মেহেরবানীসে বহুত্‌ হি কায়দা হুয়া হৈ। যহ্‌ কায়দা হম্‌ কহ নহী সক্‌তে। আপ যো মেহেরবাণী কর্‌ মুঝে ঠহরনে দিয়া যহ্‌ই কাফি হৈ। খানেকা সোচ্‌ ন করিয়ে।" তারপরে মাষ্টারজী আমাকে নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চ দেখিয়ে, আলো কমিয়ে, একটা ঘটি আর জলের কল দেখিয়ে দিলেন। আমি মুখ-হাত ধুয়ে বেশ সুস্থ হ'য়ে দোকান থেকে খান-কয়েক পুরী আর কিছু মিষ্টি কিনে আন্‌লাম। মাষ্টারজীকে কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিলাম। ওদিকে মাষ্টারজী এসে সবিনয়ে আমাকে ব'ল্‌লেন,—"বাবুজী, অগর আপ্‌মেরা স্ত্রীকী বনায়াহুয়া রোটী, সাগ ঔর চট্‌নী লিজিয়ে তো মৈ লাঁউ।" অগত্যা বিনিময় হ'লো। আমার পুরীর সবটাই আমার সঙ্গীকে দিলাম। সেই ঘি-রুটি সত্যিই অতি উপাদেয়! চাট্‌নীও চমৎকার! তরকারী আমাদের মতো নয়, কিন্তু যে-একটা আগ্রহ ও দরদ এই আহার্য্যের মাঝে ছিলো, তা' আমার স্বাদবোধের বাহুল্যকে পরাস্ত ক'রে কেমন একটা গভীর আনন্দে আমাকে ভ'রে তুল্‌ছিলো! দোষগুণ বিচার যেন অবান্তর! স্বদেশীলাঞ্ছিত ভাগ্যে যে বিদেশী অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় ধন্য হ'য়েছিলাম—সে স্মৃতি আমার চিরজাগরূক থাকবে।

মৃদু আলোকিত ওয়েটিংরুমের বেঞ্চের ওপর সতরঞ্চখানা পেতে শয্যা বিছিয়ে রাত্রের মতো শুয়ে প'ড়লাম। নতুন জায়গার একটা অদ্ভুত প্রভাব আমাদের স্নায়ুর ওপর! অপরিচিত পরিবেশের মাঝে ঘুম যেন আস্‌তে চায় না! আগামী দিনের সহস্র চিন্তা এসে মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তুল্‌ছিলো। কখন রওনা হবো, সকাল কয়টায় পৌঁছে যাবো,—সব কিছু প্রশ্ন যেন ভিড় ক'রে আস্‌তে লাগ্‌লো। ওপরে মৃদু

আলোকিত ল্যাম্প্‌টার চারিপাশে মেঘলা দিনের তাড়নায় পতঙ্গগুলো তাদের গর্ত্ত আর শুক্‌নো পাতার তলের আবাস ত্যাগ ক'রে ঘুরে-ঘুরে উড়ে-উড়ে উষ্ণতার স্পর্শে কুঁক্‌ড়ে প্রাণহীন হ'য়ে নীচে ঝ'রে প'ড়ছিলো। বেঞ্চটা ছিলো ঠিক নীচেই। শুয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে ক'রলাম না। মরা পোকার অনেকগুলো বেশ বিষাক্তও হ'তে পারে। তাই উঠে বেঞ্চটাকে দূরে ঘরটার পাশের দিকে টেনে নিলাম। তারপর আবার যখন ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলাম তখন চোখ যেন স্বচ্ছন্দে বুঁজে আস্‌তে লাগ্‌লো। যখন ঘুম ভাঙ্‌লো তখন দেখি বাইরে লোকের ছুটোছুটি আর জানালা দিয়ে দিনের আলো এসে ল্যাম্পের মৃদু আলোকে ক্ষীণতর ক'রে দিয়েছে। ভোরের দিকে বেশ সুখকর, শৃঙ্খলাহীন কতো স্বপ্নই যে দেখ্‌ছিলাম তা' আর মনে ক'রতে পারলাম না। কিন্তু মধুর তৃপ্তিকর একটা আমেজ যেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলোকে সজীব ক'রে তুলেছে। উঠে ব'সে সতরঞ্চটাকে গুটিয়ে আবার সুটকেশবন্দী ক'রে ওটাকে হাতে ক'রে বাইরে এসে দেখি আমার সেই সঙ্গী যুবকটি উঠে ষ্টেশনের সদ্য-আসা গাড়ীটির দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তার পিঠে হাত দিতেই ও আমার দিকে ফিরে চাইলো। চট্‌ ক'রে আমার হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে সে ব'ল্‌লো,—"জাইয়ে বাবুজী, আপ্‌কো লরী ছোড়নেকো বখ্‌ত্‌ হুয়া। আপ্‌ গুছল কর্‌ লিজিয়ে।" আমি ওধারের কলে মুখ-হাত ধুয়ে লরী-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চ'ল্‌লাম। শত আপত্তি সত্ত্বেও যুবকটি আমার সুটকেশ ব'য়ে নিয়ে চল্‌লো। লরীষ্ট্যাণ্ডে গত রাত্রের অনেক বাবুকেই চিন্‌তে পারলাম। আমি তাদের দিকে যেন লজ্জায় চাইতে পারছিলাম না। সৌহার্দ্দের যে প্রত্যাশা ক'রেছিলাম তার বিফলতায় চিত্তে যে এমন বেদনাকর গ্লানি আস্‌বে তা' বুঝতেও পারি নি। যাত্রী-লরীটায় চেপে

ব'স্লাম। ষ্টেশন থেকে আস্বার সময় মাষ্টারজীকে আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আবার শীগ্‌গীরই দেখা হবে ব'লে রওনা হ'য়েছিলাম। এবার লরীতে উঠে সঙ্গীকে আমার গন্তব্য স্থানের ঠিকানা আর হাতে একটা সিকি—মিষ্টি খাবার নাম ক'রে—দিয়ে বিদায় নিলাম। লরী ছেড়ে দিলো।

এই লরীযাত্রার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কখনো ভুল্‌বো না। মালপত্রও লরীতে সাজিয়ে রাখার মতো সুবুদ্ধি দেখা যায়, কিন্তু মানুষ যে মালপত্র না হ'য়েও তার চেয়ে খারাপভাবে গাদাগাদি, ঠেলাঠেলি ক'রে চল্‌তে পারে—বোধ হয় এ সত্যটা নিজের জীবনে না এলে বিশ্বাসই ক'রতাম না। এই নিদারুণ শারীরিক যাতনায় আর পাশের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর যাত্রীদের অবিরাম চীৎকারে একটা মানসিক বিরক্তি মেঘহীন প্রভাতকেও যেন বিস্বাদ ক'রে দিলো। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যেও দূরস্থ পাহাড়গুলোর সাথে আমার আকস্মিক পরিচয় আমাকে যে কী ভাবেই শিহরিত ক'রে তুল্‌লো তা' বল্‌তে পারি না! সারা মন বিপুল বিস্ময়ে পাহাড়গুলোর গভীর সৌন্দর্য্যে ডুবে গেলো! আস্তে-আস্তে অনুচ্চ পাহাড়গুলোর অতি নিকট দিয়েই আমার যাত্রাপথ চ'লে গেছে ব'লে মনে ক'রতে লাগ্‌লাম। কোনো-কোনো পাহাড় একেবারে নিরাভরণ—একটা ছোটো গাছ কি তৃণচিহ্নও তার বুকে নাই। আবার কোনোটি অজস্র ছোটো-ছোটো তরুমালায় নিজেকে সজ্জিত ক'রে যেন হাস্‌ছে! আমার ইচ্ছে হ'লো, এই লরী ছেড়ে ওই পাহাড়গুলো অতিক্রম ক'রে ছুটে চলি। আঃ, কি কাছ দিয়েই না পাহাড়টা বেরিয়ে গেলো! ওর ঠিক শীর্ষদেশে বহু পল্লবশোভিত শালজাতীয় কী রকম ঝাঁকড়া ডালওয়ালা গাছটা দাঁড়িয়ে! ওর ছায়ায় ব'সে যদি চারিদিকের অভ্রখচিত ঝক্‌মকে মাঠটার পানে চেয়ে ব'সে থাকা যায়,

তা হ'লে কেমন হয়? অভ্রগুলো যেন জ্বল্‌ছে! নীল আকাশের আরসি হ'য়ে এরা কতো যুগ-যুগান্ত ধ'রে প'ড়ে আছে কে জানে? সূর্য্যের আলো-পড়া মাত্রই তাকে যেন অভ্রগুলো হেসে ফিরিয়ে দেয়! পথের পাশে মাটির দেয়াল-ঘেরা অনেক বাড়ী তাদের ফুট্‌ফুটে আঙিনা, পেঁপে গাছ, আরো নানা আবশ্যক-অনাবশ্যক গাছ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে থাকে। কখনো দেখি, উঠোনে স্বাস্থ্যবতী কৃষ্ণা গৃহস্থ বধূরা তাদের সরল দৃষ্টি নিয়ে আমাদের ছুটে-চলা মানুষভর্‌তি যানখানিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছে। গৃহগুলি থেকে মাঝে মাঝে চঞ্চল দিগম্বর ছোটোছোটো ছেলে-মেয়ের দল ছুটে আসে। কেউ-কেউ ছুটে আসে গাড়ীর পেছনে-পেছনে। ধূলো-বালি উড়ে গিয়ে তাদের ঢেকে দেয়। সাবধানী যাত্রীরা ধাবনরতদের হুসিয়ার করে!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডুমর্‌চাচে এসে পৌঁছলাম। যা' মনে ক'রেছিলাম—লরী ষ্ট্যাণ্ডের কাছেই রাধু দাঁড়িয়ে ছিলো! আমার হাত থেকে সুটকেশটা মাটিতে নাবিয়ে দিয়ে আমার দিকে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিলো। আমিও ওর হাতের ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে প'ড়লাম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে রাধু হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো,—"আচ্ছা ভেজু, মা'র মৃত্যু-সংবাদটাও কি দিতে নেই? তোর কাছে আমার অপরাধ কি এতোই বেশী?" রাধুর গলাটা এমন ভারী এবং আবেগ এতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে এলো যে তার কথার স্রোত বন্ধ হ'য়ে গেলো। প্রথমের সানন্দ আরম্ভ আর পরের সখেদ উক্তি আমাকেও যেন বিমর্ষ ক'রে দিলো। জবাব দেবার মতো আমার কিছুই ছিলো না। আমার মা'র মৃত্যু-সংবাদ তাকে দেয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিলো। সুতরাং তা' না দেয়ার ত্রুটি আমার মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। তাই চুপ ক'রেই রইলাম।

লাল সুরকীর ক্ষীণ ছোটো পথটি যেখানে শেষ হ'য়ে কালো পাথরের খোয়া-দেয়া আর একটি বড়ো সড়ক আরম্ভ হ'লো সেখানেই রাধুর ছোটো সুন্দর বাসাটি। চারিদিকের সীমাহারা মাঠের মাঝে ঘরগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ দেখে মনে হচ্ছিলো এক ঝাঁক পায়রা যেন শ্বেতপক্ষ মেলে উড়ে-উড়ে এসে ব'সেছে এই অভ্র-লোকে! চারিদিকে অভ্রের শ্বেত কঠিন হাসি চোখকে যেন আঘাত ক'রছিলো। ঘরের সিঁড়ির ধাপ দু'টো পেরিয়ে বারাণ্ডায় উঠেই দেখি, বন্ধুপত্নী তাঁর নিপুণ হস্তে বিশ্রামের আয়োজন পূর্ণ ক'রে রেখেছেন। একটা মিহি মাদুর লোহার খাটটার ওপর বিছিয়ে একটা বালিশ ও একখানা পাখা রেখেছেন। খাটের বাঁ পাশের কোণার দিকে বাল্‌তি-ভরা জল, একটা ঝক্‌ঝকে মাজা ঘটি আর পরিষ্কার একখানা তোয়ালে। আমি হাত-পা ধুয়ে ব'স্‌লাম। পাখা চালিয়ে গায়ে-জমা ঘাম শুকিয়ে ভিজে তোয়ালে দিয়ে যখন সারা শরীরটা মুছে নিলাম তখন সমস্ত ক্লান্তি যেন উবে গেলো। আর-একটু বাতাস ক'রতেই স্নিগ্ধ সঞ্জীব অনুভূতিতে মন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো।

* * * *

যে-দু' তিন দিন রাধুর ওখানে ছিলাম বেশ আনন্দেই কেটে গেলো। ওখানকার আদি বাসীন্দাদের সরল, অনাড়ম্বর জীবনধারা ও তাদের নৃত্যগীতির উৎসব আমাকে যে কী ভাবে অভিভূত ক'রে রেখেছিলো তা' ভুল্‌বার নয়। যাবার দিন লরীর ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে রাধু ব'ল্‌লো,—"ভাই, তোর যাবার মুখে আবার বেসুরো সেই কথাটা তুল্‌ছি! তুই কিন্তু ক'ল্‌কাতা ফিরেই একবার চেষ্টা করবি ব্যবসা আরম্ভ ক'রবার। ছোটো স্কেলে দোকান একটা খোলা যাক্‌, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ানো যাবে। তোকে আবারো ব'ল্‌ছি—সামান্য

টাকা আমি জমিয়েছি। ওতে আরম্ভ ক'রতে কষ্ট হবে না।" রাধু সুযোগ পেলেই এই ব্যবসার আলোচনা করে। আমি ব'ল্‌লাম,—"রাধু, তুই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারিস্‌। আমি তো জানিসই চিরকালটা ব্যবসা ক'রতে চেয়েছি! ব্যবসার মাঝে আমার কল্পনা যেন খুলে যায়! কতো দূর-দুরান্তরের পণ্যসম্ভার আমার দোকানে আস্‌বে, কতো সহস্র লোকের সাথে আমার নিত্য পরিচয় হবে! দাসত্বহীন অবশ্যম্ভাবী অর্থভাগ্যে নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে যাবে! শত শত লোকের মুখে অন্নগ্রাস পড়বে! রাধু, তুই তো জানিস্‌ আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সাধ ব্যবসা ক'রে জীবনের বৃদ্ধি-ঋদ্ধি ডেকে আন্‌বো!"

রাধু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লো, "দোহাই, ভেজু, তোর কবিত্বের কণ্ঠ রোধ কর্‌। ব্যবসার মাঝে আছে নীরস হিসেব, তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি, উটের মতো মরু-অভিযানের নিরাতঙ্ক সামর্থ্য, মেড়োয়ারিদের মতো অলস কর্ম্মঠতা আর অনাড়ম্বর জীবন। এই ধর্ম্মের মাঝে যদি কাব্যকে বসিয়ে দিস্‌ তবেই হ'য়েছে! কল্পনাকে নিরস্ত ক'রেদে। কঠোর অধ্যবসায় ও অসীম ধৈর্য্যই হ'লো ব্যবসার মর্ম্মকথা।" এ কথার উত্তর দেবার আর সময় হ'লো না। লরী এসে গেলো! যোগস্নানে গঙ্গার ঘাটের ভিড়ের একাংশ যেন গাড়ীটা উঠিয়ে নিয়ে এসেছে! বিরস অস্বস্তিতে সারা মন ভ'রে গেলো। গাড়ীর কন্‌ডাক্‌টারের সহায়তায়, রাধুর ধমকে আর কিছু বেশী ভাড়া দিয়ে দাঁড়াবার মতো একটু জায়গা ক'রে নিলাম। রাধু একবার আমার হাতটা ধ'রেই নেবে গেলো। একবার নীচে নেবে মাথা নত ক'রেই যেন চোখের জল গোপন করলো। লরী ছেড়ে দিতেই আমি হাত নেড়ে নেড়ে আমার বিদায় শুভেচ্ছা জানিয়ে চ'ল্‌লাম। যতক্ষণ আমার গাড়ী দেখা যায় রাধু দাঁড়িয়ে রইলো।

গাড়ীতে উঠে আমি ভাবতে লাগলাম—ব্যবসার কথা। আমার নিজের নেই এক কপর্দ্দকও! রাধুও তার সামান্য আয় থেকে যে বিশেষ কিছু বাঁচাতে পেরেছে তা'ও আমার মনে হ'লো না! ক'ল্‌কাতায় ব্যবসা আরম্ভ ক'রতে বেশ কিছু অগ্রিম টাকার দরকার। রাধুকে কথা দিয়েছি, ক'ল্‌কাতা ফিরেই একটা ব্যবস্থা করবো। কিন্তু সফলতা যে সত্যিই সম্ভব তা' যেন এই জনবহুল গাড়ীর মধ্যে দাঁড়িয়ে অস্থির মস্তিষ্ক নিয়ে ভাবতে পারি নে!

(২)

ষ্টেশনে এসে দেখি এক পাশে ধুতি-চাদরপরা নিরীহ প্রশান্ত মূর্ত্তি এক বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর চামড়ার স্যুটকেশের ওপর চেপে ব'সে সিগারেট টান্‌ছেন। পায়ের কাছে ঘটি-বাঁধা ছোটো বিছানাটি। বেশ নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে সিগারেট টেনে চ'লেছেন! দূরে ঐ অভ্রভরা মাঠগুলিতে রৌদ্রের সুদীপ্ত কিরণে যেখানে শিখা-জ্বলার মতো কম্পিত আলোক-প্রতিফলন চল্‌ছিলো—তাঁর দৃষ্টি সম্ভবতঃ তাতেই নিবদ্ধ। আমি তাঁর তন্ময় ভাবটুকুকে কথা ব'লে ভেঙে দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। অন্যমনস্কভাবে এদিক্-ওদিক্ ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ 'ও মশাই' ক্যানে যেতেই ফিরে দেখি, ভদ্রলোক হাত নেড়ে আমাকে ডাকছেন। আমি কাছে যেতেই বিছানাটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বল্‌লেন, "বসুন, কথাবার্ত্তা বলা যাক্। কী! কল্‌কাতায় চল্‌ছেন তো?" আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নিজের স্যুট্‌কেশটা টেনে কাছে এনে ভদ্রলোকের প্রদত্ত আসনে চেপে ব'স্‌লাম। হেসে বল্‌লাম "গল্প ক'রবার লোভটা আমার আপনাকে দেখেই হ'য়েছিলো! দেখ্‌লাম আপনি একেবারে সমাধিতে তলিয়ে গেছেন! কি জানি, আবার অপরাধ-টপরাধ নিতে পারেন ভেবে আর আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস পেলাম না!" আমার কথায় ভদ্রলোক একেবারে হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। সে কী প্রাণখোলা হাসি! তাঁর স্বচ্ছ মনের আলো যেন হাসির সাথে ঠিক্‌রে বেরিয়ে এলো! বল্‌লেন, "ওরে বাস্‌রে, আমার যারা একেবারে অতি নীচের কর্ম্মচারী তারাও আমাকে কখনো এমন ভয় করে না! আপনি অপরিচিত দেশবাসী!

এখানে আর কোনো বাঙালী নেই, তাতে আমাকে ডাকতে ভয় পেলেন? যাক্, আমার একটা সান্ত্বনা রইলো, জীবনে মানুষ আমাকেও ভয় করে!"

গাড়ী আস্‌তেই কাড়াকাড়ি ক'রে আমাদের সামান্য জিনিষপত্র একটা ইন্‌টার ক্লাস কাম্‌রায় তুলে ফেল্‌লাম। আসার সময়কার ভিড়ের যাতনা আমার মনে ছিলো। সেই সব স্মৃতিই এবার পয়সার মায়া অতিক্রম ক'রেছিলো। গাড়ীতে বিশেষ ভিড় ছিলো না। আমরা দু'জনায় দু'টি বেঞ্চ অধিকার ক'রে বস্‌লাম। ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্ হ'য়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস্ করলেন, "আচ্ছা, বলুন তো মশাই, আমার বয়স কতো?" এ প্রশ্ন যেমন আকস্মিক তেমনি সঙ্গতিহীন। আমি অবাক্ হ'য়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। ভাব্‌লাম, ভদ্রলোকের মনে আবার কোনো গভীর ভাব হয়তো দোলা দিচ্ছে। তাই তাঁর কথার উত্তরে ব'ল্‌লাম—"কতো আর হবে! এই ধরুণ, পঁয়তাল্লিশ বৎসর!" 'হো-হো'—আবার সেই প্রাণখোলা উন্মত্ত ঝরণা-ধারার মতো হাসি! বল্‌লেন, "এই রে! আমাকে একেবারে কচি খোকা বানিয়ে দিলেন! গিন্নী তাই তো বলেন, 'তুমি আর-একটা বিয়ে কর, আমি বুড়িয়ে গেছি!' আমি যতো বলি, আমার বয়স হ'লো পঁয়ষট্টি আর তোমার বয়স হ'লো সাতান্ন—এ বয়সে আমরা যদি না বুড়িয়ে যাই তো বুড়িয়ে যাবার অধিকার আর কার আছে শুনি? আমি বলি, তুমি আমায় যে যত্ন কর তাতে কি আর আমার বুড়ো হবার যো আছে? মশাই বিয়ে ক'রেছেন? ও! করেন নি! চেহারার উড়ু-উড়ু ভাব দেখেই বুঝ্‌ছি, গিন্নী এখনো আসেন নি! বিয়ে করুন, বিয়ে ক'রে ফেলুন! প্রাণের সতেজ মধুর ভাব যদি তরুণ ক'রে রাখ্‌তে

চান, মশাই, তবে লক্ষ্মী ছেলের মতো একটি বৌ ঘরে আনুন! দেখ্‌বেন কী প্রাণপাত সেবা ক'রে আপনার শরীরের গ্লানি, মনের ক্ষোভ সব কিছু মুছে দেবে। যৌবন থাক্‌বে না, মশাই? রোজ ঘুম থেকে উঠে নিজে হাতে খাবার ক'রে দেবে! দুপুরে পাখা-হাতে ব'সে যতো রাজ্যের পুষ্টিকর আর স্বাস্থ্যকর খাবার গিলিয়ে ছাড়বে! দুপুর বেলায় নিশ্চিন্তে ঘুমোবার তাগিদে অস্থির ক'রবে! বৈকালে ডেকে আবার জলখাবার খাইয়ে বাইরে বেড়িয়ে আস্‌তে ব'ল্‌বে! রাত্রে লঘুপাক অথচ বলকারক খাবার খাইয়ে, চুলের মাঝে আঙ্গুল বুলিয়ে পাখা ক'রে, পা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দেবে!" এই সানন্দ অভিব্যক্তির উচ্ছ্বাস কিন্তু তাঁর কণ্ঠে বেশীক্ষণ রইলো না। হঠাৎ যেন সুর খাদে নেবে এলো—"এতো সব তৃপ্তির সুযোগ হারাবেন না, মশাই। এই জীবনে সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধ'রে গিন্নীর সেবাযত্নে বড় সুখেই দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু আজ ফিরে যাবার বেলায় কেবলই মনে হয়—আর যেন আমার শেষ যাত্রার বিলম্ব নেই!"

তারপর এলো পরিচয়ের পালা। তাঁর নাম বিশেষ পরিচিত নয়, কেন না নামের জন্য তিনি কখনো লালায়িত হন নি। তবে অনেক বিদ্যালয় ও সাধারণ প্রতিষ্ঠান তাঁর দান পেয়েছে অনেক অজুহাতে। বাড়ী একখানা ক'ল্‌কাতায় ক'রেছেন বটে, কিন্তু তাঁর জন্মভিটে যে পাড়াগাঁয়ে তার সর্ব্বপ্রকার উন্নয়নের চেষ্টা ক'রতে তিনি কসুর করেন নি। খুঁটিনাটি ক'রে আমার পরিচয়ও নিলেন। তারপর কথায়-কথায় এক সময় জানালেন ক'ল্‌কাতার নিকটে কোনো একটা বিদ্যালয়ে তাঁর বিশেষ হাত আছে। সেখানে একজন প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন। তিনি প্রস্তাব ক'রলেন ঐ পদটি আমার কেমন মনে হয়। আমি আমার বেকার জীবন ঘোচাতে গররাজী হবো—এ যে মানবধর্ম্মের বিরোধিতা!

আমি সানন্দে আমার অনুকূল মত জানিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক বিদ্যালয়ের মাঝ দিয়ে নতুন যুগের মানুষ সৃষ্টির এক চমৎকার চিত্র কথার রঙে ফুটিয়ে তুল্‌লেন। আমার জীবনে আমি তো কতো বুড়ো মানুষ দেখেছি—তাদের প্রাণের সন্ধ্যার নিবিড় বিশ্রামের ঝিমুনি আমাকে যেন গ্লানি এনে দিয়েছে—তাদের সাহচর্য্য এমন কোনো বিশেষ কল্পনা বা বিশেষ অনুভূতি ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেনি যাতে আমার যৌবন পরিতৃপ্তি পেতে পারে। চঞ্চলের সাথে স্থবিরের যোগ কদাচ ঘ'টে থাকে! কিন্তু আজ এই বর্ষীয়ানের প্রাণে বিশ্বের ব্যথাময়তা কেমন ক'রে যেন নতুন বন্যার সৃষ্টি ক'রেছে! দীর্ঘ দিনের জ'মে ওঠা ঔদাসীন্য, বিরক্তি, অনাসক্তি—সব কিছু যেন ভাসিয়ে নিয়ে দু'ধারে এমন পলি ঢেলে দিয়েছে যাতে নতুন ধারণা, নতুন ভাব ও নতুন আদর্শের ফসল ফ'লেছে। তিনি আমাকে যে ভরসার কথা জানিয়ে দিয়েছেন আমি তাতে খুবই উৎসাহিত হ'য়ে উঠলাম। বিদ্যালয়টির সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ক'রতে লাগ্‌লাম। ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী নয়। তবে বাংলার দু'চারজন মনীষী তাঁদের জীবনযাত্রার প্রাথমিক শিক্ষা-পাথেয় সেই বিদ্যালয় থেকেই অর্জ্জন ক'রেছেন। সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হবার গৌরব সত্যিই আমাকে ভেতরে ভেতরে বিশেষ পুলকিত ক'রে তুল্‌ছিলো।

কিন্তু হঠাৎ মনে হ'লো—আচ্ছা, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এই যে এতোক্ষণ ধ'রে নানাকথায় আমায় অস্থির ক'রেছেন, এর মাঝে একটা বিশেষ অসঙ্গতি তো বেশ স্পষ্ট র'য়েছে! কোনো দিন তাঁর সাথে পরিচয় নেই—এতো তাড়াতাড়ি ক'রে যে আমাদের এই সৌহার্দ্দ সম্ভব হ'লো এটা কি এই ভদ্রলোকের অপ্রকৃতিস্থতার জন্য নয়? প্রথম হ'তে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যতো কথা, যতো ক্রিয়াকলাপ, মনে মনে সমালোচনা ক'রে যেন আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লাম—এ ভদ্রলোকটি হয়তো যা-কিছু ব'ল্‌ছেন তা' তাঁর মনের বিকৃত কোনো অবস্থারই প্রেরণায়! এর পরে ভদ্রলোকটির উচ্ছ্বসিত অগুন্‌তি কথা যেন আমার মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে দিলো! বৃদ্ধও যেন আমার অনাসক্তি বুঝতে পেরে চুপ ক'রে জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন। মানুষ সঙ্গকামী, কিন্তু সঙ্গীর অকপট হৃদয়ের আভাস না পেলে অন্তর তিক্ততায় ভ'রে ওঠে। তাই মনে কেমন এক তিক্ততা জেগে উঠে এতাবৎকালের মধুরতাকে বিস্বাদ ক'রে দিলো! আমিও তাঁর মতোই বাইরে তাকিয়ে সব কিছুর ছুটে বেরিয়ে যাবার অদ্ভুত দৃশ্য দেখ্‌ছিলাম! সাধারণভাবে যে আবেগ যাত্রাপথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে মনে জেগে ওঠে তার বিন্দুবিসর্গও যেন আজ মন থেকে উবে গেলো! তবু আমার জীবনে তখন এমন একটা মুহূর্ত্তের আবির্ভাব যে মেঘ কখনো এসে প'ড়লেও বেশীক্ষণ আড়াল ক'রে রাখ্‌তে পারে না। মন যেন আবার আপনিতেই কেমন সজাগ হ'য়ে ওঠে! নানাকথা ছুটোছুটি ক'রে মনের আঙিনায় দৌরাত্ম্য আরম্ভ ক'রেছিলো—আমি তাদের দোদুল দোলায় হয়তো দোল খেতাম কতোকাল ধ'রে, কিন্তু ষ্টেশনে-ষ্টেশনে গাড়ীর বিশ্রাম আর কুলীদের মিলিত কণ্ঠস্বর আমার কল্পনা ভেঙে দিতে লাগ্‌লো। এম্‌নি ক'রে আধো-স্বপ্ন আধো-জাগরণের মাঝ দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হাওড়ার কাছাকাছি এসে প'ড়লাম! আলোকশ্রেণীর তীব্র দীপ্তি ধীরে ধীরে অন্ধকারকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে লাগ্‌লো। তারপর হাওড়া ষ্টেশনে 'কুলী, বাবু, কুলী' প্রভৃতি বিরামহীন কোলাহলের মাঝে নেবে প'ড়লাম। যথাকালে এক কুলী-প্রভুর সাগ্রহ অনুরোধে সুটকেশটা তার হাতে দিয়ে, একপা-দু'পা ক'রে বাস্‌ষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসে হাজির হ'লাম।

পথের পরিচয় কিন্তু আমার কিছুতেই খ'সে যেতে চাইলো না। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও আমি বাসে উঠে পাশাপাশি ব'সলাম। আজও আমার মনে পড়ে সেদিনের সেই বিজলী-আলোকিত বাসের কথা! এখনো যেন চোখ বুঁজে দেখ্‌তে পাই সহাস্যমুখে সেই সদানন্দ পুরুষটি ব'সে আছেন! তাঁর প্রসন্ন চারু হাস্য অধরে লগ্ন! নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্পষ্ট শব্দও শোনা যাচ্ছে! তাঁর সুডৌল ছোটো ভুঁড়িটি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। আয়ত চক্ষু দু'টিতে সজল করুণা যেন থই থই ক'রছে! কতো লোকই দেখ্‌লাম কিন্তু করুণা ও হৃদ্যতায় জমাট বাঁধা এমন প্রতীক তো আর কোথাও পেলাম না! হঠাৎ বৃদ্ধ আমার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লেন, "বলি, ঘরের ছেলে ঘরে তো এসে পড়লেন! পথে যে সব কথা হ'লো তার সম্বন্ধে আপনার শেষ মতামত কিন্তু শীগ্‌গীরই জানিয়ে দেবেন। তারপর আমার ঘরে কিন্তু একবার না গেলেই নয়! আমার গিন্নী বড়ো আমুদে মানুষ! আপনি আমার নাতির বয়সী! আপনাকে নিয়ে যদি তার কাছে একবার হাজির ক'রতে পারি তবে তিরস্কারের পরিবর্ত্তে অভ্যর্থনাই মিলবে।" আমিও হেসে ব'ল্‌লাম, "চলুন না, আপনার ঘরেই আজকের রাত্তিরটা কাটিয়ে যাই! তবে একটা সর্ত্ত তার আগে আপনাকে মেনে নিতে হবে। এই মুহূর্ত্ত থেকে নাতিকে 'আপনি' সম্বোধন আর ক'রতে পারবেন না।" আমার এই সর্ত্তের কথা শুনে প্রথম একচোট্ হেসে নিলেন। পরে বল্‌লেন. "বেশ ভায়া, এখন থেকে তাই হবে। তাহ'লে চলো এবার তোমার দাদুর ঘরে!" আমিও মনে মনে ভাব্‌ছিলাম —মেসে গিয়ে তো ঠাকুর-চাকরের অনুগ্রহ আবার আজকের দিন থেকেই সুরু হবে! তবে সেটা এখনই বরণ ক'রে লাভ কি? দিব্যি নতুন দাদুর বাড়ীতে নতুন নাতি হ'য়ে দেখাই যাক্ না ভাগ্যে কি ঘটে! আমি তখন ব'ল্‌লাম—"দাদু, আমার কিন্তু দিদিমার প্রতি ভক্তি ভারী

প্রবল হ'য়ে উঠেছে! তাছাড়া, একা একা পথ চলি, এবার দিদিমা যদি সঙ্গে জুটে যান তো ভালোই হয়।" আমার নতুন দাদু তাঁর রসিকতার মুহূর্ত্ত কখনই ছেড়ে দিতে পারেন না! সহাস্য মুখখানাকে হঠাৎ গম্ভীর ক'রে বল্‌লেন, "দেখো দাদা, তোমার চেহারাখানা যেমনি মিষ্টি, তেমনি মিষ্টি কথা! তোমার দিদিমা কিন্তু সত্যিই আমার ঘাড় ছেড়ে তোমার ঘাড়ে নেবে প'ড়তে পারেন! আমার বুড়ো কালের বিরহ তাহ'লে সত্যিই বড়ো করুণ হ'য়ে উঠ্‌বে, কিন্তু তোমার বিপদের কথা ভেবেই দুঃখ আমার বেশী হ'চ্ছে।" কথাগুলো এমন ছদ্মগাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ব'ল্‌লেন, আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লাম। বাসের অন্যান্য লোকও আমাদের কৌতুক উপভোগ ক'র্‌ছিলেন। তাঁরাও হেসে উঠ্‌লেন।

(৩)

আমি আমার নতুন দাহুর নতুন অতিথি হ'য়ে কালীঘাটে নেবে প'ড়লাম। সেথান থেকে রিক্সতে ক'রে হাজির হ'লাম—নং হাজরা রোডে। কর্ত্তাবাবুর সাড়া পেতেই বাড়ীর ঝি এসে দরজা খুলে দিলো। ঘর খোলা পেয়েই দাহু আমার হাত ধ'রে টেনে নিতে নিতে একেবারে সোজা দোতলায় উঠে গেলেন। "ও গিন্নী, শীগ্গীর এসো, দেখো কাকে ধ'রে নিয়ে এসেছি। এবার হাজারীবাগ থেকে তোমার জন্য কিছু আন্তে ব'লেছিলে, দেখো চাঁদের মতো নাতি এনে হাজির ক'রেছি!" দাহুর ডাকে লাল-চওড়া-পেড়ে-সাড়ী-পরা, লাল-টুকটুকে-মস্তবড়ো-সিঁহুরের-ফোটা-কপালে যে নারী এসে দরজায় দাঁড়ালেন—যদি মায়ের রূপ কথনো ভাবতে যাই তবে এখনো সেই মহিমশ্রী নারীর মুখখানি প্রথমদিনের দেখা-পরিবেশের মধ্যে ভেসে ওঠে! তাঁর আকৃতি যেন মায়ের স্নেহ আর সস্মিত চারুতা দিয়ে মাখা! মাতৃগুণ এক এক নারীকে আশ্রয় ক'রে যে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে জীবনে তার পরিচয় অল্পবিস্তর প্রতিজনেরই ঘটে। সেই নারীর সাম্নে মনের শিশু যেন বেরিয়ে একেবারে তার কোলে লাফিয়ে উঠে আশ্রয় পেতে চায়। বয়োধর্ম্ম, যৌবনের লাজুকতা, অবিশ্বাস—সব কিছু যেন সেই নারীর দৃষ্টি-দীপে পুড়ে গিয়ে কেবলমাত্র সরল, সহজ নির্ভরতা ঐ মায়ের আঁচলতলে মুখ লুকিয়ে সেই বিগতদিনের ছেলেমানুষিভরা কেমন একটা চঞ্চলতা জেগে উঠে মনকে কানায় কানায় ভ'রে তোলে! আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে এই নারীর মুখে দেখেছিলাম, আমার নিত্যদিনের অভ্যস্ত মা যেন কি ক'রে তাঁর স্নেহ, তাঁর কোমলতা, তাঁর মাধুর্য্য

এঁকে রেখে গেছেন। এক-একবার কি আলোকেই না চোখ খুলে যায়! যা-কিছু দূরে নিকট-স্পর্শের সম্ভাবনা এড়িয়ে র'য়েছে তাও যেন বিশেষ অনুভূতির পথ চেয়ে কোনো এক আকস্মিককে একান্তভাবে আশ্রয় ক'রে পরম নিকট হ'য়ে ওঠে। এ'র মাঝে নিজের কর্তৃত্ব কতোটুকু জানিনে তবে যাঁকে আশ্রয় ক'রে ঘটে তাঁর স্বমহিমা কিন্তু বড়ো বিরাট।

আমার নতুন দিদিমা আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। দাহুর প্রেয়সী তিনি তো বটেই! দাহুর মুখের সস্মিত ভাবটি দিদিমার মুখেও প্রতি-ফলিত! তিনি এগিয়ে এসে ব'ল্লেন. "এসো, দাহু, এসো। আঃ! সারাদিনের পথের কষ্টে মুখখানা যে কালি হ'য়ে গেছে!" এই কথা ব'ল্তেই আমি নত হ'য়ে তাঁকে প্রণাম ক'রলাম। প্রণামটা যে কথনো আনন্দের অভিব্যক্তি হ'তে পারে আমি তা' এই প্রথম জান্লাম। আমি উঠে দাঁড়াতেই স্নিগ্ধ করে হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন। তাঁর ব্যবহারে অপরিচিতার কোনো আড়ষ্টতাই নেই। চিরদিনের দিদিমা হ'য়ে যেন তাঁর পথের নাতিটির জন্যই অপেক্ষা ক'রছিলেন। দাহু হেসে ব'ল্লেন, "কি গো নতুন দাহু, আমি পথেই বলিনি তোমার চাঁদমুখ দেখে আমার গিন্নী একেবারেই ভুলে যাবেন? বলি, আমি বুড়ো হ'য়েছি ব'লে এতোই অবহেলা? পথের কষ্টে আমার মুখের চেহারা এমন কিছু উজ্জ্বল নেই—তা নাতিকে আদর ক'রে বলা হ'লো—আঃ! চাঁদমুখ যে কালি হ'য়ে গেছে! আজ আমার মুখখানি নয় চাঁদমুখ আর নাই রইলো, তবু তো ঘরের লোক! আপ্যায়ন আমারও তো প্রাপ্য!" কথা ব'ল্তে ব'ল্তে আমরা বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। দিদিমা আমার হাত ধ'রে একটা সোফায় বসিয়ে দিতেই আমি ব'ল্লাম, "সত্যিই তো দিদিমা, দাহুর ঈর্ষা অতি স্বাভাবিক। আমি কোথাকার

কে—আমাকে এতো আদর ক'রলেন আর দাদুর দিকে ফিরেও তাকালেন না!" দাদু বল্লেন, "ওরে বাস্‌রে, তোমার নাতির কিন্তু অভিমান হ'য়েছে! দেখো দাদু, নতুনকে নিয়েই সারা দুনিয়ার মাতামাতি! পুরোণো যারা তারা পাশে ব'সে চিরদিনই হা-হুতাশ ক'রবে। তা ব'লে পুরোনো কে চায় বলো? তোমার দিদিমাকে যতোই বলো আজ তার নাতিই এই বুড়োর চেয়ে বেশী সত্য।" দিদিমা একথা শুনে বড়ো মধুর হেসে ব'ল্লেন, "আচ্ছা মুস্কিল! পথ থেকে নেবেই যে তোমরা দু'টিতে দাবীদাওয়ায় অস্থির ক'রে তুল্লে! এদিকে নাতির অভিমান ওদিকে ঘরের লোকের হা-হুতাশ! কাকে থুয়ে কাকে রাখি বলো!" দাদু ব'ল্লেন, "আপাততঃ আমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নতুনের অর্চনা শেষ করো।" দিদিমা এবার হেসে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের বিজলী আলোকের মাঝে ক্লান্ত দাদু আর আমি ব'সে রইলাম। দাদু ব'ল্লেন, "কেমন ভায়া, দিদিমাকে পছন্দ ক'রলে তো?" আমি উত্তরে শুধু মৃদু হাস্‌লাম। ঝি এসে হাতমুখ ধুয়ে বা স্নান ক'রতে হ'লে স্নান সেরে নিতে ব'ল্লো। দিবসের অসহ্য গরম যেন তখনো তার তাপকে শরীর মধ্যে জমা ক'রে রেখেছিলো। বিজলী পাখার দৌলতে ঘাম কিছুটা ক'মে গেলেও শরীরের তাপ যেন আর কিছুতেই যেতে চাইছিলো না। আমি স্নানের জন্য কাপড় ও তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে গেলাম। স্নান সেরে স্নিগ্ধ হ'য়ে এসে দেখি—দাদুও স্নান সেরে দিব্যি খালি গায়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে দিদিমার সাথে যেন কি কথা ব'ল্‌ছিলেন। আমি আস্‌তেই দাদুকে ও আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে দিদিমা বেশ ক'রে জলখাবার খেতে দিলেন। সেই যত্নের মাঝে একান্ত আত্মীয়তার স্পর্শ আমাকে অন্তরে অন্তরে বড়ই পুলকিত ক'রে তুল্‌ছিলো।

তারপর আমি ও দাদু যখন বৈঠকখানায় ফিরে এলাম, দাদু আরম্ভ ক'রলেন. "দেখো ভাই, ঐ স্কুলের হেড্‌মাষ্টারী পদে তোমাকে বাহাল ক'রতে আমার ভারী ইচ্ছে। এই একটু আগে গিন্নীকেও আমার মনের কথা জানালাম। ওঁরই জন্য ও স্কুলটা হ'য়েছে কিনা! তাই ওঁর সম্মতিটা নেয়া আমি যুক্তিযুক্ত মনে ক'রেছি। তোমার দিদিমা তোমাকে খুবই পছন্দ ক'রেছেন। আমাদের দু'জনেরই তোমাকে স্কুলে পাবার ইচ্ছা হ'য়েছে। এখন তুমি মতামত ঠিক ক'রে ফেলে দু'চারদিনের মধ্যেই দরখাস্তটা ক'রে দাও।" আমি আমার পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে ব'ল্‌লাম, "দাদু, আমি অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি আমার মতো অনভিজ্ঞ এক যুবককে অমন একটা দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য আপনি ও দিদিমা কি ক'রে পছন্দ ক'রলেন! আমার হেড্‌মাষ্টারীর কেন, কোনো মাষ্টারীরই অভিজ্ঞতা নেই; কলেজের গন্ধ এখনো গা থেকে কাটে নি! আমি তো এখনো ছাত্র!" দাদু ব'ল্লেন, "দেখো ভাই, জহুরী জহর চেনে একথা জানো তো? তোমার দিদিমাকে আমি ঠিক এই কথাই ব'ল্‌ছিলাম—'দেখো, ছেলেটি এখনো পাকাপোক্ত মাষ্টার হবার মতো কোন গুণই অর্জ্জন করেনি—ওকে ঐ পদে নিযুক্ত করা কি ভালো হবে?' তাতে তোমার দিদিমা উত্তর ক'রলেন, 'দেখো, তোমরা পুরুষ মানুষগুলো ঠিক মানুষ চিন্‌তে পারো না! ওকে ছেলেরা মান্‌বে, ভালোবাস্‌বে, ওকে দেখেই বুঝেছি ওর মনে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আছে। মানুষের মুখ হ'চ্ছে অন্তরের দর্পন। তুমি কি দেখে বোঝো না যে ও তোমাদের অনেক বুড়ো অভিজ্ঞ মাষ্টারের চেয়ে স্কুল ভালো চালিয়ে নেবে?' তার দূরদৃষ্টির কাছে আমারো অভিজ্ঞতার গৌরববোধ ম্লান হ'য়ে গেলো!"

এই আত্মপ্রশংসায় যে সেদিন কী গভীর সলজ্জ আনন্দ অনুভব ক'রেছিলাম তা বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারিনে! সেদিন দিদিমাকে দিয়ে যেন

নিজেকে যাচাই ক'রে নিলাম! আমার আত্মবিশ্বাস আর শক্তি কতোখানি ছিলো তা' আগে কোনো দিন বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু তখন যেন এই কথাগুলো পরম সত্য হ'য়ে আমাকে অন্তরে-বাইরে কি-এক সগর্ব্ব শক্তিতে ভ'রে তুল্‌লো! নিজে যে তখনো নিছক ছাত্র তা' ভুলে গিয়ে বয়সের কয়েকটা কোঠা যেন নিমেষে পেরিয়ে গিয়ে বেশ রাশভারী হ'য়ে উঠ্‌লাম। আত্মবিশ্বাসও যেন বড়ো উজ্জ্বল হ'য়েই দেখা দিলো! প্রশংসা সময়ে যে কতো বড়ো প্রেরণা হ'য়ে দেখা দেয় সেদিন বুঝেছিলাম। আমি তখন হেসে ব'ল্‌লাম, "দাদু, আপনারা পরম আত্মীয়ের মতো সম্মানই আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু এমন মর্য্যাদার কোনো হেতুই কিন্তু আমাতে নেই। দিদিমা আমাকে যে এতো বড়ো ক'রে দেখেছেন সে তাঁর গভীর স্নেহের খাতিরে। আমি আপনাকে খোলাখুলিই ব'ল্‌ছি—কোনো বড়ো কাজ ক'রবার মতো শক্তি আমাতে আছে কিনা তা' আমি নিজে কখনো যাচাই ক'রে দেখিনি। তবে আপনি বিশ্বাস ক'রে যদি আমাকে স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ক'রে নেন তবে আমার সবটুকু শক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সেবা ক'রবো—এটুকু আমি ব'ল্‌তে পারি।" দাদু তাঁর একখানি হাত আমার পিঠে রেখে ব'ল্‌লেন, "মানুষ কাজ আরম্ভ না ক'রে কখনো শক্তির পরিচয় পায় না। আমাদের অনন্ত শক্তি শুধ্ কাজের ও ক্ষেত্রের অভাবে সুপ্ত থেকে যায়! তুমি কাজ আরম্ভ করো, নিজেকে বিশ্বাস করো, সত্য রক্ষা ক'রে চলো, ঠিক দেখ্‌বে কাজ যতো বিরাট আর কঠোর হ'তে থাক্‌বে, তোমার শক্তিও ততো বেড়ে যাবে। তুমি যে আত্মবঞ্চনা ক'রবে না, এটিই হ'লো সত্যিকার কর্ম্মবীরের মতো কথা।"

এর পরে ঠিক হ'লো আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই কয়েকখানা প্রশংসাপত্র যোগাড় ক'রে ঐ স্কুলের হেড্‌মাষ্টারীর জন্য একটা দরখাস্ত

পেশ ক'রবো। আলাপ-আলোচনার পর রাত্রি গোটা দশেকের সময় আবার দিদিমার অনুরোধের তাগিদে সাধারণতঃ যা খাই তার দ্বিগুণ খেয়ে রাত্রির মতো শয্যা গ্রহণ ক'রলাম। সারাদিনের পর ক্লান্ত চোখ দু'টিতে রাজ্যের ঘুম নেবে এসে আমাকে যেন একেবারে অধিকার ক'রে ব'সলো। তার পরদিন বেলা গোটা সাতেকের সময় দাদুর ডাকে ঘুম ভাঙ্‌লো। দাদু ব'ল্‌লেন, "কি গো দাদু, ঘুম যে আর মিট্‌ছে না! এদিকে তোমার দিদিমা আমাকে চা-ও দিচ্ছেন না, জলখাবারও দিচ্ছেন না! এবার চট্‌পট্ প্রাতঃকৃত্য সেরে নাও তো ভায়া!" আমি অতি লজ্জিতভাবে উঠে যেতেই দাদু ব'ল্‌লেন, "তাড়াতাড়ি ক'রতে ব'ল্‌লাম ব'লেই আবার যেন অতি-ব্যস্ত হ'য়ো না! তোমার দিদিমা র'য়েছেন তোমার পক্ষে, সুতরাং মা ভৈঃ!" আমি হেসে ব'ললাম, "দাদু, সকাল বেলাতেই আমাকে ঈর্ষা ক'রতে আরম্ভ করলেন!" দাদু হেসে চ'লে যেতেই আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে হাজির হ'লাম! দিদিমা চা ও জলখাবার নিয়ে প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন। আমাদের দু'জনকে পরিবেষণ ক'রে তিনি দাদুকে বাজারের ফর্দ্দ দিয়ে চ'লে গেলেন। সেদিনের দুপুরে যে বিরাট ভোজ পেয়েছিলাম অতো সমারোহের সাথে আমাকে কেউ কখনো খাওয়ায় নি। সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসাবে অতি-সম্মানের বাহুল্যই আমি সেদিন লাভ ক'রেছিলাম। দিদিমা এতো প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও নানা ত্রুটি ধ'রে কেবলই দুঃখ ক'রতে লাগলেন—"দাদু, আজ কিন্তু তোমাকে ভালো ক'রে খাওয়াতে পারলাম না। এ'র পর থেকে তুমি যখন নাতি হিসেবে এসে জোর ক'রে খাবে তখনি যদি কিছু আদায় ক'রে নিতে পারো!" আমি হেসে ব'ল্‌লাম, "দিদিমা, এতো খাইয়েও যদি আপনার তৃপ্তি না হয় তবে আমি নিরুপায়! এ'র চেয়ে বেশী কিছু খাবার কল্পনাও যে আমি করিনি! তারপর আপনি

আজ যে পরিমাণে আমাকে খাওয়ালেন এ'র পর থেকে আর সাহস ক'রে আমি খেতে চাইবো কি না সন্দেহ! বাপ্‌রে, এই গরমের দিনে কী যে কষ্ট হ'চ্ছে দিদিমা! এতো খেলে কি মানুষ বাঁচে?" দিদিমা কিন্তু আমার কথায় একটু ক্ষুন্ন হ'লেন। ব'ল্‌লেন, "ভাই, আজকাল তোমাদের যে কী হ'য়েছে! ছেলে-মেয়ে কেউ তোমরা পেট ভ'রে বেশী ক'রে খাওয়া-দাওয়া ক'রতে চাও না! তাই তো চেহারা অম্‌নি রোগাপানা! দিব্যি খাওয়া-দাওয়া ক'রবে, স্বাস্থ্য-শক্তিতে উজ্জ্বল চেহারা হবে, বীরের মতো চলা-ফেরা ক'রবে!"

সেদিন দুপুরের পরেই আমি মেসে চ'লে গেলাম। কয়েকদিন বাদেই দাদুর সুপারিশে তাঁর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদে বাহাল হ'লাম। নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ ক'রলাম। মনে পড়ে প্রথম যখন ক্লাসে গেলাম তখন একটা সঙ্কুচিত পুলকস্পন্দন যেন আমাকে কাঁপিয়ে তুল্‌ছিলো। চারিদিকে ছেলেদের ভিড়! আমি তাদের পরিচালক, আমি তাদের শিক্ষক—সে যে কী অপূর্ব্ব অনুভূতি! ছেলেরা সব অপরিচিত, কিন্তু তবুও মনে হ'তে লাগ্‌লো দু'দিনের মধ্যেই তাদের সাথে আমি হবো অন্তরঙ্গ! আমার প্রতিটি শুভেচ্ছা, প্রতিটি কল্যাণের আগ্রহ এরা আনন্দে বরণ ক'রে নেবে! আমরা বহুর মাঝে অহরহ বিকাশ পেতে চাই। সে বিকাশ কখনো ক্ষমতার অহঙ্কারে, কখনো বা সহস্রের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে গ'ড়ে ওঠে। এই কিশোর দলের প্রতি প্রাণের সাথে আমি অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা প'ড়বো—এযে কী সম্ভাবনা তা' যাঁরা আমার অবস্থায়, আমারি বয়সে, আর আমারি প্রাণের সবটুকু সরল অথচ সতেজ ভাব নিয়ে না দাঁড়িয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না। কচি শ্যামল কিসলয় যেমন ক'রে বাতাসে কাঁপে, আলোকে হাসে আর অন্ধকারে কালো হ'য়ে ওঠে—আমি

দেখ্‌তাম, আমার পুলকে ছেলের দলও তেমনি ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। আমি যখন উৎসাহের আর গৌরবের সাথে তাদের কাছে খুলে ধরি নব নব আশা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র, প্রতি মুখে যেন নতুন সূর্য্যের আলোক হেসে ওঠে। আবার যখন কোনো অপরাধে তিরস্কার ক'রেছি, কেমন একটা থম্‌থমে অন্ধকার বিষাদগম্ভীর ভাব তাদের মুখ ছেয়ে ফেলে—সে যে কী সুন্দর করুণ দৃশ্য! সত্যি আমার বড়ো আনন্দ হয়! আমি ছাত্রদের মাঝে পেয়েছিলাম বিপুল সাড়া! আমি তাদের কাছে আমার নিজের যৌবনতপ্ত মন নিয়ে গিয়েছিলাম। তার সবটুকু আলো, সবটুকু তাপ যেন তারা নিঃশেষেই নিয়েছিলো!

* * * *

প্রতি শনিবার স্কুলের পরই আমি যেতাম দাদু ও দিদিমার সাথে দেখা ক'রতে। দিনের পর দিন এমন নিবিড় ঘনিষ্ঠতাই জ'মে গেলো যে আমি নিজেই ভুলে গেলাম—আমি তাঁদের নাতি নই। এখনো যেন চোখ বুঁজে দেখ্‌তে পাচ্ছি—সারাদিন গরমে ঘামে ভিজে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে দিদিমার কাছে উপস্থিত হ'য়েছি, অমনি দিদিমা ধমকে ব'লে উঠ্‌লেন, "ঝোড়ো কাকের মতো শ্রী হ'য়েছে যে! স্কুলের হেড্‌মাষ্টার তুমি, একটু ভদ্রতা রেখে চ'ল্‌তে পারো না? যাও, শীগ্‌গীর হাতমুখ ধুয়ে ফিট্‌ফাট্‌ হ'য়ে এসো।" আমি ব'ল্‌লাম—"দোহাই দিদিমা, এখন আমি এই সোফায় ব'সে পাথার বাতাস ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।" দিদিমা তখন নিজেই একটা ভিজে তোয়ালে নিয়ে এলেন। সযত্নে ছোটো ছেলেটির মতো আমার মুখচোখ মুছিয়ে দিলেন। চিরুণী দিয়ে কেশবিন্যাস ক'রলেন। তারপর মায়ের মতো মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লেন, "বাছা আমার এমন মুখখানাকে কি কুরূপই ক'রে রাখে!" হঠাৎ দাদু ঘরে ঢুকে ব'ল্‌লেন, "বলি নাতির রূপের প্রশংসা

হ'চ্ছে বুঝি? তা' আর হবে না? এখন বুড়ো-হাবড়া আমি, এবার নাতিকে যদি বশ ক'রে নিতে পারো! তা' দাদু, তোমার ভাগ্য ভালোই ব'লতে হবে। এই দিদিমাটিকে যদি ভজিয়ে-ভাজিয়ে নিতে পারো আগামী দিন ক'টি তোফা আরামে কাটবে! এই দেখো না, আমি বুড়ো হ'য়েছি, তবু আমার চুল আঁচড়িয়ে, পা টিপে দিয়ে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমাকে অস্থির ক'রে রাখেন।" দিদিমা হেসে বল্লেন, "তা বটে, আমিই তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাই! যাক্, খুব হ'য়েছে! এখন দাদু-নাতিতে কিছু খেয়ে নাও, আমি আস্‌ছি।" কিছুক্ষণ বাদেই প্রচুর জলখাবার খাইয়ে দিদিমা সে রাত্রির মতো নিশ্চিন্ত ক'রে দিলেন।

(৪)

জীবন সরস হ'য়ে দেখা দেয় মিলনের পথে। সেই মিলনের সুর যখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন বার্দ্ধক্য আকস্মিক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে আর মৃত্যুর ছায়াও এসে পড়ে—তা' যেন বেশ দেখা যায়। আমি শুধু ব'সে ব'সে চুপ ক'রে দাদুর মুখখানির ওপর ব্যাধি ও দুশ্চিন্তার কালো-কালো অক্ষরগুলো প'ড়ছিলাম। সত্যিই এ কি আশ্চর্য্য নয় যে জীবনের এতো সব আয়োজন মৃত্যুর স্পর্শে যেন লজ্জাবতী লতার মতো মুষড়ে পড়ে! একটু-একটু ক'রে দেখছিলাম জীবনের সমস্ত অধিকার যেন তাঁর কাছ থেকে কে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে! নীরব সাক্ষী হ'য়ে এই রিক্ততার ইতিকথা সবটুকু নিঃশেষে জেনে নিচ্ছিলাম। দিদিমা পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, এ জীবনের হাসির ক্ষেত্র থেকে তাঁর যে নির্ব্বাসন আস্‌বে তার জন্য প্রস্তুতি গ'ড়ে উঠ্‌ছিলো তাঁর মনে! কোনো কথা কোনো দিকে নেই, চারিদিক যেন কার আবির্ভাবের আশায় মৌন প্রতীক্ষায় র'য়েছে! সে এলো!

এই অল্পকালের মধ্যে যে মঞ্চ রচনা ক'রে আমার দাদু ও দিদিমার সাথে অভিনয় ক'রেছিলাম সেই অভিনয়ের শেষ অংকে যবনিকা নেবে এলো! দাদুর অন্যান্য ভাইরা এসে দিদিমাকে সদুপদেশ দিলেন। ছলে-কৌশলে তাঁর শেষ সম্বল যে কয়টি টাকা ছিলো নানা অজুহাতে তা' তাঁরা দু'দিনেই বের ক'রে নিলেন। শেষ পর্য্যন্ত দেনার দায়ে বাড়ীটা গেলো মহাজনের হাতে, দিদিমা উঠ্‌লেন গিয়ে সাধারণ একটা বাসা বাড়ীতে। এখন কাশীবাসের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিলেন। আমি এবার

দাদুর অভাব বুঝতে আরম্ভ ক'রলাম। আমি অনেক বয়সের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যের বহর ডিঙিয়ে শুধু দাদুর জোরে এতোদিন স্কুলের মাথায় ব'সে ছিলাম। যাঁরা ছিলেন নীচে তাঁরা মোটেই প্রসন্ন হননি। নানাভাবেই আমাকে আসনচ্যুত ক'রবার চেষ্টা তাঁরা ক'রেছেন, কিন্তু আমার আসন ছিলো যাঁর পাহারায় তাঁকে তো তাঁরা জয় করতে পারেন নি! কাজেই আমি ছিলাম অনড়। ভিত্ কেঁপে উঠ্‌লো—তাঁদের ইচ্ছার সাথে মৃত্যুর ষড়যন্ত্র মিশে প্রহরীকে সরিয়ে নিয়ে গেলো কোন্ দেশে! অরক্ষিত আমি এবার আসন রাখ্‌তে আর পারলাম না। আমার স্বল্পদিনের স্বপ্ন-দিয়ে-গড়া কর্ম্মের আসর থেকে বিদায় নিলাম। শিক্ষকমহাশয়দের মিথ্যা দুঃখের অভিনয় হ'লো সেদিন! কতো দীর্ঘশ্বাস, কতো সমবেদনা, কতো শুভেচ্ছা, কতো বিরহতাপই তাঁরা সেদিন ব্যক্ত ক'রলেন! কিন্তু ছদ্মগাম্ভীর্য্যের আড়ালে তাঁদের পুলকের আলো জ'ল্‌ছিলো—তার আভাস ছিলো কথায়, ছিলো দৃষ্টিতে।

বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক ঘুচে যাবার কয়েকদিন পরে দিদিমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দিদিমা কতো দুঃখ ক'রলেন, কিন্তু কেমন একটা মুক্তির আনন্দেই ব'ল্‌লাম, "দাদুর দান দাদুর সাথে-সাথে যে খ'সে গেলো এ তো ভালোই হ'লো দিদিমা! হয়তো কাজে কতো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘ'টতো! দাদুর আত্মা হ'তেন ক্ষুব্ধ! আমি যে সসম্মানে বিদায় নিতে পারলাম—এ কিন্তু সত্যিই মঙ্গলের নির্দ্দেশ!" দিদিমা কিছু ব'ল্‌লেন না। চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কথার পিঠে কথা ব'লে বাড়িয়ে তোলার আনন্দ তাঁর জীবন থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়েছে। মৌন ব্যথাতুর দিদিমা শোকের মুর্ত্ত প্রতীকের মতো জমাট-বাঁধা অশ্রুর স্তূপ হ'য়ে উঠেছেন! চারিদিক থেকে তাঁর যে আনন্দ ও অভিনন্দনের ঝরণা ব'য়ে যেতো তারা যেন

আজ মৃত্যু ও বিরহের হিমশীতল স্পর্শে হঠাৎ জ'মে গেছে! আমি বিদায় নিলাম।

* * * *

কয়েকদিন পরের কথা। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দিবা-নিদ্রার আয়োজন ক'রছি এমন সময় মেসের চাকর দিদিমার হাতে-লেখা একখানা চিঠি এনে দিলো। আদেশ ক'রেছেন, পত্রপাঠমাত্র তাঁর সাথে একবার দেখা ক'রে আস্‌তে হবে। দিদিমা ডেকেছেন—নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তাই বেরিয়ে প'ড়লাম। ঘণ্টাখানেক পর দিদিমার বাসায় গিয়ে উঠ্‌লাম। দরজা খোলাই ছিল। দিদিমা ব'সে ছিলেন। আমি গিয়ে প্রণাম ক'রতেই ম্লান হাসি হেসে আমার মাথায় হাত রাখলেন। তিনি ঠিক জান্‌তেন, আমি তখনি হাজির হবো। দু'জনায় মুখোমুখী কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে রইলাম। দিদিমা যেন একটা কথা আরম্ভ ক'রবেন মনে হ'লো। কথাটা যেন খুব ব্যথার। তিনি যে তা' রুদ্ধ ক'রে বেশ সহজভাবে ব'ল্‌বার একটা পথ খুঁজছিলেন—এ তাঁর চোখে-মুখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো। আমিই কথার প্রারম্ভ ক'রে ব'ল্‌লাম, "কি দিদিমা, এতো তাড়া ক'রে ডেকে আন্‌লেন—ব্যাপার কি?" দিদিমা আবার ম্লান হাসি হেসে ব'ল্‌লেন "একলা র'য়েছি—বড়ো খারাপ লাগ্‌ছে। তাই তোমাকে ডাক্‌লাম।" আমি বুঝলাম, এ শুধু আসল কথার সূচনা! দিদিমা এখন নিঃসঙ্গতার মাঝেই যে তাঁর বিরহী চিত্তে দাদুর ফেলে-যাওয়া সহস্র স্মৃতিকে ডাক দিয়ে এনে মনের আঙিনায় দাঁড় ক'রে দিয়ে কথা বলেন—এ আমি জান্‌তাম আর জান্‌তাম ওতেই তাঁর গভীর আনন্দ। সঙ্গ ও বাণী জীবনে এক-এক সময় যেন অসহ্য হ'য়ে ওঠে। এক-একটা সময় আসে যখন শুধু একা থেকে জীবনের চারিদিকে চেয়ে নিঃসঙ্গ রূপটাকে নিবিড় ক'রে দেখ্‌তে

ইচ্ছা করে। আমি আর কথা ব'ল্লাম না। চুপচাপ ব'সে রইলাম। দিদিমা এবার আরম্ভ ক'রলেন, "দাদু, তোমার মনে পড়ে সেদিনকার সেই মেয়েটিকে ?" আমি হঠাৎ চম্‌কে উঠে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। মনে যেন কেমন একটা আতঙ্ক এলো! ভাব্‌লাম—এই রে, এবার বুঝি দিদিমা ঐ মেয়েটিকে বিয়ে ক'রতে বলেন! যাক্, চুপচাপ শুনে যেতে লাগ্‌লাম। তিনি ব'ল্লেন, "তুমি তো জানই ঐ লক্ষ্মী মেয়েটির সঙ্গে তোমার মিলন আমার ও তোমার দাদুর খুবই কাম্য ছিলো। আজ তিনি চ'লে গেছেন, কিন্তু ইচ্ছে তাঁর র'য়েছে। আমারো বড়ো বাসনা তুমি বিয়ে ক'রে ওকে বাঁচাও। বড়ো অসহায় ও! ওরা বড়ো গরীব! আমার সঙ্গে পরিচয় ওদের দীর্ঘ দিনের। সব দিক দিয়ে যে ওরা কী চমৎকার! ওদের যদি এতোখানি আপন ক'রে না পেতাম আর ওদের অন্তরের মাধুর্য্য যদি এমন ক'রে না বুঝতাম তবে তোমার সাথে ও মেয়ের বিয়ের কথা আমি তুল্‌তামই না। তবে এতো তাড়া ক'রে যে তোমাকে আজ আন্‌লাম তার কারণ—ও'র জ্যাঠামশাই এসেছেন ওকে নিয়ে যেতে। গ্রামে এক পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সাথে এসেছে ওর সম্বন্ধ! এমন মেয়ে—তার ব্যবস্থা ক'রেছেন এই! দাদু, এ মেয়েকে বিয়ে ক'রে যে তুমি সত্যিই সুখী হবে তা' আমি জোর ক'রেই বল্‌তে পারি।"

দিদিমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সেদিনের-দেখা মেয়েটি আমার কল্পনায় জেগে উঠ্‌লো। দেখ্‌লাম তার সেদিনের সেই সলজ্জ মধুরস্বভাব মূর্ত্তি। তারপরেই আবার দেখ্‌লাম—এক বুড়ো দাঁড়িয়েছে স্বামীবেশে টোপর মাথায় দিয়ে আর মেয়েটি নতমুখী বিষাদের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়েছে তার পাশে! মনটা এ কল্পনায় শিউরে উঠ্‌লো। কিন্তু বাবা তখন আমার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছেন।

তাই পরিষ্কার ক'রেই দিদিমাকে সব কথা ব'ল্লাম। দিদিমা শুনে ব'ল্লেন, "সত্যিই তো ভাই, তোমার বাবা ও অন্যান্য অভিভাবকের মতামতের কথা যে আদপেই চিন্তা করিনি। তোমাকে পেয়ে এতো আপনই মনে ক'রেছি যে তোমার যে আর কেউ থাকৃতে পারে একদিনও সে কথা মনে ওঠে নি। তা যাক্, তোমার বাবা যা' ব'ল্‌বেন তাই ক'রবে, তাঁর আদেশ মেনেই চলবে। সবই ভাই অদৃষ্ট, নইলে এ ব্যাপারটা এমন পরিণতির দিকে যাবে কেন বলো ?" এ'র পরে আর কোনো কথা হ'লো না। মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথা মনে ক'রে ভেতরে একটা গভীর বেদনা খচ্‌খচ্ ক'রে বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো। তবে আজ ভাবি, সেদিনের সেই অভাগিনী আমার সাথে পরিণয়ের কল্পনা ক'রে যে আনন্দের স্বপ্ন রচনা ক'রেছিলো তা' যেন অলক্ষ্যে উৎসর্গ ক'রেছিলো আমার ভাবী পত্নীর চিত্তলোকে। সেই মেয়েটির অন্তঃসৌন্দর্য্যের যে কথা দিদিমার কাছে শুনেছিলাম তার সবটুকুই আমার সহধর্ম্মিনীর মাঝে ফুটে উঠেছিলো! তার মাঝে পেয়েছিলাম শ্যামসুলভ শ্রী, মধুর নিবিড় ঐকান্তিক প্রেম। তীব্র রূপবিভা তার ছিলো না কিন্তু তার হৃদয়ের কমনীয়তা, স্নিগ্ধতা বড়ো মধুরভাবেই আমাকে আচ্ছন্ন ক'রেছিলো!

আমি প্রণাম ক'রে চ'লে গেলাম। এ'র পরে এক সন্ধ্যায় দিদিমার সাথে হাওড়া ষ্টেশনে সাক্ষাৎ করি। দিদিমা আশীর্ব্বাদ ক'রে কাশীযাত্রা ক'রলেন। সেই স্নেহনীড়ের শেষ চিহ্নটুকুও দিদিমার বিদায়ের সাথে কোথায় যেন হারিয়ে গেলো! হাওড়া থেকে ফিরবার পথে নিজেকে পরম নিঃস্ব ব'লে মনে ক'রতে লাগলাম। জীবনের আঁচলে যে আত্মীয়তার মণিমুক্তা বেঁধে রেখেছিলাম কাল যেন ফাঁকি দিয়ে তা' খুলে নিয়ে পালালো! কাশী গিয়ে দিদিমা অনেক করুণ মধুর কথা লিখেছিলেন। সব চেয়ে যে কথাটি সেদিন মনকে ঘা দিয়েছিলো তা' আমার

মনে এখনো আঁকা র'য়েছে—"দাদু, আমি কি তোমার স্নেহ ছেড়ে থাকতে পারি? বিশ্বেশ্বরের মধ্যেও যে তোমাদেরই মধুর মুখগুলির আশাভরা দৃষ্টি দেখতে পাই। ঠাকুর আমাকে কি মায়ায়ই বেঁধে রাখলেন! এলাম তোমাদের ছাড়বো ব'লে, আমার মনের মাঝে যে তোমরা আরো বেশী নিকট হ'য়ে উঠ্‌লে! প্রার্থনা করো আমি আর যেন তোমাদের কথা ভেবে ব্যাকুল না হই। ঠাকুরের চরণে তোমাদের কল্যাণের ভার দিয়ে এবার যেন এক মনে তাঁরই কাছে পৌছতে পারি।" মনে প্রথমে বড়ই আনন্দ হ'লো—দিদিমা আমার কথা এখনো ভাবেন! তারপরেই এলো গভীর বেদনা। মনে মনে ব'ল্‌লাম, ঠাকুর, ব্যথিতা সব কিছু পেছনে ফেলে গেছে তোমার কৃপার প্রার্থী হ'য়ে, তুমি আর বিগত দিনের স্মৃতি তাঁর মনে জানিয়ে দিয়ে ব্যাকুল ক'রো না, ব্যথা বাড়িও না। যথা সময়েই উত্তর দিলাম। ও পত্রের উত্তর আর পেলাম না। বুঝ্‌লাম, দিদিমা মন স্থির ক'রেছেন, বাইরের সংস্রবে চিত্তকে আর বিভ্রান্ত ক'রতে চান না।

(৫)

মাঘের এক শীতার্ত্ত সন্ধ্যায় আমাকে জানানো হয় বিবাহের সব কথা পাকাপাকি হ'য়ে গেছে। তিনদিন পরেই বিবাহ! সম্বন্ধ আস্‌ছিলো জান্‌তাম, কিন্তু বিবাহ যে এতো শীগ্‌গীরই অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে, দিনক্ষণ একেবারে স্থির—এতো সব জান্‌তাম না। চিরদিনই উন্মনস্ক, তারপর কিছুদিন আগেই ব্যথা-বেদনার কতোকগুলি স্তর পেরিয়ে যেন বেশ একটু ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলাম। নিঃসঙ্গ জীবনের চারিদিকে চোখ ফেলে নিজেকে নিজে নানা ভাবে প'ড়ে দেখ্‌ছিলাম। এই আকস্মিক আয়োজন তাই আমাকে প্রসন্ন ক'রতে পারলো না। তবু পরদিন সকালেই দেশে রওনা হ'তে হ'লো। দেশ থেকে ক'নের দেশে যাত্রা ক'রলাম। নবদ্বীপ যেতে হবে! বুড়ো যাঁরা তাঁরা আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, "বাবাজী, তোমার বিয়ের কল্যাণে কিন্তু তীর্থদর্শন পুণ্যিটা হ'বে!" আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ব'ল্‌লো—"আর তোফা আরামে মিঠাই-মণ্ডা খেয়ে দেবদর্শন, সে কথা বলেন না কেন?" আর-একজন ফোড়ন দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "তা' যাই বলো না কেন ভাই, দাদামশাইয়ের কিন্তু এখন আর কোনো অসুখ-বিসুখই নাই!" এ খোঁচায় তিনি একটু চ'টেই উঠ্‌লেন,—"বলি, আমার খাওয়াটাই তোরা দেখিস্, নিজেদের রাক্ষুসেপনার কথা কিছু ভাবিস্? ঘাটে নাব্‌তে না নাব্‌তেই তো 'কি খাবো' রব তুল্‌বি!" বন্ধুটি এবার হেসে ব'ল্‌লো, "শুনেছি, নবদ্বীপে নাকি রসগোল্লার রসে গৌরসুন্দরের স্নান হয়, আর তুলসীর পরিবর্ত্তে রসগোল্লা ব্যবহার করে। তবে দাদামশাই কিন্তু চরণামৃত আর চরণতুলসী দিয়েই দু'টো দিন কাটিয়ে

দেবেন !" দাদামশাই প্রায় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ—চিরকৌতুকময়। তাঁর অতিভোজন কারুর কাছেই বিসদৃশ নয়, বরং রঙ্গরসের হেতু। দাদামশাই এবার হাতের যষ্টি আন্দোলিত ক'রে ছেলেদের তেড়ে এলেন। ছেলেরা হুরদার ক'রে দূরে পালিয়ে গেলো। সবাই একবার প্রাণ ভ'রে হেসে নিলো। বাবা ছিলেন পেছনে। এবার এগিয়ে আসতেই সবাই চুপ ক'রে গেলো। তিনি ছিলেন রাশভারী লোক। স্ফূর্ত্তি যেন তাঁর কাছে স্তব্ধ হ'য়ে যেতো। তিনি কিন্তু কড়াকথাটি কাউকে ব'ল্‌তেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন কিছু ছিলো যা' সকলের মনেই একটা সমীহা, একটা শ্রদ্ধাময় আড়ষ্টতা জাগিয়ে দিতো।

* * * *

বিয়ে হ'য়ে গেলো। শুভদৃষ্টির সময় সলাজ স্নিগ্ধ মুখখানি দেখে আশ্বস্ত হ'লাম। সেখানে সমস্ত প্রত্যাশার পরিপূরণের সম্ভাবনাই যেন র'য়েছিলো। সুন্দরী না হ'য়েও যে মনোহর হয় আমার নববধূ হ'লো ঠিক তাই। দীপ্তি আঘাত করে, কিন্তু স্নিগ্ধ কম্রতা চিত্তকে তৃপ্ত করে। তার সাথে প্রথম কথা হ'লো পাল্কীতে। বাড়ী পৌছবার আগে ব'ল্‌লাম, "শুন্‌চো ?" সলজ্জ-চাহনি চাইতেই ব'ল্‌লাম, "তোমার বাপের বাড়ীর দেশের সপ্রতিভ ভাব বর্ত্তমান কালের। বরকে দেখে দেড়হাত ঘোম্‌টা দেয়া বা বরের আত্মীয়-স্বজনকে দেখে জুজুবুড়ি হ'য়ে যাওয়া, তোমাদের ওদেশের মেয়েদের রেওয়াজ নেই, কিন্তু তুমি চ'লেছো যে গাঁয়ের বধূ হ'য়ে, যে পরিবেশে, তা' কিন্তু এখনো মান্ধাতার আমল পেরিয়ে যায়নি। দেখো' আমার স্ত্রীর যেন সেখানে অনাদর না হয়।" সলাজ মধুর হেসে সে ব'ল্‌লো, "তুমি কিছু ভয় ক'রো না। আমি ঠিক মানিয়ে নেবো। যা' আমি জানিনে তুমি শিখিয়ে দিও। তা হ'লে তুমি কখনো আমার জন্য লজ্জা পাবে না।" সেদিনের সে

প্রতিশ্রুতি কি যশের সাথেই না রক্ষা ক'রলো ! সে দু'দিনেই সবার আদর ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে সত্যিকার গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে উঠলো। সে যা-কিছু ক'রতো তার মাঝেই সবটুকু দরদ ও ঐকান্তিকতা দিয়ে ক'রতো। সবচেয়ে যে গুণে সে সবাইকে বশ ক'রলো সে হ'চ্ছে তার দম্ভহীন ত্রুটি স্বীকার। আদরের মেয়ে সে, পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থালীর কষ্টসাধ্য কোনো কর্ম্মেই সে অভ্যস্ত ছিলো না, কিন্তু সবার সঙ্গে কাজ ক'রতে যেতো অনলসভাবে। তার অপটুতায় নিজেই লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্‌তো "ভাই. আমি ভারী অকেজো, আমাকে একটু শিখিয়ে দেবে না ?" এ কথায় কি আর কারো রাগ থাকে, না, উপহাস ক'রবার প্রবৃত্তি জন্মে ? তার এই অকেজো ভাবই যেন সকলের স্নেহ-প্রীতি আকর্ষণের উপায় হ'য়ে দেখা দিলো। একটা ব্যাপারে তার দক্ষতা ছিলো সবার ওপর। পরিবারের সকলের ওপর তার মাতৃহৃদয়ের অজস্র স্নেহ ও ভালোবাসা সে এমনভাবে বিস্তার ক'রলো যে সকলেই যেন শিশু হ'য়ে তার স্নেহের দুয়ারে দেখা দিলো।

সু—এলো আমার জীবনে সকল আনন্দ ব'য়ে নিয়ে। জীবনের সমস্ত ভার যেন নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত ক'রে দিলো। নিজেকে আমি এতো মুক্ত, এতো সহজ, এতো সফল ক'রে পাবো তা' আমি কোনো দিনই ভাবিনি। ভেতরে ও বাইরে তার ভালোবাসার আলোকে এমন একটা উন্মুক্ত পথ পেলাম আমার গতিতে যেন কোনো বাধা আর স্পর্শও ক'রবে না। আমার পায়ে উজাড় ক'রে দিতো সে অজস্র তৃপ্তি। কিন্তু র'য়েছে দেহ, র'য়েছে ক্ষুধা, র'য়েছে অসংখ্য প্রয়োজন। তাই বাইরে বেরিয়ে প'ড়লাম, কিন্তু শীতল ছায়াটির মতোই সে সারাক্ষণ আমার পাশে র'য়েছে ! জীবনের সকল কর্ম্মে ও কল্পনায় নিবিড়তম হ'য়ে যুক্ত র'য়েছে আমার স্ত্রী ! সবটুকু জীবনকে তার

অঞ্জলির মাঝে তুলে দিয়েছিলাম, সে-ও ঠিক পূজারিণীর মতোই আমার জীবনকে সৌভাগ্যের পায়ে পৌঁছে দিতে চেষ্টা ক'রেছে। নিজের ব'ল্‌তে কিছুই রাখেনি—সবটুকু আমাকে দিয়ে কেমন ক'রে যেন আমার সকলকে কেড়েকুড়ে সে মহিমময়ীর মতো স্থকল্যাণ হাসিতে আমার জীবনের মাঝে আলোক জ্বেলে তুল্‌তো। আমি আজও ভাবি, ওগো তুমি তো নিঃস্ব হ'য়েছিলে আমাকে দিয়ে, তবে কেমন ক'রে আমাকে নিঃস্ব ক'রে দিয়ে চ'লে গেলে!

আবারো একটা স্কুলের হেডমাষ্টারি পেলাম। পাড়াগাঁয়ের স্কুল! ঐ আয়ে আমার সত্যিই ক্ষোভ ছিলো। সে কিন্তু ওতেই মহাতুষ্ট! লক্ষ্মী যে বাস করেন সন্তোষে! তাই তার হাতে ঐ সামান্য আয়ই আমার অভাব মিটিয়ে দিতো। চিত্তের প্রসাদের বাইরেই যে রূঢ় বাস্তব বাসা বেঁধেছে তা তো আর অস্বীকার করা যায় না! তাই একটু বেশী আয়ের উপায় কিসে হয় তারই চেষ্টা অহরহ ক'রতাম। প্রয়োজনের অনুপাতে আয় তো অতি সামান্য! এমন সময় আবার আমার ভিলু এলো! আমরা না হয় কষ্টে দিন চালাই কিন্তু শিশুর কি অপরাধ? সে আমাদের সাথে দুর্ভাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে কেন? বন্ধে ক'ল্‌কাতা গেলাম—ইচ্ছা একটা ব্যবসা-ট্যাব্‌সা করি। সংগতি কিছুই ছিলো না। আশা ছিলো, পরিচিত কাউকে ধ'রে মিলেমিশে একটা দোকান দাঁড় করাবো। ক'ল্‌কাতা এসে কিন্তু ব্যবসা আর করা হ'লো না। বন্ধুদের মধ্যে এক-একজন এক-একটা আজ্‌গুবি বুদ্ধি জোগাতে থাকে! কিন্তু কারো বুদ্ধিতে বা যুক্তিতে আমার মন সাড়া দেয় না। তবে অনেক আলাপ-আলোচনার শেষে এই সাব্যস্ত হয় যে বাংলার-বাইরে গিয়ে ভাগ্যান্বেষণ করাই আমার পক্ষে প্রশস্ত।

(৬)

আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাও অধিক, অবস্থাও শোচনীয়! আমার বিশ্বাস, এই দুর্গতির একমাত্র কারণ—তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মোহ! ছেলে যে-ডিভিসনেই ম্যাট্রিকটা পাশ করুক, কলেজের বিদ্যেটার দৌড় কতো তা' একবার দেখ্‌তে যাওয়া চাইই চাই। হঠাৎ বাবু সেজে, সস্তাদামের চস্‌মায় রূপহীনতার ক্ষতিপূরণ ক'রে সিগ্‌রেট মুখে গুঁজে, একখানা বই বা খাতা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অতি সন্তর্পনে কোনোরকমে ছুঁইয়ে কলেজের পড়ুয়া হবার সাধ না মেটালে কি ভদ্রসমাজে মুখরক্ষা হয়? আমার কাছে যখনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো ছেলে শিক্ষা বিষয়ে সলাপরামর্শ গ্রহণ ক'রতে এসেছে তখনই আমি তাকে প্রতিনিবৃত্ত হ'তে ব'লেছি। কিন্তু বিংশশতাব্দীর এ মোহপাশ ছিন্ন করে কার সাধ্য? নিজেদের সর্ব্বনাশ এরা নিজেরাই ডেকে আনে। উচ্চশিক্ষাও এদের পাওয়া চাই, বর্ত্তমান সভ্যসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গিয়ে বেশভূষারও পারিপাট্য চাই, অথচ এদিকে কিন্তু তহবিলশূন্য! যদিই বা কায়ক্লেশে, এমন কি, আকণ্ঠঋণে জড়িত হ'য়েও, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হ'লো, শিক্ষান্তে কিন্তু লাথিঝাঁটা খেয়েও উদরান্নের সংস্থান হয় না! এইতো অবস্থা!

আগেকার দিনে তবু তো একটা স্থবিধে ছিলো—অন্য কিছু জুটুক আর নাই জুটুক, সামান্য বেতনের একটা স্কুলমাষ্টারীও অন্ততঃ পাওয়া যেতো। কিন্তু এখন আবার তাও জুটতে চায় না! ওদিক দিয়ে আমার যাহোক্ এক হিসেবে নিজেকে ভাগ্যবানই

মনে করা উচিত। পাড়াগাঁয়ের গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে ব্রতী আমি! তবু কিন্তু স্কুলমাষ্টারী কোনোদিনই আমার মনঃপুত নয়! বরাবরই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন ক'রবার দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। মনে হ'লো বাংলার-বাইরে কোথাও গেলে সত্যি মন্দ হয় না! বাঙালীদের অনেকেই তো নানাক্ষেত্রে নানা সুবিধে ক'রে নিয়েছে! এমনও তো হ'তে পারে যে আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সফল হবার পথটি এতে বেশ সুগম হ'য়ে উঠলো! তাই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আমার এক আত্মীয়ের নিকট হ'তে তাঁর মুঙ্গেরস্থিত এক বন্ধুর নামে একখানা পরিচয়-পত্র নিয়ে মুঙ্গের যাত্রা ক'রলাম······এখন মনে হয় কল্পনাপ্রিয়তার কোন্ ধাপে উঠ্‌লে তবে মানুষ নিশ্চয়কে একেবারে ত্যাগ ক'রে, অনিশ্চয়কে এমনি ক'রে আঁকড়ে ধরতে চায়?

হাওড়া হ'তে বরাবর একটানা মুঙ্গেরে যাওয়া যায় না। জামালপুরে নেবে মুঙ্গেরের ট্রেন ধ'রতে হয়। জামালপুর মুঙ্গের জিলারই একটি মহকুমা। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এক বড়ো কারখানা ওখানে আছে। কর্ম্মসূত্রে অনেক বাঙালী ওখানে বাস করেন। ওখান থেকে মুঙ্গের পর্য্যন্ত একটি ছোটো লাইন বেরিয়ে গেছে। সকালে আটটায় গিয়ে মুঙ্গের ষ্টেশনে নাবলাম। ষ্টেশনের গা ঘেঁষে মুঙ্গের দুর্গপ্রাকার আরম্ভ হ'য়েছে। মনে প'ড়লো, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মীরকাশিম এই দুর্গেই বহু ইংরেজকে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। ইংরেজরা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নবাব বার-বার পরাজিত হ'য়ে প্রথমে অযোধ্যায় ও পরে দিল্লীতে পালিয়ে যান। দিল্লীতে ওঁর দেহের অবসান হয়। সেই আমলের ব্যারাকগুলো এখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত ও অন্যান্য অফিসে পরিণত হ'য়েছে।

ষ্টেশন হ'তে শহরে অথবা শহর হ'তে ষ্টেশনে যাবার রাস্তা দুর্গের মাঝ দিয়েই গেছে। দুর্গাভ্যন্তরে পাহাড়ের ন্যায় উঁচু উঁচু স্থানে সুন্দর সুন্দর কুঠী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে হয়তো ঐ সকল কুঠী নবাবের সৈন্যবিভাগের উচ্চতম পদস্থ কর্ম্মচারীদের ব্যবহারে লাগ্‌তো। এখন নাকি সেগুলি স্বাস্থ্যনিবাসরূপে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। অনেকে ঐ কুঠীগুলো অধিক টাকায় ভাড়া নিয়ে কিছুকাল বাস ক'রে ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ক'রবার চেষ্টা করেন। দুর্গমধ্যস্থিত ঘরবাড়ী সবই এখন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের। দুর্গের যে-ফটকটির বাইরেই শহর আরম্ভ হ'য়েছে তার মাথায় একটা বড়ো ঘড়ি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

অবশ্য এ সবই বিহার-ভূমিকম্পের আগেকার কথা! ঐ দুর্ঘটনার পরে আর মুঙ্গেরে যাইনি। সুতরাং এ'র মধ্যে শহরের যে পরিবর্ত্তন হ'য়েছে তা' দেখ্‌বার সুযোগ আমার হয়নি। তবে শুনেছি, শহরটি নাকি এক নতুন ছাঁচে ঢালা হ'য়েছে। যাহোক, ঐ সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে যখন দুর্গের বাইরে এসে পৌছি তখন গাড়ীর কোচম্যান আমাকে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, "বাবুজী অভ্ বাতাইয়ে আপকে মকান কাঁহা।" বড়োই মুস্কিলে প'ড়লাম, কেন না যদিও নির্দ্দিষ্ট মহল্লায় এসে পৌছলাম তবু মহেশবাবুর বাসাটি কোথায় ব'ল্‌তে পারিনে! অথচ কোচ্‌ম্যানকেও আমার না-জানার কথা ব'ল্‌তে সঙ্কোচ বোধ হ'তে থাকে। এমন সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এক বাঙালী-ভদ্রলোকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় এই না-ব'ল্‌তে পারার লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করি। তিনি ব'ল্‌লেন, "মশাই, কোন্ মহেশবাবুর বাসা জান্‌তে চান?" আমি উত্তর করি, "যাঁকে আমার প্রয়োজন তিনি টাউন হাই স্কুলের সেক্রেটারী।" তখন ঐ ভদ্রলোক বলেন, "ও! আপনি মহেশ-মাষ্টারের কথা ব'ল্‌ছেন! আসুন আমার সাথে, ঐ যে মোড়টা

দেখ্‌ছেন, ওরই ছ'চারখানা বাড়ীর পরই মহেশমাষ্টারের বাসা।" তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে কোচম্যান্‌কে গন্তব্যস্থানে যেতে নির্দ্দেশ দিলাম। কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই ঐ ভদ্রলোকের উচ্চারিত তাচ্ছিল্যভরা 'মহেশমাষ্টার' কথাটা থেকে থেকে আমার মনে কেমন একটা খোঁচা দিতে লাগ্‌লো। 'মাষ্টার' কথাটার মাঝেই যেন একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব নিহিত আছে! বার্ণার্ড শ' তাঁর প্রণীত Prefaces নামীয় গ্রন্থখানিতে এই ভাবের একটা ইঙ্গিত ক'রেছেন। সকলের মনেই স্কুলমাষ্টার সম্বন্ধে অজ্ঞাতসারেও একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সর্ব্বদাই জাগরূক আছে। মহেশবাবুর অপরাধ, তিনি পূর্ব্বে হয়তো কোনো সময়ে স্কুলের মাষ্টারী ক'রে থাক্‌বেন এবং আমি যখনকার কথা ব'ল্‌ছি তখন তিনি তাঁর নিজ বাড়ীতে কয়েকটি ছাত্রকে প্রাইভেট্‌ পড়িয়ে মোটামুটি কিছু রোজগার ক'রতেন। ঐ স্কুলটি তাঁরই স্থাপিত। সেই হেতু সেক্রেটারীপদে বাহাল থেকে মাসিক বেতন হিসেবেও একটা মোটা টাকা তিনি পেতেন। যাহোক্‌ মুঙ্গেরে তিনি 'মহেশমাষ্টার নামেই সুপরিচিত।

যখন তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই তখন ছ'টি ফুটফুটে ছেলে দরজায় এসে দাঁড়ালো, ছেলে ছ'টিই দেখ্‌তে খুব সুশ্রী। মহেশবাবুর কথা জিজ্ঞেস্‌ করায় তাদের মধ্যে বড়োটি ব'ল্‌লো—"বাবা তো বাড়ী নেই, কটকে গেছেন! ফিরতে এখনো ছ'তিন দিন দেরী আছে!" আমি আমার পরিচয়পত্রখানা তা'র হাতে দিয়ে ব'ল্‌লাম, "তোমার মাকে এই চিঠিখানা দাও।" তখনই সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেলো। আবার পরক্ষণেই ফিরে এসে মৃদু হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লো, "মা বল্‌লেন, আপনি আমার দাদামশাইয়ের দেশের লোক! বাবা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনাকে এখানেই থাকৃতে হবে।" এই ব'লে বাড়ীর

চাকরকে দিয়ে সে আমার বিছানাপত্র ও বাক্স গুছিয়ে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত ক'রলো। স্নানাহারাদির পর আমি মুঙ্গের শহরটি দেখ্‌বার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে প'ড়লাম। দেখ্‌লাম, শহরটি বড়ো নোংরা! যেখানে-সেখানে আবর্জ্জনা ছড়ানো আছে! বাজারের মধ্যে গিয়ে যেন দম আট্‌কে যাবার উপক্রম হয়। বাড়ীগুলো পর পর সারি বেঁধে চ'লে গেছে! মাঝে মাঝে অতি সংকীর্ণ আলো-বাতাসহীন গলি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দেখে শুনে মনে হ'লো, একবার যদি কোনোক্রমে এদের একটা বাড়ীতে কোনো সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ লাভ ক'রতে পারে—আর তা' আদৌ অসম্ভব নয়—তা হ'লে আর রক্ষা নেই, একেবারে মহামারী ব্যাপার! তারপর ভূমিকম্পের একটু মৃদু শিহরণেই আর দেখ্‌তে হবে না!...সে সময় যা' হঠাৎ মনে উঠেছিলো পাঁচটি বছর পরে তাই বাস্তবে পরিণত হ'লো! সমগ্র বিহারে ঐ ভূমিকম্পে মুঙ্গেরই সব চেয়ে বেশী বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কতো লোক যে প্রাণ হারিয়েছিলো, কতো ধনসম্পত্তি যে বিনষ্ট হ'য়েছিলো তার সীমাসংখ্যা ছিলো না!

ওখান থেকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই। দুর্গের বাইরে গঙ্গাতীরে একটা সুন্দর পেভ্‌মেন্ট্‌ আছে। সেখানে ছ'একখানা বেঞ্চও আছে। অনেকেই বিকেলের দিকে এসে বসেন। সান্ধ্য শোভা উপভোগ ক'রবার প্রকৃষ্ট স্থানই বটে! ওপারে শস্যশ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র। দূরে মাঝে মাঝে কৃষকদের পর্ণকুটীর। বাংলার পল্লীবালাদের মতো ওপারের ঐ কৃষকপল্লীর মেয়েরাও কলসী কাঁখে ক'রে ঘাটে আসে, কিছুক্ষণ পরস্পর গল্পগুজব করে, তারপর জল ভ'রে হেল্‌তে-দুল্‌তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এপারে নির্ম্মম শহর, ওপারে শান্ত গ্রাম্য পল্লী শ্রী! বেশ-একটা মধুর অসামঞ্জস্য! কবি তো নই! তাই ভাষার ভেতর দিয়ে কবিত্ব ফোটাতে পারি নে! কিন্তু একথা অস্বীকার

ক'রবার উপায় নেই যে ঐ সব দেখে শুনে কবিজনোচিত ভাব স্বতঃই মনে জেগে উঠ্‌তো। ব'সে সান্ধ্য সমীরণ উপভোগ ক'রছি আর প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ ক'রছি এমন সময় এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে ব'স্‌লেন। ভদ্রলোক বাঙালী, বয়স অনুমান ষাট বৎসর। স্থূল দেহ, মাথায় প্রকাণ্ড একটা টাক, গৌরবর্ণ। ভারীভার্ত্তি লোক অথচ মেজাজের রুক্ষতা আছে ব'লে মনে হয় না। আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলেন। ক্রমে তাঁর উন্মুক্ত উদার চিত্তের আলোকধারা আমার কাছে অতি মধুর ভাবেই উৎসারিত হ'য়ে এলো। তাঁকে দেখে তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে আমার দাদুর স্মৃতি মনে জেগে উঠ্‌লো। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁকেও আমার দাদুর মতোই মনে হ'তে লাগ্‌লো!

তিনি গল্প জুড়ে দিলেন—"দেখুন, এইতো পরশু দিন এসেছি! গোটা দুই কোলিয়ারী আছে, মশাই। সেদিন ঝরিয়ায় আমার কয়লার খনি তদারক ক'রতে গিয়ে এক আজব ব্যাপার ঘ'টেছে! আমি ঝরিয়ায় যাবার পর দিনই দেখি, কুলির সর্দ্দার 'জুম্‌তি'কে ধ'রে নিয়ে এলো আমার কাছে। সে এক মজার গল্প, মশাই—বছর পাঁচেক আগে জানুয়ারীর শেষাশেষি গেছি খনি তদারকে। চিরদিনই ভোরে ওঠা অভ্যাস, সেদিনও উঠেছি। হঠাৎ দরজার পাশে দেখি একটা মানুষের মতো কি যেন কুঁকড়ে দলা পাকিয়ে র'য়েছে। চেয়ে দেখি শীর্ণ একটি বালক, পরণে বা গায়ে বস্ত্র চিহ্নও নেই। তাড়াতাড়ি তুলে ধ'রে ঘরে নিয়ে এলাম। খান তিনেক কম্বল দিয়ে ঢেকেঢুকে একটা তক্তপোষের ওপর শুইয়ে দিলাম। ষ্টোভ্‌ জেলে দড়ির খাটিয়ার নীচে বসিয়ে এক কেট্‌লি গরম জল ক'রলাম। ষ্টোভের আঁচ আর কম্বলের গরম ছেলেটাকে সুস্থ ক'রে তুল্‌লো। কতোক্ষণ পরে

করুণ আলোহীন চোখে যখন সে আমার দিকে চাইলো তখন আর কথা ব'ল্‌বার মতো অবস্থা ওর নেই। আমি কড়া চা তৈরী ক'রে ওকে চামচে ক'রে খাইয়ে দিলাম। ছেলেটি তারপর সুস্থ হ'য়ে ওর সব কথা বল্‌লো। ষ্টেশনে রাত্রি দু'টো-তিনটে পর্য্যন্ত কুলি হবার আশায় দাঁড়িয়ে থেকে যখন একজন বাবুর মোটও পেলো না তখন আমাদের কাছে কিছু খাবার চেয়ে খেতে এসেছিলো। ভীষণ শীতে নগ্ন গাত্রে আগেই ও'র হাতে-পায়ে খিল লেগে এসেছিলো। তারপর যখন আমাদের আড্ডায় এসে পৌছয় তখন শীতে জ'মে অজ্ঞান হ'য়ে বারাণ্ডায় প'ড়ে রইলো। খোঁজ ক'রে জান্‌লাম ও'র মা আর ছোটো এক ভাই আছে। ও'র মা ওকে 'সাদী' দিয়েছে—'জরুও' পাশের গাঁয়েই থাকে। আমি ওকে একটা ছোটো রকমের কাজে লাগিয়ে দিলাম। ঘর ঝাঁট দেয়া, কুলির সর্দ্দারের কাছে কোদাল, সাবোল গুণে রাখা—এই সব হ'লো ও'র কাজ। এই ভাবে কয়েক বছর যেতেই ও বেশ জোয়ান হ'য়ে উঠেছে! এখন ও খনির কুলী হ'য়েছে। হতভাগাটা কয়েকদিন আগে আমার এক কেরাণীর বৌয়ের লাল টুক্‌টুকে একখানা অতি সাধারণ কাপড় চুরি ক'রেছে। ওকে যখন আমার কাছে এনে হাজির করা হ'লো বিচারের জন্য আমি তো অতি কষ্টে হাসি চেপে ধম্‌কে ব'ল্‌লাম, 'এই ব্যাটা, কাপড় চুরি ক'রেছিস্‌ যে বড়ো?' ও নাকি সুরে উত্তর ক'রলো—'না হুজুর, আমি চুরি করিনি। আমার 'জরু' চেয়েছিলো অম্‌নি একটা কাপড়। বাবুকে আগাম্‌ টাকা দেবার জন্য হাতে-পায়ে ধ'রলাম। তা' বাবু দিলো না। 'জরু' রাগ ক'রে চ'লে যেতে চায়! তখন বাবুর বাড়ীতে এসে......।' আর কিছু ও লজ্জায় ব'ল্‌তে পারলো না। আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লাম। সর্দ্দার ও কেরাণীরা তো মহাখাপ্পা! তারা বলে—'বাবু, এম্‌নি ক'রে

কুলীর দলকে মাথায় তুল্‌ছেন ! কড়া শাস্তি না দিলে এরা ঢিট্‌ হবে কেন ?' আমি কোনো উত্তর দিলাম না। মনি ব্যাগ থেকে কয়েকটা টাকা জুম্‌তির হাতে দিয়ে ব'ল্‌লাম—'এই নে তোর বৌয়ের কাপড় কেনার টাকা। সাবধান, আর যেন চুরি করিস্‌ নে ! যা, এখন কাজ কর্‌গে।' সর্দ্দার আর কেরাণীরা দেখি মুখ চূণ ক'রে দাঁড়িয়ে ! কী করি, সবাইকে কিছু কিছু ক'রে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুল্‌লাম। আসবার আগে শুনি—জুম্‌তিকে সবাই খুব বাহোবা দিচ্ছে। আর জুম্‌তি বল্‌ছে—'দেখ্‌ হুজুরের কাছে আমাকে ধ'রে নিয়ে তোদের কতো লাভ হ'লো !' মশাই, একবার গিয়েছিলাম জুম্‌তির বাড়ীতে তার বৌকে দেখ্‌তে। দেখ্‌লাম খাসা বৌটি ! কালো কুচকুচে, কিন্তু স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবে যেন বনদেবীটি !" এই কথা ক'টির পর তিনি চুপ ক'রে যেন ভাবাবিষ্ট হ'য়ে গেলেন ! হয়তো মনের চোখে সেই তরুণ সাঁওতাল দম্পতিকে দেখ্‌ছিলেন।

হঠাৎ আবার সজাগ হ'য়ে আমাকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে ব'স্‌লেন, "বলুন তো মশাই, আমরা দিনের পর দিন গরীবগুলোর অর্জ্জন দু'হাতে লুটে নিয়ে ফেঁপে উঠ্‌ছি আর তারা চ'ল্‌ছে অভাবে-অনশনে কীটের চেয়েও অধম জীবন যাত্রার পথে—এ পাপের হাত থেকে রেহাই আছে কি ? সময় সময় মনে হয়—কাজ নেই খনি-ফনি দিয়ে। লোকগুলোকে ঠকিয়ে আমার একটুও তৃপ্তি হয় না। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র সকলে মিলে চক্রব্যূহ রচনা ক'রে ঘিরে দাঁড়ায় ! কতো যুক্তি বঞ্চনাকে ফলাও ক'রবার জন্য ! পাপকে গোপন ক'রবার জন্য কতো রকমের পুণ্যের কথা, ধর্ম্মের কথা ! আমার একার এই ব্যথাভরা সত্ত্বা নিয়ে আর কী করতে পারি বলুন ? আশ্চর্য্য মশাই, হতভাগাগুলো নিজেরাও এই বঞ্চনায় থাক্‌বার জন্য যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে ! যদি

কখনো ওদের অবস্থা উন্নত ক'রবার চেষ্টা ক'রেছি—ওই সর্দ্দার, ওই কেরাণীবাবুরদল কুলীদেরই মতো আমাকে কঠোর বাধা দিয়েছে ! কাজ আমার এগুতে পারে নি ! ওরা ব'লেছে—'আমরা কি বাবুলোকের মতো ভালো থাক্‌তে পারি, হুজুর ? বেশ আছি ! মাঝে মাঝে আমাদের তাড়ি খাবার কিছু পয়সা দেবেন—আমরা মহাসুখে আপনার খনির কাজ চালিয়ে যাবো ! আপনি বড়ো হ'য়ে উঠুন—তাই আমরা চিরদিন চাই, হুজুর।' মশাই, এই কথা যে আমাকে কতোবড়ো আঘাত দিয়েছে তা' ব'ল্‌বার নয়। এদের আত্মা দীর্ঘ দিনের অবিচারে সঙ্কীর্ণ নর্দ্দমায় পরিণত হ'য়েছে যেখানে বড়ো গাঙের জল এনে ভ'রে দিতে গেলে কূল ছাপিয়ে সর্ব্বনাশের প্লাবন হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু গভীরতার অভাবে সলিলধারা অক্ষুন্ন হবে না। প্লাবন কেটে গেলেই আবার পংকিল ক্ষুদ্র ক্ষীণ নর্দ্দমায় কলুষিত আবর্জ্জনার স্রোতই থাক্‌বে চির সত্য হ'য়ে ! আমি এদের কিছু ক'রতে পারিনি। তবে এদের কাজের সময় কমিয়ে, দু'তিন জন মাষ্টার রেখে হিন্দী-গল্প, কাব্য-কথা শুনিয়ে, খাবার-থাক্‌বার ভালো ব্যবস্থা ক'রে বেশী-মাইনে দিয়ে এদের রুচি ব'দ্‌লে দেবার চেষ্টা ক'রছি। কিন্তু এও কি হবার যো আছে, মশাই ? ঘরে-বাইরে সমানে আমাকে ভয় দেখাবে সবাই—আমি সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌ছি ! বলুন তো, মশাই, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে যদি এদের জন্য কিছু ক'রতে পারি তাই ভালো, না, নিজের সঞ্চয়ের পাহাড় ব'য়ে বেড়ানোই ভালো ? আজ আপনাকে নতুন মানুষ জেনেও সব কথা ব'লে চ'লেছি, তার কারণ কি জানেন ? আমার মনটা নিজের অপরাধের ভারে আর আতংকে যেন কেমন মুষ্‌ড়ে প'ড়ছে !"

কথাগুলো যেন গম্ভীর মহিমায় জীবন্ত হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়তে লাগ্‌লো। বহুক্ষণ আবিষ্ট হ'য়ে বৃদ্ধের মহত্ত্বের কথা ভাব্‌ছিলাম।

জীবনে এমন ভাবে যে আবার আর একটি সত্যিকারের দরদী চিত্তের সংস্পর্শে আস্‌তে পারবো তা' ভাবিনি। এ কি যোগাযোগ? আমার দাদুর স্নেহকোমল মাধুর্য্য কি আজ বিশ্বে ছড়িয়ে প'ড়লো সহস্র সহস্র জীবন্ত স্পন্দনের রূপে? এতোক্ষণ আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে তাঁর কথা শুন্‌ছিলাম। এইবার তাঁকে ব'ল্‌লাম, "আপনার অন্তরের মহিমা আমার আগমনকে সফল ক'র্‌লো। আপনার প্রশ্নের উত্তর এই—আপনার মাঝ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত কল্যাণ অভাগাদের দুঃখ মোচন ক'রে সত্যিই আত্মোন্নতির পথে নিয়ে যাবে। তাদের জীবনে আপনার শুভ সাহায্য সার্থক আশীর্ব্বাদের মতো ঝ'রে প'ড়বে।" কথাবার্ত্তা আর বিশেষ হ'লো না। সূর্য্যাস্তের পর তিনি উঠে প'ড়লেন। হয়তো সন্ধ্যাহ্নিকের তাগিদে আর অপেক্ষা ক'রতে পারলেন না। আমি আরো খানিকক্ষণ সেখানে ব'সে বৃদ্ধের হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাব পর্য্যালোচনা ক'রতে লাগলাম। সত্যিই মুগ্ধ হ'লাম।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বাসায় ফিরে এলাম। তখন মশকের গুঞ্জন সবে সুরু হ'য়েছে। মনে মনে ভাবি, বাংলা দেশের মতো অবশ্য ততোটা উপদ্রব সহ্য ক'রতে হবে না! যদিও মশারী সঙ্গে ছিলো তথাপি ভেবেছিলাম হয়তো ওটা আর ব্যবহারে লাগাবার বিড়ম্বনা সহ্য ক'রতে হবে না! কিন্তু যতোই রজনীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকে ততোই মশকের দংশনভয়ে আমার বুক দুরু দুরু ক'রে কাঁপতে থাকে। আহারাদির পর শয্যাগ্রহণের ব্যবস্থা! মশারীও লট্‌কিয়ে দেয়া হ'লো, কিন্তু মশকের অবিশ্রান্ত আক্রমণে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় জ্ব'ল্‌তে লাগ্‌লাম। পথশ্রান্তিজনিত ক্লেশ অপনোদনের একমাত্র উপায়ই ছিল নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়া, কিন্তু আমার ভগ্যে আর ঐ আশ্রয় মিল্‌লো না! বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রে শরীর-

মন অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়লো। ভোরে শয্যাত্যাগ ক'রে গঙ্গার ধারে গিয়ে সেই বিশ্রামের জায়গাটিতে একখানা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ি। মৃদুমন্দ বাতাসে শীগ্‌গীরই নিদ্রাভিভূত হ'য়ে যাই। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে স্নানের ঘাটে স্নানার্থীদের কলরবে ঘুম ভেঙে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে বাসায় ফিরতেই মহেশবাবুর বড়ো ছেলেটি প্রশ্ন ক'রলো, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আপনার বিছানায় কেউ নেই দেখে মাকে বলায় তিনি খুবই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন! আমরা তো এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজি ক'রে হয়রাণ!" আমি উত্তর ক'রলাম "আমার জন্য যে তোমরা ব্যস্ত হ'য়ে এতোটা কষ্ট পেয়েছো তার জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। মশার জন্য সমস্ত রাত্রে একটুও চোখ বুঁজতে না পেরে ভোর হ'তেই গঙ্গার ধারে একটু বেড়াতে যাই তাই তোমরা আমাকে দেখ্‌তে পাওনি!" ছেলেটি একটু মুচ্‌কি হেসে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেলো।

* * * *

দিন দুই-তিন এইভাবে কাট্‌বার পর দেখি, বাড়ীর সাম্‌নে একখানা টোঙা এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থাম্‌বার শব্দ শুনেই ছেলেরা দৌড়িয়ে বাইরে এলো। 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে'—তাদের এই আনন্দ-কলরব শুনেই বুঝতে আর বাকী রইলো না যে আগন্তুক ব্যক্তিই মহেশবাবু। এঁর চেহারার মধ্যে একটা অ-বাঙালী ভাব যেন বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে! যাহোক, আমার ন্যায় সম্পূর্ণ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে তাঁর নিজ আলয়ে রীতিমতো পরিচিতের ন্যায় ব'সে থাক্‌তে দেখে প্রথমটায় তিনি হতবাক্ হ'য়ে যান। তবে আমি নমস্কার ক'রতেই তিনিও প্রতিনমস্কার করেন।

অল্পক্ষণ পরেই পুত্রদ্বয়ের নিকট জান্‌তে পারেন যে আমি তাঁর শ্বশুরবাড়ীর দেশের লোক! কোন্ বাঙালীর কাছে 'শ্বশুরবাড়ীর

দেশের লোক' আদর-যত্ন না পেয়ে থাকে? তাই তিনি আস্‌বার পর হ'তেই আমার আহার ও বাসের সুবন্দোবস্ত হয়। স্নানাহারাদির পর তিনি আমার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। আমাকে ব'ল্‌লেন,"দেখুন মিঃ চক্রবর্ত্তী, বাঙালীর ব্যাবসা-ট্যাব্‌সা আর এসব দেশে হবার উপায় নেই! আগে যারা যা পেরেছে, ক'রে নিয়েছে। এখন প্রাদেশিকতার বিষ ওদের মধ্যে ঢুক্‌তে সুরু ক'রেছে। বাঙালীকে ওরা সুনজরে দেখে না। এক স্কুল-মাষ্টারী! মুঙ্গেরে তো বর্ত্তমানে কোনো স্কুলেই পদ খালি নেই! তবে আমার এক বিহারী বন্ধু পাড়াগাঁয়ে থাকেন। তিনি জমিদার, নাম তাঁর রায়সাহেব ভগবানদাস। তাঁর নিজগ্রামে তাঁরই নামে একটি স্কুল আছে। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে শুনেছি। আপনি সেখানে গিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন না! আমি রায়সাহেবের নামে চিঠি দিচ্ছি। লোকটি খুব ভালো, আপনার কোনো কষ্ট সেখানে হবে না।" আমি স্কুলমাষ্টারী ক'রবো না ব'লেই বেরিয়েছি, কিন্তু দেখ্‌ছি রাখালী যে একবার ক'রেছে তাকে গোঠের পাঁচন ধ'রে থাক্‌তেই হবে! ফেল্‌বার যো নেই! মহেশবাবু একখানি চিঠি লিখে দিলেন। তাঁর কটক থেকে মুঙ্গেরে ফিরে আসবার দিন দুই পরে এক প্রত্যূষে তথায় রওনা হ'য়ে যাই। গ্রামের নাম গোগ্‌রী-জামালপুর।

সেখানে যেতে হ'লে প্রথমে নদী পথে ষ্টীমারে কতোকটা পথ গিয়ে তবে ট্রেণ ধ'রতে হয়। কয়েকটি ষ্টেশন পরে একটি জংসনে নেবে গাড়ী বদল ক'রতে হয়। এই স্থানে যখন এসে পৌছি তখন বেলা হবে অনুমান দশটা। সেখানে একটু জলযোগ করা গেলো। জলযোগান্তে অন্য গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম। কোনো ষ্টেশনেরই নাম স্মরণ নেই। এই ভুলো মনের জন্য কতো সময় কতো মুস্কিলেই না প'ড়তে হ'য়েছে! যাহোক্, বেলা প্রায় বারোটায় আমার গন্তব্য ষ্টেশনটিতে পৌছানো

গেলো। সেখান থেকে গোগ্‌রী-জামালপুর হবে অনুমান চা'র মাইল দূর। গো-যান অথবা পদ-যান ব্যতীত কোনো প্রকার যানের ব্যবস্থাই সেখানে নেই। একে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, তারপর মার্ত্তণ্ডের তাণ্ডব-লীলা। পদযানের শরণ নিতে সাহসে কুলালো না। তাই, একখানা গো-যানেরই শরণ নেয়া গেলো। বেলা দেড়টায় গিয়ে গ্রামটিতে পৌছি। বিহারের এই পল্লীগ্রামটির শান্তস্নিগ্ধ মাধুর্য্য আমার মনের ওপর একটা পুলকের ছাপ মেরে দিয়ে গেলো। ষ্টেশন থেকে বরাবর ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের রাস্তা চ'লে গেছে। সদর রাস্তা থেকে একটি ক্ষুদ্র অপরিসর অথচ পরিচ্ছন্ন রাস্তা রায়সাহেবের কুঠী পর্য্যন্ত গিয়ে মিলেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি-সারি ঝাউ গাছ! মৃদু হিল্লোলে সঞ্চারিত মধুর শোঁ-শোঁ শব্দ মনে আনন্দের একটা সাড়া জাগিয়ে তুল্‌লো। দূর থেকে রায়সাহেবের কুঠী একখানি ছবির মতো দেখাচ্ছিলো। ও'র পাশেই একটি সুন্দর দেব-মন্দির! সাম্‌নে তৃণাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড চত্বর! আরো খানিকটা দূরে নব-নির্ম্মিত ভগবানদাস হাইস্কুল। তারই এক পাশে বোর্ডিং হাউস্, অপর পাশে হেড্‌মাষ্টারের কোয়ার্টারস্। সাম্‌নে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ! এই সব দেখে খুবই তৃপ্তি বোধ ক'রলাম এবং একটা সুখের কল্পনাও মনে জেগে উঠ্‌লো। ভাব্‌লাম, এখানে হেড্‌মাষ্টারের পদটি পেলে মন্দ হয় না!

যখন রায়সাহেবের কুঠীতে গিয়ে উপস্থিত হই তখন দেখি সুপ্রশস্ত বারান্দাটিতে কয়েকজন লোক ব'সে গল্পগুজব ক'রছে! আমাকে দেখেই তারা বুঝ্‌লো আমি বাঙালী; পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি হ'তে লাগ্‌লো। একজন উঠে এসে প্রশ্ন ক'রলো—"বাবুজী, আপ্ কাঁহাসে আরহা?" উত্তর ক'রলাম,—"মুঙ্গেরসে, রায়সাব্‌কা সাথ্ মিল্‌না চাহ্‌তা হুঁ। মেহেরবাণী কর্ উনহে বোলা দিজীয়ে।" লোকটি বোধ

হয় রায়সাহেবের কর্ম্মচারী। ব'ল্লো, "ঠিক্ হৈ ; আপ্‌তো তস্‌রীফ্ রাখিয়ে, অভি উন্‌কো খবর ভেজ্‌তা হুঁ।" এই ব'লে সে একটি ভৃত্যকে দিয়ে অন্দরে সংবাদ পাঠালো। একটু পরেই পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের এক স্থূলকায় বৃদ্ধ আস্‌তেই বুঝ্‌লাম, ইনিই রায়সাহেব ভগবানদাস! নমস্কার ক'রতেই তিনি প্রতিনমস্কার ক'রে আপ্যায়িত ক'রলেন। পরিচয়পত্রখানি তাঁর হাতে দিলাম। পত্রখানি প'ড়তেই তাঁর মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠ্‌লো। মনে হ'লো,পত্রখানি পেয়ে বেশ খুসীই হ'য়েছেন। পড়া হ'য়ে গেলে তিনি তাঁর নিজস্ব মারাত্মক ভুলপূর্ণ ইংরেজীতে আমার সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে সুরু ক'রে দিলেন। এতে আমি বড়োই প্রমাদ গ'ণলাম। তাঁর বিদ্যের দৌড় দেখে কিভাবে কথাবার্ত্তা চালানো যায় ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। কারণ, আমার মতো আমি ব'লে চ'ল্‌লে তাঁর খুবই অসুবিধে হবে। তাই মুহূর্ত্তেই স্থির ক'রে ফেল্‌লাম, আমার তরফ থেকে বেশী কথা না ব'লে তাঁকেই ব'ল্‌বার সুযোগ দিতে হবে! তা হ'লে তিনি খুসীও হবেন, আবার তাঁর ব'ল্‌বার ভাষা ও ভঙ্গী আমার কাছে উপভোগ্যও হবে! ইংরেজীতে কথা ব'ল্‌তে পেরে তিনি যেন বিশেষ গৌরবই বোধ ক'রছিলেন! অর্দ্ধশিক্ষিত হ'য়েও শুধু টাকার জোরে রায়সাহেব! এক্ষেত্রে ইংরেজীতে কথা বলার সুযোগ পাওয়া কি সহজ কথা?

চেহারাটা কিম্ভূতকিমাকার এবং স্বভাবটা অতি-বেশী নোংরা হ'লেও তাঁর আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা গুণ যে বিশেষ প্রশংসার্হ সেটা কোনোক্রমেই অস্বীকার ক'রতে পারিনে। জাতিতে তিনি কায়স্থ, তাই আমি ব্রাহ্মণ জেনে তখনকার মতো আমার জন্য লুচী-মিষ্টান্নের ব্যবস্থা হ'লো এবং জানিয়ে দেয়া হ'লো, রাত্রিতে দেব-মন্দিরে অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা হবে। বারান্দায় একখানা চেয়ার ও

টেবিল সাজিয়ে দেয়া হ'লো। টেবিলের ওপর একখানা থালায় ক'রে গরম-গরম লুচী ও মিষ্টান্ন রাখা হ'লো। নতুন জায়গা, স্নানটা আর ক'রলাম না। হাতমুখ ধুয়েই আহারে ব'স্‌লাম। সম্মুখে একখানা চেয়ারে রায়সাহেব ব'সে সেই হাস্যকর ইংরেজীতে কথা ব'লে চ'লেছেন! আমি মাঝে মাঝে দু'-একটা জবাব দিয়ে চ'লেছি মাত্র! ক্ষিদের মুখে খুব তৃপ্তির সঙ্গে সবটাই খেয়ে ফেল্‌লাম! আহারান্তে রায়সাহেব আমাকে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ ক'রতে ব'লে আবার অন্দরমহলে চ'লে গেলেন। আমি একটা সোফার ওপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চোখ বুঁজে রইলাম। রোদ প'ড়ে গেলে একটু বেড়াতে বা'র হ'লাম।

বিহার প্রদেশের একটা পাড়াগাঁয়ে এক বাঙালীবাবুকে দেখে সকলেরই অর্থপূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকে! আমি তাদের কারো প্রতি লক্ষ্য না ক'রে শুধু স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রতে লাগ্‌লাম। স্থানটি আমার মনের মতো ব'লে বোধ হওয়ায় বেশ একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব ক'রলাম। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এলাম। তখন পর্য্যন্ত আসল প্রসঙ্গটি উত্থাপিতই হয় নি। রায়সাহেবের আলাপ-ব্যবহারে আমার কিন্তু বিশ্বাস হ'লো পদটি তখনো খালি আছে। তাছাড়া, আমার সঙ্গে কথায়বার্ত্তায় তিনি যেরূপ খুসী হ'য়েছেন তাতে আমাকেই ঐ পদে বাহাল ক'রবেন এই রকম মনে হ'লো! সন্ধ্যার পর যখন আমরা একত্র ব'সে আবার গল্পগুজব সুরু করি তখন কথাপ্রসঙ্গে রায়সাহেব ব'ল্‌লেন, "মিঃ চকোত্তি, বহ্ post অভ্‌তো filled হো গয়া! বহুৎ আপশোষ্‌কা বাত্ ইয়ে হৈ কি ঘোষবাবুকো request রখ্‌নে নহী সক্‌তা হুঁ! ক্যা করুঁ? Very recently বহ্‌ হো চুকা। আপ্ এক কাম কিজীয়ে। আউর এক post তো অভ্ vacant হৈ। বহ্ আপ্‌কো হো সক্‌তা হৈ। বহ্‌ই আপ্ লিজীয়ে!" অন্য পদের জন্য

আমি একটুও লালায়িত ছিলাম না। অন্য কোনো পদ গ্রহণও ক'রবো না স্থির সিদ্ধান্ত ক'রেছিলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের ওপর কিছু ব'ল্‌তে সঙ্কোচ বোধ হ'লো। তাই জানিয়ে দিলাম, মুঙ্গেরে গিয়ে মহেশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একথার জবাব দোবো।

* * * *

জমিদার-ভবনে রাত্রিবাসের স্মৃতিটা জীবনে কখনো ভুল্‌তে পারবো না। কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর রায়সাহেব তাঁর কর্ম্মচারীদের ওপর আমার আহার ও শয়নের সুবন্দোবস্ত ক'রতে আদেশ দিয়ে অন্দরের দিকে প্রস্থান ক'রলেন। খানিকটা সময় আমি চুপচাপ ব'সে রইলাম। ক্রমে চোখ বুঁজে আস্‌তে লাগ্‌লো দেখে একখানা আরাম-কেদারার ওপর গা ঢেলে দিলাম। পথশ্রান্তি হেতু দু'চার মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় বিভোর হ'য়ে গেলাম। কতোক্ষণ যে এ অবস্থায় ছিলাম ব'ল্‌তে পারিনে। কে যেন আমাকে ডেকে ঘুম ভাঙালো। ঘুম ভাঙ্‌লেও তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটে না! আমি উঠে ব'স্‌লাম, মুহূর্ত্ত পরেই তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলো! যে লোকটি আমার ঘুম ভ'াঙালো সে জানিয়ে দিলো—আহার প্রস্তুত। তখন রাত্রি অনুমান এগারোটা। ঘুমে ঢুলুঢুলু-চোখে একটু জলসিঞ্চন ক'রে জমিদারবাটী-সংলগ্ন মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে আহারে ব'স্‌লাম। একটা বিষয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হ'তে হ'লো—দেবমন্দিরে পেঁয়াজ! আমাদের বাংলাদেশের সনাতনী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ও আচারপরায়ণা স্ত্রীলোকেরা অর্থাৎ একমাত্র যাঁরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রটাকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা এপ্রকার অঘটন ঘ'ট্‌তে দেখ্‌লে মার্ মার্ রবে নিশ্চয় ছুটে আস্‌তেন—মুক্ত কচ্ছ হস্তে সনাতনীরা আর সম্মার্জ্জনী হস্তে আচারবতীরা! বাংলা দেশের এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম হ'লেও ঐ নিষিদ্ধ বস্তুটির প্রতি

পুরাদস্তুর আসক্তি আমার বরাবরই আছে। কিন্তু দেবমন্দিরে খেতে গিয়ে ঐ বস্তুটি দেখে আমারো কেমন একটা বিস্ময় বোধ হ'লো, কেন না বাংলায় ওটা অভাবনীয় ব্যাপার! যাহোক, স্থান, কাল ও পাত্রভেদে অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তিটাকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে হ'লো। তখনকার মতো কোনোপ্রকার মন্তব্য ক'রতে বিরত হ'লাম। পরে অবশ্য জান্‌তে পারি যে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও ঐ বস্তুটির ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

আহার কার্য্যটি তো সমাধা হ'লো, এইবার শয়নের পালা! মন্দিরে আহারাদির পর জমিদার-ভবনে ফিরে এলাম। আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট শোবার ঘর দেখিয়ে দেয়া হ'লো। স্বয়ং জমিদারের মাননীয় অতিথি আমি! আমার জন্য কি যত্রতত্র শোবার ব্যবস্থা হ'তে পারে? জমিদারবাটীর বাইরের হলঘরটিতে কর্ম্মচারীদের শোবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিলো। অন্য এক প্রকোষ্ঠে একটা মখমলমণ্ডিত সোফার ওপরে আমার শয্যা রচিত হ'য়েছিলো। কতো যুগ ধ'রে যে ঐ প্রকোষ্ঠটি অব্যবহৃত অবস্থায় প'ড়ে ছিলো তা' একবার মাত্র দৃষ্টিপাতেই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। যাহোক্, আমি নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শুয়ে প'ড়লাম। কিন্তু বেশীক্ষণ আর এতো সুখ সহ্য হ'লো না! মশকের দংশন যদিও বা কোনোরকমে সহ্য হ'য়ে আস্‌ছিলো, কেন না ঝির্ ঝির্ ক'রে বাতাস বইতে থাকায় মশকপ্রভুদের স্থির হ'য়ে ব'সে যথেচ্ছভাবে দংশন ক'রবার অসুবিধে হ'চ্ছিলো, কিন্তু কড়িকাঠ থেকে বিরাটকায় টিক্‌টিকিদের অবিশ্রান্ত প্রস্রাবে যখন একরকম স্নাত হ'য়ে উঠ্‌লাম তখন আর স্থান-ত্যাগ না ক'রে পারলাম না। সেখান থেকে উঠে গিয়ে হলঘরটিতে কর্ম্মচারীদের মাঝখানেই শুয়ে প'ড়লাম। তারা তো এতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও শশব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। একজন ব'ল্‌লো, "বাবুজী, আপ কে

লিয়ে উস্‌কামরামে আচ্ছাতরসে বিস্তারা বিছায়া দিয়া! উস্‌কো পর শো কর্ আরাম কিজীয়ে। ইস্‌মে তো আপ্‌কো বহুৎ তক্‌লিফ হোয়েগা!" আমি ব'ল্‌লাম "আরে ভাইয়া, জেরাসে তক্‌লিফ্ হোনেই দোও। মৈ নে আরাম নহী চাহ্‌তা হুঁ। আরাম করনেবালা যো হৈ বহ্‌তো রায়সাব্ খোদই হৈ! আজ রাত্‌কো তুম্‌হারা সাথ্‌ই শোনে দোও।" এই ব'লে আর কথা না বাড়িয়ে একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে প'ড়লাম। তখন গভীর রাত্রি! সকলেরই চোখে ঘুম! শীগ্‌গীরই অন্যান্য সকলের নাক ডাকা সুরু হ'লো। কিছুক্ষণ পরে আমারো হয়তো ঐ অবস্থাই হ'য়েছিলো, কারণ অনেকেই বলে আমারো নাকি ঘুমের ঘোরে নাক ডেকে থাকে।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ক'রে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন ক'রবার পর মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হ'লাম। অতিপ্রত্যূষেই বহির্ব্বাটীতে রায়-সাহেবের আবির্ভাব হ'য়ে থাকে। তাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে পদব্রজেই ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা ক'রলাম। যথাসময়ে মুঙ্গেরে পৌছে মহেশবাবুকে সব কথা জানালাম। তিনি আর কি ক'রবেন! আমারি দুরদৃষ্টবশতঃ যে এ সুযোগ হারাতে হ'লো এই ব'লে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন।

পরদিন মহেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে ক'ল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে গাড়ীতে বিশেষ ভিড় ছিলো না। জামালপুরে নেবে কিছু জলযোগ ক'রলাম। ওখান থেকে ক'ল্‌কাতাগামী যে গাড়ীটা পেলাম, দেখি তার একটা কাম্‌রা একেবারে ফাঁকা। উঠে প'ড়লাম। গাড়ী ছেড়ে দিলো। তখন ভাব্‌লাম— আচ্ছা, খামখেয়ালী ক'রে এই যে কতকগুলো টাকা ব্যয় ক'রলাম এ'র return কী পেলাম? না হ'লো ব্যবসা, না হ'লো চাক্‌রী! খতিয়ে

দেখি জমার ঘরে কিছুই নেই, যা-কিছু সবই খরচের ঘরে! বড়োই মনস্তাপ ভোগ ক'রতে লাগলাম। তখন প্রথম যাত্রার দিন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনে মনে পর্য্যালোচনা ক'রতে গিয়ে দেখি জমার ঘরটা একেবারে শূন্য নয়! ভূয়োদর্শনের যে লাভ তার কিয়দংশ আমার খতিয়ানে জমার ঘরে প'ড়েছে। একটু পুলকের স্পন্দন তখন অনুভব ক'রলাম! হৃদয়ের ঔদার্য্য-মহিমা মানুষকে সাধারণ মানবের স্তর থেকে কেমন ক'রে অতি-মানবের বা দেবতার স্তরে উন্নীত করে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি আমার স্বল্পকালস্থায়ী প্রবাসজীবনে দুই বৃদ্ধের সংস্পর্শে এসে। কী তন্ময়তাই এসেছিলো সেদিন যখন বৃদ্ধ ব'ল্‌লেন—"আত্মীয় যারা তারা চিরদিনই আমার ছন্নমতি দেখে হতাশ হ'য়ে আমার কথায় কান না দিয়ে নিরাশ ক'রেছে। আমি বুঝি, কিন্তু মনকে তো ফাঁকি দেয়া যাবে না! আমার যে ডাক প'ড়েছে! আমি ভাবি, কি ক'রে আমার মনের সাধকে আমি মরণের পরও জিইয়ে রাখ্‌বো!" এসব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আমার মুখ থেকে তিনি চান নি। গভীর ব্যথায় মানুষের প্রলাপ ব'কতে ইচ্ছে হয়—এও যেন তাই। আমি শুধু উপলক্ষ্য।

একাকী তাঁর মন স্বীয় বেদনার তাপে ফেঁপে ফুসে উঠে যেন বাইরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো বাষ্প-প্রসারের মতো! এ বিশ্বে এমনি শত মানুষের মনের বাষ্প বাইরে বেরিয়ে এসেই বোধ করি নবসৃষ্টির সজল মেঘ আকাশে গেথে দেয়। তারপর অবারিত ধারায় ঝ'রে পড়ে নবজাগৃতির শীতল স্রোত অসংখ্য অগুণ্‌তি রেখায়। বৃদ্ধের চোখে নতুন আলো আর মুখে নতুন আশার উত্তেজনায় গোলাপী রক্তবন্যা যেন ছড়িয়ে যেতে দেখেছিলাম। মনে প'ড়ে যায়— তিনি আমাকে ব'লেছিলেন, 'কতো নিরাশ্রয় ওরা! ওদের মঙ্গল,

ওদের পরিনাম, ওদের উন্নতি, ওদের মহিমা—সব কিছু যে আমাকে আশ্রয় ক'রেছে ....!' শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠ হ'য়ে এসেছিলো ভাবগম্ভীর, চোখে জেগেছিলো আনন্দ আর বিশ্বাসের অশ্রু। এই সব কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতে কোন্ সময় যে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছি জান্‌তেই পারি নি। হঠাৎ বাইরের কোলাহলে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি—ব্যাণ্ডেলে এসে গেছি। কাম্‌রাটিও লোক-ভরতি! প্লাটফরমে নেবে চোখেমুখে জল দিয়ে, একটু মিষ্টি খেয়ে আবার নিজের জায়গাটিতে ব'সলাম। হাওড়া ষ্টেশন থেকে বাসে ক'রে কলেজষ্ট্রীটের মোড়ে এসে নাবি। সেখান থেকে রিক্‌স ক'রে—নং শ্রীনাথ দাসের লেনে গিয়ে উঠি।

(৭)

মুঙ্গের হ'তে ক'ল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবার পর সুদীর্ঘ ছয়-সাত বছরের মধ্যে বাংলার-বাইরে বিশেষ কোথাও আর যাওয়া ঘ'টে ওঠে নি। মাঝে একবার সামান্য কয়েক ঘণ্টার জন্য ঝাঝায় যেতে হয়। কিন্তু অত্যল্পকালস্থায়ী ভ্রমণ হ'লেও স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তাই এ'র বিবরণ লিপিবদ্ধ না ক'রে পারিনে। তবে তার আগেকার একটু-আধটু ঘটনার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ক'ল্‌কাতায় ফিরবার পর আমি আগে যে-বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের পদে ব্রতী ছিলাম তারই নিকটবর্ত্তী এক বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হ'য়ে যাই। ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি বিশেষ কোনো কারণে আমার প্রতি আকৃষ্ট হন! তাই তাঁরা আমাকে ঐ বিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে নিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন নাকি আমার নবীন বয়স অজুহাতে কর্ত্তৃপক্ষের ঐ সঙ্কল্পের বিরোধিতা ক'রতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের বিরোধিতা উপেক্ষা ক'রেও কর্ত্তৃপক্ষ আমাকেই নিযুক্ত করেন। যে-কয়েকজন শিক্ষক আমার নিয়োগ সম্পর্কে বিরোধিতা করেন তাঁরা সকলেই বার্দ্ধক্যপীড়িত। প্রথম হ'তেই ওঁরা আমাকে ঈর্ষা ক'রতে আরম্ভ করেন। মুখে কিন্তু সর্ব্বদাই মধু! আমি সরল ও অকপট ভাবেই তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে আস্‌ছিলাম! অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শিক্ষকগণ ও কর্ত্তৃপক্ষেরও দু'-চার জন বিশিষ্ট সভ্য বৃদ্ধ শিক্ষকদের সম্বন্ধে আমাকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে বলেন। আমার কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ধারণা—যাঁরা শিক্ষকতাকার্য্যে লিপ্ত

তাঁরা খুব বেশী নীচমনা স্বভাবতঃই হ'তে পারেন না। অবশ্য পরে সে ভুল আমার ভেঙে যায়।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সেবার অনেক বিদ্যালয় ধ্বংসোন্মুখ হয়। ঐ ঢেউ এসে আমাদের এই বিদ্যালয়টিকেও জোরে ধাক্কা দেয়। তখন যথেষ্ট সাহস ও কৃতিত্বের সঙ্গে বিদ্যালয়টিকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করি। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এসব কিছুই ঐ সকল ঈর্ষাপরায়ণ, হীনচেতা শিক্ষকদের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। অন্য কোনো অজুহাত না পেয়ে ওঁরা শেষটায় কতিপয় দুর্ব্বিনীত ছাত্রকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। অবলীলাক্রমে তারাও আমাকে অপদস্থ ক'রবার চেষ্টা ক'রতে থাকে। দেখে-শুনে আমার মন ঘৃণায় কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। তখন হ'তে ঐ স্কুলের সংস্রব ত্যাগের সঙ্কল্প করি। ভগবান হয়তো আমার কাতরপ্রার্থনা শুন্‌লেন। কিছুকাল পরে আমার বিরোধীদলের ষড়যন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হয়। কর্ম্ম হ'তে অপসৃত হই! তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ক'ল্‌কাতায় ফিরে আস্‌বার কালে জগদীশ্বরের চরণে মনে মনে এই প্রার্থনা জানাই—"হে প্রভু, এই ক'রো যেন এই জঘন্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রে আর জীবন যাপন ক'রতে না হয়!"

* * * *

অল্পকাল মধ্যেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমার চিরঈপ্সিত ব্যবসার একটা সুযোগ জুটে যায়। বর্দ্ধমান জিলার অবস্থাপন্ন মাহিষ্য-পরিবারের এক যুবক ঘটনাক্রমে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়। সে নিজেই আমার নিকট ব্যবসার প্রস্তাব করে এবং বলে সে মূলধন দেবে আর আমাকে তার পরিচালনার ভার গ্রহণ ক'রতে হবে। সেজন্য লাভের এক-চতুর্থাংশ আমাকে দিতে স্বীকার করে! তার প্রস্তাবে

রাজী হওয়ায় আমাদের ব্যবসা সুরু হ'য়ে যায়। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র পুস্তকের দোকান খোলা হয়। কিন্তু একে মূলধন অতি সামান্য, তার ওপর তাও আবার একযোগে না পাওয়ায় অনেক অসুবিধের মাঝ দিয়ে আমাকে কাজ ক'রতে হয়। যুবকটি ছিলো স্থূলবুদ্ধি! এই শ্রেণীর লোক অতি সহজেই পরবুদ্ধিচালিত হ'য়ে থাকে। যে কারণে ব্যবসা-পরিচালনে আমার অসুবিধে হ'চ্ছিলো তা' তার মগজে গিয়ে ঢুক্‌লো না! তা'র মস্তিষ্কের মধ্যে শুধু এই বিষয়টিই তোলপাড় ক'রছিলো যে মূলধন যখন সে দিয়েছে তখন ব্যবসায়ে লাভ না হ'য়ে আর যায় কোথা? লাভ অবশ্যই হ'চ্ছে তবে আমি তাকে বঞ্চিত ক'রে নিজেই সব আত্মসাৎ ক'রছি! ইন্ধন যোগাবার লোক সংসারে বিরল নয়! তার ইয়ার-বন্ধুগণ তাকে বুঝোতে থাকে যে সে 'বাঙালের' হাতে প'ড়েছে, আর তার নিস্তার নেই! সরলপ্রকৃতি নির্ব্বোধ যুবক শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লো। দোকানের প্রধান অংশীদার হ'য়েও তার এই সাহসটুকু হ'লো না যে আমাকে সে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করে। ফল কথা, তার চালচলনে বুঝ্‌লাম, তার পূর্ব্বের সে সরলভাব আর নেই। মাত্র এক বছর যেতে না যেতেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়! যথাসময়ে যুবকের পিতাকে আমি জানিয়ে দিলাম, তাঁর পুত্রের সঙ্গে ব্যবসা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কেন না আমার ওপর সে আস্থা হারিয়েছে। সুতরাং তিনি যেন অবিলম্বে এসে আমার কাছ থেকে সব বুঝে প'ড়ে নিয়ে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে যান। তিনি কিন্তু এসে বিপরীত কার্য্যটি ক'রে ব'স্‌লেন। আমাকেই দোকানের মালিক ক'রে রেখে গেলেন। মোটামুটি দোকানের একটা মূল্য ধার্য্য হ'লো। কিন্তু আমি অর্থহীন, কোথা থেকে তাঁকে ঐ মূল্যটা দোবো? এতে তিনিই আমাকে বলেন, একযোগে না দিয়ে ক্রমে ক্রমে কিছু ক'রে দিলেই

চ'ল্‌বে ! তবু তো অগ্রিম কিছু টাকা তাঁকে দিতেই হবে ! সেই টাকারই বা সংস্থান কোথায় ?

এদিকে এই কথা শুনেই আমার সহধর্ম্মিনী তার গায়ের সমস্ত অলঙ্কার-পত্র খুলে দেয় ! সকলেই এতে অতিমাত্রায় বিস্ময় বোধ করে। হাস্‌তে হাস্‌তে সে শুধু বলে—"এতে বিস্মিত হবার কি আছে ? অলঙ্কারপত্রের প্রয়োজনই তো বিশেষ কোনো কার্য্যকালে ! লালপেড়ে সাড়ী, সিঁথিতে সিঁদুর আর হাতে নোয়া-শাখা—হিন্দুর ঘরের সধবার পক্ষে এ'র বাড়া অলঙ্কার আর কি থাক্‌তে পারে ?" ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় নিজ সহ-ধর্ম্মিণীর গায়ের অলঙ্কারগুলি বিক্রয় ক'রে দোকানের ধার্য্য মূল্যের কিয়দংশ তখন দিই। তারপর অবশ্য ব্যাবসা চালু রাখবার জন্য আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেকের কাছেই নতুন ক'রে ধার ক'রতে হয়। কিন্তু আমার সহধর্ম্মিনীর এই যে এতোখানি ত্যাগস্বীকার তা'ও কারো কারো মর্ম্ম স্পর্শ ক'রলো না দেখে স্তম্ভিত ও ব্যথিত হই। এই ব্যাবসাসূত্রে কতো মর্ম্মবেদনাই না পেতে হ'য়েছে ! বিনা কারণে কতো আঘাতই না পেয়েছি ! দুর্দ্দৈব ছাড়া একে আর কি ব'ল্‌তে পারি ? এতোদিন পরে ভাব্‌বার সময় এসেছে, এম্‌নি ক'রেই বুঝি মানুষ আশামরীচিকার পেছনে-পেছনে বৃথা ছুটে বেড়ায় ! ছয়টি বছর কঠোর পরিশ্রম ক'রেও যখন দেখি আমি যে-তিমিরে সে-তিমিরেই আছি তখন ভাবি—দূর ছাই! আর বড়োমানুষ হবার কল্পনা ক'রে কি লাভ ? শুধু কষ্ট পাওয়া বই তো নয় ! সার বোঝা বুঝ্‌লাম—There's no armour against fate. তখন হ'তে আবার চাক্‌রীর সন্ধানে রইলাম। অল্পদিনের মাঝেই অল্পায়াসে এক বাঙালী-পরিচালিত অফিসে সামান্য বেতনের এক চাক্‌রী জুটে যায়। চাক্‌রীর মধ্যে স্কুলমাষ্টারী ক'রেছি ! সুতরাং চাক্‌রীর জ্বালাটা যে কি ও কোথায় তা' ততোটা জান্‌তে পারি নি ! চাক্‌রী অর্থে গোলামী।

চাক্‌রী ক'রতে গেলে মানুষকে বিবেকের কণ্ঠরুদ্ধ ক'রে চ'ল্‌তে হয়—এখন হ'তে হাড়ে-হাড়ে সেটা বুঝতে লাগ্‌লাম। ধাতে যা' সহ্য পায় না তা'র অস্তিত্ব আর কতো দিন ? অনাচার-অত্যাচার নিয়তই ঘ'ট্‌তে দেখে অভ্যাসমতো প্রতিবাদ ক'রতে আরম্ভ করি। শেষটায় ঝগড়াঝাটি সুরু হ'য়ে যায় আর চাক্‌রীও ফেঁসে যায় ! ভরসা এই যে তখনো আমার পুস্তকের দোকানের ঠাট্‌টা বজায় ছিলো। কিন্তু তা'র ওপর তো সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না !

(৮)

সঙ্কল্প ক'রলাম, দূরে কোথাও অন্ততঃ একটা স্কুলমাষ্টারী পেলেও দোকান বিক্রী ক'রে সেখানে গিয়েই আমার ক্ষুদ্র সংসারটি পেতে ফেলি! কোনোপ্রকার ঝঞ্ঝাটের ভেতর না থেকে অতি দীনদরিদ্র-ভাবেও শান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্য আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উৎসুক ছিলাম। আসানসোল রেলওয়ে হাইস্কুলের তৎকালীন সহকারী প্রধানশিক্ষক পরলোকগত শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ মুন্সী আমার সুপরিচিত বন্ধু ছিলেন। তিনি সমস্ত অবস্থা সম্যক্ অবগত হ'য়ে আমাকে জানান, ঝাঝায় রেলওয়ে স্কুলের জন্য একজন হেড্মাষ্টারের প্রয়োজন। স্কুলটি তখনো হাইস্কুলে পরিণত হয় নি। নতুন হেড্মাষ্টার যিনি নিযুক্ত হবেন তাঁকেই চেষ্টা ক'রে এই কাজটি সম্পন্ন ক'রতে হবে। যতীনবাবুর পরামর্শমতো ঐ স্কুলের কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি আবেদনপত্র দাখিল করি! তারপর ঝাঝার এক ধনী ব্যবসায়ীর বরাবর একখানা পরিচয়পত্র নিয়ে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রওনা হই।

তখন গরম খুবই ছিলো, তার ওপর গাড়ীতে অত্যধিক ভিড় হওয়ায় যাত্রীদের কষ্টের অবধি ছিলো না। গাড়ীখানিতে একমাত্র আমিই ছিলাম বাঙালী, অন্যান্য সবাই বিহারী। সুতরাং আমার অবস্থা সহজেই অনুমান ক'রে নেয়া যেতে পারে! বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আমাকে সমানে দাঁড়িয়েই আস্তে হয়! তা'দের বর্ব্বরোচিত কাণ্ডকারখানা দেখে সামান্য একটু ব'সবার স্থানের জন্য কোনোই অনুরোধ করিনি। হয়তো আমার অসীম ধৈর্য্য দেখেই জনৈক যাত্রীর মন কথঞ্চিৎ নরম হয়। এতোক্ষণ সে পূর্ণশয়ান অবস্থায় ছিলো, এখন অর্দ্ধশয়ান হ'লো। তারপর আমাকে

বলে—"বাবুজী, আপ্ ইধর বৈঠিয়ে। বড়া সরমকা বাত্ হৈ কি হাবড়াসে বর্দ্ধমান তক্ আপ্ খাড়া হো কর্ আরহা! বৈঠিয়ে ইধর, বৈঠিয়ে, বাবুজী।" মনে মনে বলি, এতোক্ষণ তো এই কৃপাবারিটুকু বর্ষিত হয়নি বাবা! এখন তো দেখ্ছি, দরদ উত্লে উঠ্ছে! যাহোক, ব'স্বার একটু স্থান পেয়ে হাফ্ ছেড়ে বাঁচি! কিন্তু মুখে ব'ল্লাম, "নহী, নহী, মেরা তো কুছ্ভি তক্লিফ্ নহী হৈ! আপ্ সব আরাম কিজীয়ে! মেরে লিয়ে মত্ ঘাব্ড়াইয়ে।" লোকটা আমার কথায় গ'লে গেছে বোঝা গেলো। ফলে, গাড়ীতে অতো বেশী ভিড় থাকা সত্ত্বেও ঝাঝা পর্য্যন্ত বেশ আরামেই ব'সে যেতে পারলাম। Non-violence-এর জোরটা বেশ উপলব্ধি করা গেলো! রাত যতোই বেড়ে চলে বিহারী কলগুঞ্জন ততোই ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে আস্তে থাকে। সকলেই নিদ্রায় বিভোর হ'য়ে পড়ে। আমার পাশের লোকটার অর্থাৎ যে-লোকটা 'মেহেরবাণী' ক'রে আমাকে ব'সবার একটু স্থান দেয় তার নাসিকাগর্জ্জনে ঘুমন্ত যাত্রীদের মাঝেও কয়েকজন ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বোধ করি, তারা স্বপ্ন দেখে যে 'তাদের দলের' মাঝে বাঘ প'ড়েছে! কিন্তু চোখ মেলে যখন দেখে, গর্জ্জন বাঘের নয়—মানুষের, তখন তাদের সম্মার্জ্জনীশলাকাবৎ স্থূল ও লম্বমান গুম্ফকে যথাক্রমে সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিত ক'রে পুনরায় চোখ বোঁজে! 'সকল ব্যথার ব্যথী' আমিই শুধু জেগে ব'সে থাকি! কিন্তু গাড়ীর ঝাঁকুনি লাগায়, ফুরফুরে হাওয়া বইতে থাকায়, আর তার ওপর গাড়ীর অন্য যাত্রীদের নিদ্রালু ভাবটা সংক্রমিত হওয়ায়, চক্ষু না মুদে ব'সে থাক্তে পারে কার সাধ্য? আমিও অল্পক্ষণ মধ্যেই ব'সে ব'সে ঢুল্তে লাগলাম। সেই ঢুলু-ঢুলু ভাবটা কতোক্ষণ ছিলো জানিনে তবে নানা রকমের ডাক-হাঁকে যখন ঐ ভাবটা কেটে যায় তখন দেখি মধুপুরে এসে গেছি। শিমুলতলায় যখন পৌঁছি

রাত্ তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এ'র পরের ষ্টেশনই ঝাঝা। ঝাঝায় গিয়ে যখন পৌছি তখনো একটু-একটু আঁধার! প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টেশন-প্লাটফরমের একখানা বেঞ্চের ওপরেই চোখ বুঁজে প'ড়ে রইলাম। ফাঁকা জায়গা! ফুরফুরে হাওয়া! ঘুমে চোখ বুঁজে এলেও জোর ক'রে জেগে রইলাম। যদি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ি আর বেলা বেড়ে যায়—এই ভয়! ভোরের আঁধারটা কেটে যেতেই সর্ব্বপ্রথম যে দৃশ্য নজরে প'ড়লো তা' দেখে বিপুল আনন্দ উপভোগ ক'রলাম। ষ্টেশনটির পৃষ্ঠদেশ ঘেঁসে অনতি-উচ্চ এক পাহাড় মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দূর হ'তে ওটাকে ষ্টেশনঘরের পেছনের দেয়াল ব'লেই ভ্রম হয়।

চারিদিকই ফাঁকা! মাঝে মাঝে এক-একটা অতি-সাধারণ রকমের বাড়ী! ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো! দূরে—বহুদূরে ছোটো-ছোটো পাহাড়! মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য ঝরণা! নানাজাতীয় ফুল ফল! প্রাণ-মাতানো গন্ধ! মার্চ্চ-এপ্রিল মাসেও ভোর বেলায় কেমন একটা মিঠে-মিঠে ঠাণ্ডা! এই সব দেখে ও অনুভব ক'রে প্রাণের মাঝে একটা আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যায়। ঝাঝায় ই-আই-আর এর একটা বড়ো কারখানা। তা'ছাড়া দূর-দূরান্তর হ'তে অনেকে হাওয়া বদ্‌লাবার জন্যও এখানে এসে অস্থায়ীভাবে বসবাস ক'রে যান। স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবেও এ স্থানটির সমাদর আছে। মনে মনে কতো আশা পোষণ ক'রে এসেছি, কতো কল্পনা ক'রে আছি এই রকম একটা স্থানে গিয়ে বাস ক'রলে বেশ একটা অনাবিল শান্তি পেতে পারি! কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ! যা হোক, প্রভাত হ'তেই সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। ষ্টেশনের অতি নিকটেই তাঁর বাড়ী। গিয়ে দেখি তখনো কারোও ঘুম ভাঙেনি। তাই কিছুক্ষণ বারান্দার ওপর

পায়চারি ক'রে সময় কাটাতে থাকি। যখন দরজা খোলা হ'লো তখন এক বাঙালী যুবকের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। আলাপ ক'রে অবগত হই, যুবকটি উক্ত ব্যবসায়ীর এক কর্ম্মচারী। যথাসময়ে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হয়। বেশ শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি। দেখ্‌লেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হয়, অতি অমায়িক ব্যবহার! অনাবশ্যক কথা বলা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিহারী হ'লেও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন। ফলকথা, তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তৃপ্তই হ'লাম। আমার বন্ধুর লিখিত পত্রখানি প'ড়ে তিনি বাঙালী যুবকটিকে স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট আমাকে নিয়ে যেতে ব'লে দিলেন।

তাঁর আদেশমতো যুবকটি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। ইনি রেলওয়ের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। ভদ্রলোক বাঙালী, হাওড়া জিলার অন্তঃপাতী সাতরাগাছির বাসিন্দা, জাতিতে ব্রাহ্মণ। ঐ পদে বাহাল ক'রবার পক্ষে যে সকল অন্তরায় ছিলো তিনি আমাকে তা' বুঝিয়ে ব'ল্‌লেন। খোলাখুলি সব কথা বলায় তাঁর ওপর আমি বরং সন্তুষ্টই হ'লাম। কিন্তু কেন যেন মনে হ'লো, তাঁর ব্যবহারের মধ্যে একটা সৌজন্যের অভাব আছে। তিনি যেন স্কুলের সেক্রেটারী সেজেই ব'সে আছেন! মনে হ'লো, এই প্রকৃতির লোক যাদের ওপর একবার কর্ত্তৃত্ব ক'রবার সুযোগ পেয়ে থাকে তাদের কতোই না নাস্তানাবুদ হ'তে হয়! পদটি না পাওয়ায় মনটা অবশ্য সাময়িকভাবে একটু দ'মে যায়। আশা ক'রে এলাম অথচ আশানুযায়ী ফল হ'লো না—এইটেই মন দ'মে যাবার কারণ। এ রকমের দুঃখ মাঝে-মাঝে পেতেই হয়! এই নিষ্ফলতার মূলে ছিলো আমার চাকুরে-মনোবৃত্তির অভাব—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অন্তর্য্যামী জানেন, অন্তরে-অন্তরে আমি ও'র ঘোর বিরোধীই ছিলাম।

এই যে বাংলার-বাইরে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি তা' শুধু নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিময় জীবন-যাপনের উৎস সন্ধানে, স্কুলমাষ্টারী ক'রবো বা অন্য কোনো চাক্‌রী ক'রবো নিছক এই উদ্দেশ্যেই নয়! একটা কিছু অবলম্বন ক'রে থাকা চাই তো—এই যা!

ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি আমার এই ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশ ক'রলেন। তিনি আমাকে সেদিন তাঁর গৃহে আতিথ্য স্বীকার ক'রতে অনুরোধ জানালেন। আমি সবিনয়ে জানিয়ে দিলাম বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে, পরবর্ত্তী ক'ল্‌কাতাগামী ট্রেণেই প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবো। এই ব'লে তাঁর কাছে বিদায় নিলাম। ষ্টেশনে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে বেলা দশটার ট্রেণে উঠে ব'স্‌লাম। অণ্ডাল ষ্টেশনে এক বাঙালী ভদ্রমহিলা তাঁর এক আট-নয় বছরের মেয়েকে নিয়ে আমি যে কাম্‌রাটিতে ছিলাম সেই কাম্‌রাটিতে এসে উঠ্‌লেন। আমি একটা বেঞ্চ অধিকার ক'রে ব'সে ছিলাম। সসম্ভ্রমে তাঁকে বেঞ্চখানা ছেড়ে দিয়ে সাম্‌নের বেঞ্চখানিতে একটু স্থান ক'রে ব'স্‌লাম। ভদ্রমহিলা আমার ব্যবহারে খুবই প্রীত হ'লেন। তিনি আধুনিক রুচিসম্পন্না ও প্রগতিশীলা। বিধবা, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। বেশ তেজোদীপ্ত চেহারা। তাঁর স্বর্গত স্বামী ছিলেন পুলিশ সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর। স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি ছিলেন লম্পট। তাঁর কুদৃষ্টি ছিলো ভ্রাতৃবধুর ওপর। বিধবা হবার পর ঐ লম্পটের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ছেলেটি ও মেয়েটিকে নিয়ে ভদ্রমহিলা আপন পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের এই সব দুঃখ-কাহিনী অকুণ্ঠিতচিত্তে ও অযাচিতভাবে আমার ন্যায় এক অজ্ঞাতকুলশীলের নিকট বর্ণনা ক'রতে কোনোই দ্বিধা বোধ তিনি ক'রলেন না! বৃদ্ধ পিতা অণ্ডালে ডাক্তারী করেন, তাঁরই কাছে থেকে বিধবার পুত্রটি অণ্ডাল রেলওয়ে স্কুলে পড়ে। ব'ল্‌লেন তিনি সাল্‌কে

(হাওড়া) যাবেন। সেখানে এক বালিকা-বিদ্যালয়ে নাকি তিনি শিল্প শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁর হাতের অনেক শিল্পের কাজ দেখালেন। আমার বাসার ঠিকানা নিয়ে ব'ল্‌লেন, একদিন গিয়ে আমার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসবেন। যথাসময়ে হাওড়ায় নেবে আমরা নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান ক'রলাম! কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা আমার বাসায় কখনো আসেন নি।

(৯)

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমার জীবনে এক প্রলয় উপস্থিত হয়। দোকানটিও উঠে যায়, আমার জীবনসঙ্গিনীও সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অমরধামে প্রস্থান করে। কী সে মর্ম্মবেদনা! কাকে বোঝাবো? আর কে বা বুঝবে? সেই করুণ স্মৃতিই আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সান্ত্বনা!

একটি মাত্র কন্যা সন্তান আমাদের। তাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত মনে সে চ'লে যায়। মেয়েটিকে নিয়ে আমি অকুল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকি! অমঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিন্তু করুণাময় আমাকে সংসারের বিবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভে সহায়তা ক'রেছেন। তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন, বাহ্যতঃ যাদের 'আপন' 'আপন' ব'লে আমরা আঁকড়ে ধরি, তারা সত্যিই 'আপন' নয়। আপন-পরের সংজ্ঞা-বোধটা ব্যবহারিক জগতে প্রায়ই বিপরীত হ'য়ে দেখা দেয়। মেয়েটিকে তার মাতুলালয়ে রেখে আমাকে একবার এলাহাবাদে যেতে হয়। সেখানকার বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের জন্য একখানা গ্রন্থ প্রণয়ণের ভার গ্রহণ ক'রে আমি সেখানে যাই। কিন্তু ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে আমার কোনো সম্বন্ধ ছিলো না। ক'ল্‌কাতার এক গ্রন্থ ব্যবসায়ী আমাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। টাকা-পয়সা যা' দেবার তিনিই আমাকে দেবেন এরূপ একটা মৌখিক চুক্তি তাঁর সঙ্গে হয়। ক'ল্‌কাতা থেকে তিনি পূর্ব্বেই এলাহাবাদে যান, আমি যাই দিন দু'চার পরে।

এই সূত্রে একটা গোপন তথ্য প্রকাশ না ক'রে পারিনে। সত্যিকার

গ্রন্থলেখক যাঁরা তাঁরা কিরূপভাবে exploited হন তারই একটা আভাস এ'তে দেয়া হ'চ্ছে। আমাদের দেশে হিন্দু জেলে ও মুসলমান নিকেরী —এই দুই শ্রেণীর মৎস্য-ব্যবসায়ী আছে। জেলেরা অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে মাছ ধরে—গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ ও শীতের ভীষণ হিম ও'রা গ্রাহ্য করে না। নিকেরীরা কিন্তু অত্যল্পমূল্যে ও'দেরই কাছ থেকে মাছ কিনে অত্যধিক মূল্যে বাজারে বিক্রী করে। ফলে, তারা সকলেই অবস্থাপন্ন আর জেলেদের চরম দুরবস্থা চিরটা কাল! আমাদের মতো গ্রন্থলেখকদের অবস্থাটা ঐ জেলেদেরই সামিল! কষ্ট ক'রবো আমরা, দুঃখ পাবো আমরা, আর সুখভোগের বেলায় তা'রা যাদের বিস্তর পয়সা আছে, বাজারে সুনাম আছে। কয়েক ব্যক্তি খ্যাতনামা গ্রন্থকার ব'লে বাজারে সুপরিচিত। তাঁরা নাম বিলিয়ে পয়সা রোজগার করেন। গ্রন্থ তাঁরা লেখেন না বা চোখ মেলে একবার দেখেনও না। দেখার মধ্যে দেখেন শুধু—Cover ও Title তাঁদের নাম বহন ক'রছে কিনা! প্রকাশকেরা তাঁদেরই সম্মান দেন, পয়সা তাঁদেরই দিয়ে থাকেন। যাঁদের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ বিকিয়ে পয়সা রোজগার হয় তাঁরা বাজারে অজ্ঞাতই র'য়ে যান। কোনো-কোনো স্থলে আবার এমন দু'এক ব্যক্তিও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যাঁরা নিজেরা গ্রন্থ লেখেনও না, নিজেদের নামে প্রকাশও করেন না, অথচ মাঝখান থেকে মোটা টাকা রোজগার করেন। এঁরা যাঁকে দিয়ে গ্রন্থ লেখান তাঁকে সামান্য পয়সা দিয়ে দূর করেন, গ্রন্থকার হিসেবে যাঁর নাম বা'র হয়, তাঁকে চুক্তিমতো একযোগে কিছু দিয়ে বিদায় করেন। গ্রন্থের স্বত্ব তাঁদেরই থাকে। প্রকাশকের সঙ্গে যেরূপ বন্দোবস্ত থাকে তদনুযায়ী তাঁদের মধ্যে আদান-প্রদান চলে। এই গ্রন্থব্যবসায়ী শেষোক্ত শ্রেণীর লোক। গ্রন্থলেখকরূপে নিযুক্ত ক'রে আমাকে তিনি এলাহাবাদে নিয়ে যান। তাঁর সততার ওপর নির্ভর ক'রেই

আমি তথায় যাই। ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত ছিলেন, কিন্তু এঁর সঙ্গে কখনো আমার কোনো রকমের আদান-প্রদান হয় নি। সুতরাং ব্যবসায়ী হিসেবে এঁর কোনো পরিচয় পাবার সুযোগও আমার আগে হয় নি।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আমাকে এই কার্য্যোপলক্ষে এলাহাবাদ যেতে হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা আগেই বিজলী আলোক-শোভিত, বহুজন-গুঞ্জিত হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে পৌছি। যথাসময়ে গাড়ীতে গিয়ে বসি। টিকেট আগেই ক'রে রাখা হয়। হাওড়া ষ্টেশনে টিকেট ক'রবার ঝঞ্ঝাট আর পোহাতে হয় না। আমার আত্মীয়-বন্ধু দু'চারজন see off ক'রতে এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই গাড়ীতে স্থান ক'রে ব'স্লেন, যেন সকলেই দূরপথের যাত্রী! ক্রমেই ভিড় জ'ম্তে থাকে। শেষকালে 'ন স্থানং তিলধারণম্'বৎ অবস্থার উদ্ভব হয়! গাড়ী ছাড়লেই বাঁচি! গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হ'লো। তার ওপর এই দীর্ঘ পথ কোনো রকমে ব'সে থেকে কাটাতে হবে আশঙ্কায় হতবুদ্ধি হ'য়ে যাই। কিছুক্ষণ পরে সিটি মারতেই আমার বন্ধুগণ গাড়ী থেকে নেবে পড়েন। এতে আমি একটু ভালোভাবে ব'স্বার সুযোগ পাই। এতোক্ষণ পরে লক্ষ্য ক'রবার অবসর এলো আমাদের ঐ গাড়ীটিতে আমরা দু'চারজন বাঙালী যাত্রী ব্যতীত বাকী সকলেই অ-বাঙালী। ......গাড়ী ন'ড়ে উঠে, হুস্ হুস্ শব্দে চ'ল্তে সুরু ক'রলো! বন্ধুগণ গাড়ীর গতির সাথে-সাথে একটু চ'লে তাঁদের হাতের রুমাল নেড়ে আমাকে বিদায়-অভিনন্দন জানিয়ে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে ফিরে গেলেন।

দিল্লী মেল! একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়ে থাম্বে! গাড়ী যেন উড়ে চ'ল্লো, কিন্তু রাত্রি-কাল—ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বের দৃশ্য উপভোগ ক'রবার উপায় নেই! কিছুক্ষণ

বাদে দেখি, আজে-বাজে কথার আদান-প্রদানের পর সকলেরই চোখ ঢুলু-ঢুলু! এক যাত্রী অপর যাত্রীর গায়ের ওপর ঢ'লে প'ড়ছে! অগত্যা 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা'—আমিও অ-বাঙালী মহাজনদের পদাঙ্কানুসরণ ক'রলাম। অকস্মাৎ চিরপরিচিত রসনার তৃপ্তিকর মধুর 'চাই সীতাভোগ-মিহিদানা' হাঁক-ডাকে তন্দ্রার ঘোর কেটে যায়! বর্দ্ধমান ষ্টেশন! তখনো কিন্তু আমার পাশের অ-বাঙালী যাত্রী বন্ধুটির ঘাড়-ঝাঁকুনি পূর্ণোদ্যমেই চ'লেছে। একটু পরেই বাঁশী বেজে উঠ্লো, নীল আলোর সঙ্কেত হ'লো, গাড়ীও ছেড়ে দিলো। এমন সময় এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হ'য়ে দৌড়ে এসে উঠে প'ড়লেন আমাদের কাম্রায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জ'মে যায়। তিনি ব'ল্লেন একটি ছেলের কথা। নাম তার অসিত। নামের সাথে তার আকৃতি-ধর্ম্মের নাকি বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিলো।

তিনি ব'লে চ'ল্লেন—"কালো আবলুসের মূর্ত্তির মতো আকৃতি নিয়ে সে যেদিন সিউড়িতে এসে উপস্থিত হয় সেদিন তার পরিচিত কোনো ব্যক্তিই সেখানে ছিলো না! দ্বারে-দ্বারে লাঞ্ছিত হ'য়ে সে সাঁওতালদের সাথে যেন কি ক'রে খাতির জমিয়ে ওখানে বাহাল হ'য়ে রইলো। তারপর সিউড়ি শহরে ও আশে-পাশে দেখা দিলো ভীষণ বসন্ত রোগ। ঘরে ঘরে শয্যাশীন নরনারী! সামান্য শুশ্রূষা ক'রবার মতো লোকেরও অভাব হ'লো! এমন লোকও ছিলো যার জল দেবার মতোও কেউ ছিলো না। যার পালাবার মতো অবস্থা ও উপায় ছিলো, সে পালাচ্ছিলো! মৃত্যু যেন বড়ো করাল হ'য়েই সেদিন সিউড়িতে উৎসব সুরু ক'রেছিলো! বস্তীতে হঠাৎ অসিত তার সাঁওতাল-বাহিনী নিয়ে শুশ্রূষার কাজে মেতে গেলো। তার সাথে দশ-পনেরো জন কালো-কালো স্বাস্থ্যবান্ সাঁওতাল যুবক হঠাৎ

সেদিন সে মৃত্যুপুরীতে কল্যাণের দূতের মতোই দেখা দেয়! তাদের প্রসন্ন সেবা যেদিন বস্তী ছেড়ে ভদ্রপল্লীতে প্রবেশ লাভ ক'রলো সেদিন সহৃদয় সম্বর্দ্ধনা না পেলেও অসিত বহু মুমূর্ষুর কাতর ধন্যবাদ লাভ ক'রেছিলো। সে যে কখন বাঙালী জীবনের অতি-আবশ্যক বন্ধু হিসেবে অত্যাজ্য হ'য়ে প'ড়লো তার কথা কেউ জানে না। ধীরে ধীরে যখন বসন্তের প্রকোপ ক'মে যায় তখন অসিত নিমন্ত্রণ পায় প্রতি গৃহে, আদর ও সৌহার্দ্দ পায় প্রতি হৃদয়ের। অসিতের কালো রূপ শেষ পর্য্যন্ত যেন নয়ন-তারকার কালো জ্যোতির সাথে মিশে গেলো। পরে জানা যায়, অসিত লেখাপড়া শিখেছে বেশ যত্ন ক'রেই। ডিগ্রী তার উঁচু রকমের না থাকুলেও ডিগ্রীদারদের ওপর ডিক্রি চালাবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি তার যথেষ্টই আছে। যখন সিউড়ির ভদ্রসমাজ একটা স্কুল খোলবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি ক'রে ধ'রলো তখন তার ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য একটা পাঠশালা না খুলে আর গত্যন্তর রইলো না। অসিতের পক্ষে সে আয় বেশ প্রচুরই ব'ল্‌তে হবে! তারপর হিতৈষীর দল উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন ঘর-ছাড়াকে ঘর-মুখো ক'রবার সাধনায়।

অসিতকে সেখানে যে দেখেছিলো সেই ভাব্‌তো কোনো বন্ধনই কোনো দিন ওকে আট্‌কাতে পারবে না। বল্‌গাহীন হ'য়ে জীবনের সুপ্রসর উপত্যকায় ও ছুটে বেড়াবার জন্য সৃষ্টি হ'য়েছে—বাধা যদি আসেও ও লাফিয়ে ডিঙিয়ে যাবে! হিতৈষীর দল পরম আশ্বস্ত চিত্তে দিনক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক ক'রে ও'র জন্য এক কুমারীকে মনোনীত ক'রে ফেল্‌লেন। তারপর পরিণয়-দিবসের দু'চার দিন আগে মেয়ের বাপের নামে একখানা ছোটো চিঠি শুধু অসিতের কাছ থেকে গেলো। তাতে লেখা ছিলো—'শেষটায় আপনাকে দুঃখ দিতে হ'লো। আমার মতো

স্বামী আপনার কন্যার জীবনকে দুর্ভর ক'রে তুল্‌তো। আমি এখানে থাক্‌লে আপনার আবেদন ও বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষীবর্গের অনুরোধ এড়াতে না পেরে হয়তো আপনার কন্যাকে বিয়ে ক'রে সর্ব্বনাশ ঘটাতে পারি, এই আশঙ্কায় এস্থান ত্যাগ ক'রে যেতে বাধ্য হ'লাম। আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, এই স্মৃতি নিয়েই আমি আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা ক'রলাম। আমার শুভেচ্ছা, প্রীতি ও নমস্কার সকলকে জানাচ্ছি।' আমিও অসিতের কথা ভুল্‌তে পারি নি, মশাই। কতো সময় কতো উপাকারই না পেয়েছি! সাঁওতাল পল্লীতে প্রত্যেকেই তার জন্য কেঁদেছে!"

এই পর্য্যন্ত ব'লেই ভদ্রলোক ভাবগম্ভীর হ'য়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। এ গল্প শুন্‌বার পর ভারতের অগণ্য নগর, কান্তার সেই অসিতের ছায়াময় হ'য়ে দেখা দিলো। আমি এই একমাত্র স্বপ্নে আচ্ছন্ন হ'য়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। কোন্ সময় গাড়ী আসানসোলে পৌঁছে আবার সেখান থেকে ছেড়ে গেছে কিছুই টের পাইনি। আমার পাশে একটি বালক ব'সে ব'সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে! কিছুক্ষণ বাদে আমিও ব'সে ব'সে ঢুল্‌তে লাগলাম! হয়তো আমাদের মতো ঘুমোবার সৌভাগ্যটুকু হ'তে যে যাত্রী বঞ্চিত হ'য়েছে অপর দিক দিয়ে আবার তার সৌভাগ্য দ্বিগুণিত হ'য়েছে—সে আমাদের নিদ্রার অপরূপ ও অপূর্ব্ব দৃশ্যটি সম্যক্ উপভোগ ক'রে ধন্য হ'চ্ছে! একটি শব্দে সচকিত হ'য়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসি। কে যেন ব'লে উঠ্‌লো, 'শোন্ ব্রিজ!' পাশের বালকটির গায়ে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙালাম। ব'ল্‌লাম, রাত্রি শেষ হ'য়ে এসেছে আর ঘুমোবার প্রয়োজন নেই। শোন্‌ব্রিজটা অতি দীর্ঘ। তখনো অন্ধকার র'য়েছে, ভালো ক'রে দেখ্‌বার উপায় নেই।' তবু ঔৎসুক্য দমন ক'রতে না পেরে

চসমার ভেতর দিয়ে দৃষ্টিশক্তিকে জোর ক'রে বা'র ক'রলাম। কিন্তু কিছুতেই উদ্দেশ্য সফল হ'লো না।

আরো কয়েকটি ষ্টেশন অতিক্রম ক'রবার পর দেখি চারিদিক পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌ছে। তখন উভয় পার্শ্বের দৃশ্য অবলোকন ক'রবার সুযোগ পাই। পাহাড়গুলো দেখে বেশ একটা কৌতূহলপূর্ণ আনন্দ অনুভব ক'রতে লাগ্‌লাম। কোনো স্থানে দেখি, এক ক্ষীণ স্রোতস্বিনী এঁকে বেঁকে চ'লেছে আর তা'রই ধার বেয়ে ধীর মন্থর গতিতে চ'লেছে কয়েকটি উট—তাদের প্রত্যেকের পিঠে এক-একটি বালক! দূরে পাহাড়ের ওপর দু'একটি মন্দির মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী। ও'দের একটি পল্লী থেকে কতকগুলি গরু নিয়ে ও লাঙ্গল ঘাড়ে ক'রে একটি লোককে বা'র হ'তে দেখা গেলো।......ঐ সব পেছনে ফেলে অনেকদূর চ'লে এসেছি। বহুদূর-বিস্তৃত পাহাড় মেঘের সাথে গিয়ে মিশেছে। শুন্‌লাম ঐটেই নাকি বিন্ধ্যাচল! নামটি শুনেই ঋষি অগস্ত্যের বিন্ধ্যের প্রতি আদেশের কথা স্মরণ হয়। বিন্ধ্যাচল দেখে কতো কথাই মনে হয়! কতো গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, কতো দেশপর্য্যটক বিন্ধ্যাচলে পরিভ্রমণ ক'রছেন! ভাবি, তাঁদের মতো সুখী কে? ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল দেখে তাঁরাই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সার্থক ক'রে তুল্‌ছেন, নয়ন পরিতৃপ্ত ক'রছেন!

রেল লাইনের উভয় পার্শ্বে যে-সকল আম গাছ দেখ্‌তে পাই তাদের প্রত্যেকটিই অজস্র গুটিতে ভর্‌তি। ... ..আমাদের গাড়ী অবিশ্রান্তভাবে ছুটেই চ'লেছে! কোনো সময় হয়তো আমরা উঁচুতে চ'লেছি, উভয় পার্শ্বের বাড়ী-ঘরগুলো নীচুতে র'য়েছে আবার কোনো সময় বাড়ী-ঘরগুলো উঁচুতে আছে, আমরা নীচুতে চ'লেছি। এইরূপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা যমুনা ব্রিজের ওপর এসে উঠ্‌লাম। ওপারে এলাহাবাদ ফোর্টটি দেখা যাচ্ছে!

দূরে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল কেউ হয়তো অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখায়, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না। এতোক্ষণে গাড়ী এলাহাবাদ শহরের ভেতরে এসে প'ড়েছে। এলাহাবাদ শহরের মধ্যস্থল ভেদ ক'রেই রেল লাইন গেছে। আমিও মালপত্র গুছিয়ে একস্থানে রাখ্‌লাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী এলাহাবাদ ষ্টেশনে এসে থামে। কুলী ডেকে মালপত্র নাবিয়ে ফেলি। বেলা তখন দশটা। মামুলী কথা কাটাকাটির পর কুলীভাড়া চুকিয়ে দিয়ে টোঙা ভাড়া ক'রে আমি আমার গন্তব্যস্থানে রওনা হই।

হিউয়েট রোডে ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিকদেরই এক বাড়ীতে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। যেদিন এলাহাবাদ গিয়ে পৌছি তার পর দিনই হিন্দু-মুসলমানে লড়াই বেধে যায়। কয়েক বছর ধ'রে ওখানে হিন্দু-মুসলমানে লড়াই যেন একটা epidemic এর মতো দাঁড়িয়েছিলো। বহু লোক খুনজখম হ'তে থাকে। আমরা তো ভয়ে ঘরেরই বা'র হই নি। কয়েকদিন পরে যখন লড়াই থেমে যায় তখন থেকে প্রত্যহ বিকেলে আমরা কয়েকজনে মিলে বেড়াতে যেতাম। তা'দের মধ্যে একজনের সাথে আমার খুবই হৃদ্যতা জন্মে' যায়। নাম তার শৈলেন মুখুজ্জে। যদিও বয়সের তারতম্য আমাদের উভয়ের মধ্যে অনেকটা তবু বন্ধুত্বটা হ'লো প্রগাঢ়। এই মুখুজ্জে পরিবারের আপ্যায়ন-গুণ খুবই প্রশংসা ক'রবার মতো। এরা প্রত্যেকেই খুব অমায়িক।

কর্ম্মসূত্রে যে-কয়দিন এলাহাবাদে ছিলাম তার মধ্যে একটা দিন খসরুবাগ দেখ্‌তে যাই। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু, তাঁর গর্ভধারিণী যোধা বাঈ, দুই পুত্র ও প্রিয়তম অশ্ব প্রভৃতির সমাধি-সৌধ এই খসরুবাগে আছে। স্থানটি অতি মনোরম। নানাজাতীয় ফলফুলারীর গাছ অতি যত্নে রক্ষিত হ'য়েছে! অসংখ্য রকমের ফুল স্থানটির শোভা বর্দ্ধন ক'রছে! বাগটি চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত।

কালপ্রবাহে এ'র পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লুপ্ত হ'য়ে গেছে। এখন এটি বৃটিশ-গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে আছে।......অপর একদিন যাই 'আনন্দভবন' দেখ্‌তে। মহাপ্রাণ পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁর এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা জাতীয় মহাসভাকে দান ক'রে গেছেন। এটা তাঁর অমর কীর্ত্তি। বর্ত্তমানে এটা একটা তীর্থস্থানে পরিণত হ'য়েছে। যাঁরা দেশ-পর্য্যটনে বা'র হন এলাহাবাদ গেলে তাঁদের একবার 'আনন্দভবন' দর্শন করা চাইই। ও'র খুব নিকটেই ভরদ্বাজ আশ্রম। কথিত হয়, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসগমনকালে এই আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছিলেন।

আরো দু'একটি দর্শনযোগ্য স্থান দেখেছি, কিন্তু দেখার-মতো-দেখার আনন্দ পাই নি। দু'বছর পরে এলাহাবাদে আবার যখন যাই তখন চারমাস কাল সেখানে থাকতে হয়। সেই সময় স্বেচ্ছামতো ঘুরে বেড়িয়েছি। পরে সে আখ্যায়িকার অবতারণা করা যাবে। এই সময় এলাহাবাদের সেন্ট্রাল বুক-ডিপোর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভার্গবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে তাঁর মোটরে ক'রে আমাকে ত্রিবেণীর সঙ্গমে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যেতেন। তাঁর ধারণা, নিত্য গঙ্গাস্নান ক'রতে পারলে কোনোপ্রকার ব্যাধি কখনো আক্রমণ ক'রতে পারে না। হয়তো বা এ'র মূলে সত্য আছে। তবে অনেকবার চেষ্টা ক'রেও আমি কিন্তু নিত্যস্নায়ী হ'তে পারি নি।

কয়েকদিন পরে ভীষণ বেরি-বেরি রোগে আক্রান্ত হই। ঐ ব্যাধিতে সেবার কাশী ও এলাহাবাদে মহামারী দেখা দেয়। অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিহারীবাবু ঐ দেশীয় এক কবিরাজের নিকট আমাকে জন্‌ষ্টন্‌গঞ্জে নিয়ে যান। তিনি আমাকে সর্ষপপরিমিত কয়েকটি বড়ি সেবন ক'রতে দেন। মাত্র দু'টি বড়ি সেবন ক'রতেই ওলাউঠা রোগে

আক্রান্ত হবার মতো অবস্থা আমার হয়। বাংলা হ'তে বহু দূরে! তা' ছাড়া মেয়েটিও কাছে নেই! একটু ভাবিতই হ'য়ে পড়ি! সেই গ্রন্থব্যবসায়ীকে জানিয়ে দিই আমি ক'ল্‌কাতায় ফিরে যেতে চাই। তাঁকে ব'ল্লাম তাঁর যদি মত হয়, ক'ল্‌কাতায় থেকেই ন্যস্ত কার্য্য সম্পাদন ক'রে দিতে আমি প্রতিশ্রুত আছি। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমিও তার পরদিনই সন্ধ্যা সাতটায় বোম্বে মেলে ক'ল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

(১০)

রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ইউরোপে রণদামামা বেজে ওঠে আর ৬ই সেপ্টেম্বর আমি দিল্লী-কাল্‌কা একস্‌প্রেসযোগে রাত্রি সাড়ে-আটটায় জয়পুর অভিমুখে যাত্রা করি। ভিড় বেশী ছিলো না। একটি বেঞ্চে ক্ষুদ্র একটা শয্যা রচনা ক'রে শুয়ে পড়ি। সারারাত্রি ধ'রে নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। মোগলসরাইতে যখন গাড়ী গিয়ে থামে তখন সকাল সাড়ে-সাতটা। হাতমুখ ধুয়ে চা পান করি। আবার গাড়ী ছেড়ে দেয়। চুনার ষ্টেশনে পৌছবার পূর্ব্বে অনতিদূরে পাহাড়ের ওপর চুনার দুর্গটি দেখ্‌তে পাই। অমনি পাঠানবীর শের শাহের অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী আমার চিত্ত অধিকার ক'রে বসে। এই চুনার দুর্গ অধিকারই তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। পরে তিনি যে মোগলদের তাড়িয়ে দিয়ে পাঠান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এই দুর্গাধিকারই তার মূল ভিত্তি। তাই দুর্গটি দৃষ্টিপথে আস্‌তেই এই সকল চিন্তা গিয়ে মাথায় ঢোকে। ঘণ্টা দুই কাট্‌বার পর দেখি যমুনা ব্রিজের ওপর এসে উপস্থিত হ'য়েছি। যমুনার অপর পারে অল্প দূরে এলাহাবাদ ফোর্টটি দৃষ্টিগোচর হ'লো। মিনিট দুই পরেই এলাহাবাদ ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী থাম্‌লো। তখন বেলা সাড়ে-দশটা। অনেকেই প্লাট্‌ফরমে নাব্‌লো, আমিও নাব্‌লাম। এখানে কিছু জলযোগ ক'রে নেয়া গেলো। আমাদের কাম্‌রায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান যাত্রী ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে খুব আলাপ জমে' যায়। মুসলমান ভদ্রলোকটি যাবেন দিল্লীতে আর আমাকে যেতে হবে টুণ্ড্‌লা ষ্টেশনে গাড়ী বদল ক'রে আগ্রায়, আবার আগ্রা

থেকে বি-বি-সি-আই রেল কোম্পানীর গাড়ী ধ'রে জয়পুরে। এলাহাবাদ ও কানপুরের মাঝামাঝি স্থানে ভদ্রলোকটি তাঁর টিফিন-কেরিয়ার খুলে আহারে ব'সলেন। হাসিমুখে আমাকে তাঁর সঙ্গে আহারে যোগদান ক'রতে অনুরোধ জানালেন। হাসির উদ্দেশ্য এই যে, তিনি অবশ্যই জান্‌তেন, আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা ক'রতে পারবো না, তবু তাঁর স্বভাবজাত সৌজন্য প্রকাশ ক'রবার সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন? মনে হ'লো, উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সমাজের রীতিই এই। যাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে একবার ঘনিষ্ঠতা জন্মে' যায় তাঁকে আমন্ত্রণ না ক'রে আহার করা এঁদের সমাজে বোধ হয় রীতিবিরুদ্ধ। যা হোক, ভদ্রলোকের সাদর আহ্বান আমি হাসিমুখেই প্রত্যাখ্যান করি। নানা গল্পে ও হাস্যকৌতুকে আমাদের সময় কেটে যায়।

বিকেল সাড়ে-পাঁচটায় টুণ্ড্‌লা ষ্টেশনে নেবে প'ড়তেই চারিদিক হ'তে আগ্রার হোটেলওয়ালারা আমাকে ঘিরে ফেলে। তাদের মধ্যে একজন ছিলো বাঙালী। অ-বাঙালীর দেশে বাঙালীর মুখ দেখ্‌তে পেলে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই যে-কোনো বাঙালী ভদ্রলোকের পক্ষে বোধ হয় স্বাভাবিক। আমার বেলাতেও এ'র কোনো ব্যতিক্রম ঘ'ট্‌লো না। বাঙালী হোটেলওয়ালার নিকটেই আমি আত্মসমর্পণ ক'রলাম। অন্যান্য অ-বাঙালী হোটেলওয়ালারা আমাকে শিকার ধ'রতে না পেরে বাঙালী যুবক হোটেলওয়ালার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রতে-ক'রতে অন্য শিকারের সন্ধানে চ'লে গেলো। আবার যমুনা ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ী চ'ল্‌লো। ব্রিজের ওপর হ'তে আগ্রা দুর্গ ও বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল দৃষ্টিপথে আসে। শ্বেতমর্ম্মরের তাজমহল দেখে আমার অন্তরের তাজমহলের স্বরূপটা মানসচক্ষুর সাম্‌নে স্পষ্ট প্রতিভাত হ'য়ে

ওঠে। কিন্তু তখনকার মতো হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জোর ক'রে আমাকে দমন ক'রতে হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী এসে আগ্রা ষ্টেশনে থামে। বাঙালী-পরিচালিত 'ক্যালকাটা হোটেল' ষ্টেশন হ'তে বেশ একটু দূরে! তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। হোটেলে গিয়ে স্ন'ন সেরে আহারাদি শেষ করি। আহার্য্যের পারিপাট্য খুব বেশী না থাকলেও হোটেলের মালিকের অমায়িক ব্যবহারে ও সদালাপে যে বিশেষ আপ্যায়িত হই এটা আমাকে স্বীকার ক'রতেই হবে। তারপর উদরপূর্ত্তির দিক্ দিয়ে ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টার পরে কোনো বাঙালীর সাম্‌নে সব্যঞ্জন অন্নপূর্ণ পাত্র যদি একবার এসে কেউ ধরে তবে আহার্য্যের পারিপাট্যের কথা মনে হওয়ার চেয়ে যে-কোনো সাধারণ উপকরণ দিয়ে অন্নের বুভুক্ষা দূর ক'রবার কথাই তখন অধিক মনে প'ড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। ফলকথা, আহারে আমি পরিতৃপ্তই হ'লাম।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হোটেলের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে জয়পুরে যাবার গাড়ী ধরি। ক্ষুদ্র একটি কাম্‌রায় এখানি বেঞ্চ অধিকারের সুযোগ লাভ করি। বেঞ্চের ওপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ি। ঐ কাম্‌রাটিতে ভিড়ও বেশ ছিলো। কিন্তু আমার আরাম-উপভোগের চেষ্টায় কেউই কোনোপ্রকার বাধা দেয় নি। সমস্ত রাত্রি ধ'রে তোফা নিদ্রাটা উপভোগ করা গেলো। ভোর পাঁচটায় জয়পুর স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হই। পূর্ব্ব ব্যবস্থামতো আমার ভাই স্টেশনে উপস্থিত ছিলো। স্টেশন রোডেই তার বাসা। মিনিট দশেকের মধ্যেই বাসায় গিয়ে পৌঁছি। দেখি তখনো সকলেই নিদ্রায় বিভোর!

পরদিনই ষ্টেটের একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল

ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ ঘটে। এমনি মধুর প্রকৃতি এঁর যে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইনি সকলকে আপন ক'রে নেন। জয়পুরে একজন সম্পূর্ণ নবীন আগন্তুক আমি, কিন্তু নতুন স্থানে এসে যে-সকল প্রাথমিক অসুবিধার মধ্যে আগন্তুকদের প'ড়তে হয়, এই সদাশয় ব্যক্তির অনুগ্রহে আমাকে আদৌ সে-সকল অসুবিধায় প'ড়্তে হয়নি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এঁর সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে' যায়। বয়সে তিনি কয়েক বছরের বড়ো, তাই 'দাদার' পদে অধিষ্ঠিত হ'তে তাঁর বেশী দেরী হয়নি। জয়পুরে তিনি আপামরসাধারণ সকল বাঙালীরই 'গোপাল দা', কিন্তু আমার সত্যিকার দাদার স্থানই অধিকার করেন। এঁর পর অবশ্য তত্রত্য বহু পদস্থ বাঙালীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে জয়পুর হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গত রায় বাহাদুর মন্মথ নাথ উপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর ন্যায় বিশিষ্ট ভদ্রলোক কদাচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আলাপ-ব্যবহারে এতো অমায়িক আর বেশভূষায় এতো অনাড়ম্বর যে সত্যি একেবারে মুগ্ধ হ'তে হয়। আর-এক মিষ্টভাষী ও সদাশয় ব্যক্তির সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ইনি অধ্যাপক দত্ত। ধীরেন সেন ও বীরেন সেন, দুই ভাইই জয়পুর বেঙ্গলী ক্লাবের সর্ব্বজন-প্রিয় সভ্য। এঁরাও আমাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখেই দেখতেন ব'লে মনে হয়।

* * * *

প্রথমেই জয়পুর রাজ্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা করি। কাছোয়া রাজপুত বংশসম্ভূত 'ডুলেরাই (Dulei Rai) এর পরিচালনাধীনে ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ধুন্দর অথবা অম্বর রাজ্যের উদ্ভব হয়। পরবর্ত্তীকালে মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালে অম্বর

রাজবংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। উভয় পরিবারের মধ্যে ক্রমে একটা বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর আজিম ও মোয়াজ্জেম নামে দুই পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ঐ সময় অম্বররাজ দ্বিতীয় জয়সিং আজিমের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু যুদ্ধে আজিমের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং ঐ সময়ে জয়সিংয়ের অবস্থা বড়ই শঙ্কটাপন্ন হ'য়ে ওঠে। তবে অল্পকাল পরেই অবস্থার একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সম্রাট ফারুখ্ সায়ারের সিংহাসনারোহণকালে রাজা জয়সিং আবার খুবই প্রতিপত্তিশালী হ'য়ে ওঠেন। ফারুখ্ সায়ারের পুত্র মহম্মদশাহের রাজত্বকালে তাঁর ক্ষমতা চরম সীমায় উন্নীত হয়। দ্বিতীয় জয়সিং গণিত জ্যোতিষে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন! ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৭২৮) আপন নামানুসারে বর্ত্তমান জয়পুর শহর স্থাপিত করেন এবং অম্বর হ'তে রাজধানী জয়পুরে স্থানান্তরিত করেন। তাঁরই নির্দ্দেশ অনুযায়ী জয়পুর, উজ্জয়িনী, দিল্লী, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানসমূহে মানমন্দির নির্ম্মিত হয়।

অনুমান করা হয়, জয়পুর শহরের সবটাই পূর্ব্বে একটা হ্রদ ছিলো। কালপ্রবাহে শুকিয়ে গিয়ে ওটা একটা প্রান্তরে রূপান্তরিত হয়। ক্রমে ঐ স্থানে জনপদ গ'ড়ে ওঠে। জয়পুরের সর্ব্বত্র যেরূপ বালুর আধিক্য দেখতে পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, এ অনুমান অসত্য না হ'তেও পারে। এই প্রকাণ্ড শহরটি চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। এ'র সাতটি প্রকাণ্ড তোরণ-দ্বার আছে। এগুলির যে-কোনো একটা দিয়ে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যেতে পারে। সমগ্র রাজস্থানের মধ্যে জয়পুরই বাঙালীবহুল কেমন ক'রে হ'লো সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। মহারাজা দ্বিতীয়

রামসিং খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন। তা' ছাড়া, সে সময়ে প্রাদেশিকতার বালাই ছিলো না। তখন ক'ল্‌কাতাই ছিলো ভারতের রাজধানী। সুতরাং তখন দেশীয় রাজ্যের রাজাদের রাজনীতিবিষয়ক কার্য্যাদি উপলক্ষে প্রায়ই সেখানে গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে যেতে হ'তো। একবার মহারাজা রামসিং ক'ল্‌কাতায় গেলে শ্যামনগরের কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক যুবক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ ক'রবার সুযোগ পান! চেহারায় ও আলাপে কান্তিচন্দ্র মহারাজার সুনজরে পড়েন। মহারাজা তাঁকে জয়পুরে যেতে বলেন। তখন তিনি হুগ্‌লী জিলার জনাই গ্রামের হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। বেতন সামান্য! সংসারের অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল নয়! যাহোক্, বহু কষ্টে তিনি মহারাজা রামসিংয়ের নির্দ্দেশমতো জয়পুরে গিয়ে পৌছতে সমর্থ হন। তখন রেলপথের এতোটা সুবন্দোবস্ত হয় নি। কতোকটা পায়ে হেঁটে, কতোকটা রেলপথে, কতোকটা উটের পিঠে ক'রে কোনোমতে তিনি জয়পুরে এসে পৌছেন।

মহারাজা রামসিং তাঁকে প্রথমে মহারাজা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। আপন প্রতিভাবলে তিনি কিছুকালের মধ্যেই মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী-পদে বাহাল হন। ক্রমে তিনি মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। মহারাজা রামসিংয়ের মৃত্যুর পর মহারাজা মাধোসিং যখন সিংহাসনে আরূঢ় হন তখন কান্তিবাবু প্রধান মন্ত্রীপদে উন্নীত হন এবং জয়পুর রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন। যে ব্যক্তি সামান্য স্কুলমাষ্টারের পদ থেকে প্রধান মন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত ক'রতে সক্ষম হন তাঁর প্রতিভা, কর্ম্মদক্ষতা কতোখানি সকলেই সেটা সহজে অনুমান ক'রে নিতে পারেন। তিনিই বহু আত্মীয়-স্বজনকে জয়পুরে নিয়ে

গিয়ে চাক্‌রী দেন। তাঁদেরই পরিবারবর্গ জয়পুরে বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রেছে। কান্তিবাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকাণ্ড এক জমিদারীর মালিক হ'য়ে যান। তাঁর বংশধরেরা এখন সেই জমিদারীর উপসত্ব ভোগ ক'রছেন। তবে জয়পুরে Law of Primogeniture প্রযুক্ত হওয়ায় জ্যেষ্ঠপুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। অপর সকলে ভাতা পান। ফলে, কালক্রমে অপর বংশধরেরা দরিদ্র হ'য়ে যান।......কান্তিবাবুর বাড়ীখানি রাজপ্রাসাদতুল্য। ঐ বাড়ীতে গেলে মনে হয়, বাংলাদেশের এক সম্ভ্রান্ত জমিদারবাড়ীতে প্রবেশ ক'রেছি। লোকে তাঁর বাড়ী-খানিকেই বলে 'জয়পুরের দ্বিতীয় রাজপ্রাসাদ'। শোনা যায়, জয়পুরে যে-কোনো বাঙালী আগন্তককে তিনি সাদর আহ্বান ক'রে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এসে ভূরি-ভোজনে পরিতুষ্ট ক'রতেন।

কান্তিবাবুর পরেই তথাকার যে-বাঙালীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ ক'রবার যোগ্য তাঁর নাম সংসারচন্দ্র সেন। মহারাজা মাধো সিংয়ের আমলে কান্তি বাবুর মৃত্যুর পর ইনিই প্রধান মন্ত্রী হন। এঁর মৃত্যুর পর এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশচন্দ্র সেন ঐ পদ প্রাপ্ত হন। জয়পুরে এঁদেরও জমিদারী আছে, তবে কান্তি বাবুর মতো বিস্তীর্ণ জমিদারী নয়।......জয়পুরের মুখার্জ্জী ও সেন এই দুই পরিবারই বংশাভিজাত্যের ও পদমর্য্যাদার গৌরবে গৌরবান্বিত। ব'ল্‌তে গেলে জয়পুরের সমগ্র বাঙালী সম্প্রদায় কন্তিবাবু ও সংসারবাবুর কাছে চিরঋণী। এঁদের প্রতিভা, এঁদের মনীষা তথায় বাঙালীর মর্য্যাদাকে আজও অম্লান রেখেছে। কিন্তু প্রাদেশিকতা-বিষ যেরূপ তড়িৎবেগে তার ক্রিয়া সুরু ক'রেছে তাতে মনে হয় বাঙালীর প্রাধান্য, বাঙালীর আধিপত্য আর বেশী দিন চ'ল্‌বে না।

জয়পুর শহর হ'তে রামগড় বিশমাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থান। এখানে একটি সুন্দর হ্রদ আছে। এ'র নামকরণ হয় খুব সম্ভব মহারাজা প্রথম রামসিংয়ের নামানুসারে। একদিন আমরা রামগড়ে বেড়াতে যাই। আজমীর গেট দিয়ে প্রথমে শহরে প্রবেশ করি। তারপর কিষাণপোল বাজার হ'য়ে ত্রিপোলিয়া গেটের সম্মুখ দিয়ে হাওয়া-মহল ও হাইকোর্ট বাঁয়ে রেখে ক্রমে আবার আমরা শহরের বাইরে এসে উপস্থিত হই। আমের-কা-রাস্তা দিয়ে কিয়দ্দূর আস্‌বার পর রামগড়ে যাবার রাস্তা দেখতে পাই। পথে দুই ধারে শুধুই পাহাড়! দেখি, পাহাড়ের ওপর মাঝে মাঝে প্রাচীন দুর্গ, মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান র'য়েছে। একস্থানে দেখ্‌তে পাই একদল বন্য হরিণ চ'রে বেড়াচ্ছে। শুন্‌লাম, ঐ সকল পাহাড়ে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বড় বড় বাঘেরও আড্ডা আছে। কিন্তু একটিও আমার চোখে কখনো পড়ে নি। জয়পুরে ময়ূরের তো কথাই নেই! রাজস্থানের সর্ব্বত্রই ময়ূর দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

রামগড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। চারিদিকে উঁচু পাহাড়, মাঝখানে অনতিবৃহৎ হ্রদ! ঐ স্থানে একটা নতুন রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মিত হ'য়েছে। শহরে জলসরবরাহ ক'রবার জন্য কয়েক বছর হ'লো ষ্টেট্ হ'তে রামগড়ে ওয়াটার-ওয়ার্কসের সুব্যবস্থা করা হ'য়েছে। দিনরাত পাম্পিং ওয়ার্ক চ'ল্‌ছে। সেজন্য সেখানে একটা স্টাফ্‌ রাখ্‌বার স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। জয়পুর রাজ্যের রাস্তাগুলি অনিন্দ্য। শহরের রাস্তাগুলি খুব প্রশস্ত ও বেশ পরিচ্ছন্ন। শহর ব'ল্‌তে প্রাচীর-বেষ্টিত শহর ও এ'র বাইরের স্থানসমূহ সবই বুঝ্‌তে হবে। চিত্রশিল্পের জন্য জয়পুর সুবিখ্যাত। প্রতি গৃহগাত্রে চিত্রকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন এখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রাচীরাভ্যন্তরে শহরস্থ যে

সুবিশাল সুরম্য গৃহ সকল আমরা দেখতে পাই, তৎসমুদয়ই একই বর্ণে রঞ্জিত ও একই চিত্রে চিত্রিত। ঐ দৃশ্য বৈদেশিক আগন্তুকদের চিত্ত বিমোহিত করে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, হওয়া-মহল, গোবিন্দজীর মন্দির ও অন্যান্য দেবমন্দির, অফিস, আদালত, স্কুল, বাজার সবই প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। রামনিবাস গার্ডেন, রামবাগ প্রাসাদ, কলেজ, মিউজিয়ম, জু, উইলিংডন হস্‌পিটাল, সিনেমা হাউস—এ সবই প্রাচীরের বাইরে। মহারাজার পোলো খেল্‌বার জন্য একটি সুন্দর সুবিস্তীর্ণ মাঠ প্রস্তুত করা হ'য়েছে। জয়পুর ক্লাব গৃহটি ঐ স্থানেই অবস্থিত। অনতিদূরেই রেসিডেন্টের কুঠী। সাঙানীর রোড ধ'রে গেলেই জয়পুর এয়ারোড্রোম দেখতে পাওয়া যাবে। শহরের বাইরের রাস্তাগুলি সেরূপ প্রশস্ত না হ'লেও এবং মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ঢালু থাক্‌লেও বরাবরই খুব মসৃণ। মোটর যান চলাচলের পক্ষে এমন সুন্দর রাস্তা কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

একদিন গোপালদা'র (শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যকে এখন থেকে 'গোপালদা' ব'লেই পরিচয় দেবো) কাছ থেকে প্রস্তাব এলো, পরদিন প্রাতে একটা দূরবর্ত্তী স্থানে বেড়াতে যাওয়া হবে। হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দিলাম, প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণেই সমর্থনযোগ্য! আমাদের গন্তব্য স্থানটি জয়পুর হ'তে আশী মাইল দূরবর্ত্তী টোডা রাইসিং। আমরা টঙ্ক্‌ রোড ধ'রে সাত মাইল পথ অতিক্রম ক'রবার পর একটা প্রাচীন লুপ্তগৌরব শহরের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হই। জিজ্ঞেস ক'রে জানি, স্থানটির নাম সাঙানীর। এককালে ওটা নাকি একটা সমৃদ্ধিশালী শহর ছিলো। ঐ স্থানে জৈনদের একটা সুপ্রসিদ্ধ মন্দির আজও বর্ত্তমান আছে। হাতে-প্রস্তুত কাগজ ঐ স্থানের একটা প্রাচীন শিল্প। অবশ্য সময়ের অল্পতা-প্রযুক্ত সেখানকার কিছুই বিশেষ দেখা হয় না।

পথে দু'একটা পল্লী বেশ সমৃদ্ধ ব'লেই বোধ হ'লো। কিন্তু দেখ্‌লাম অধিকাংশ পল্লীই অতি দরিদ্র। বাংলার পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে কোনোই সাদৃশ্য নেই ব'ল্‌লেই চলে। দরিদ্র পল্লীসমূহের অবস্থা দেখলে সত্যই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে! এই সকল প্রজার নিকট থেকে কিরূপে কর আদায় করা সম্ভব হ'তে পারে এটা একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার! সর্ব্বত্রই দেখ্‌তে পাওয়া যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়! সামান্য দু'চারখানি আবাদী জমি, আর বাকী সবই পতিত! জলের অভাব এ দেশটায় যেমন ভারতের অন্য কোথাও বুঝি এমনটি আর নেই! অবশ্য পনের-বিশ মাইল দূরত্বের ব্যবধানে দু'টি হ্রদ দেখ্‌লাম—চাঁদসেন ও টোড়িসাগর। পরবর্ত্তীটি আকারে বড়ো। কিন্তু এ'তে দূর-দূরান্তরের লোকের জলকষ্ট কিরূপে নিবারিত হ'তে পারে? শুন্‌তে পাই, মাড়োয়ারে নাকি জলের অভাব আরো বেশী। কিন্তু, সেখানে আমার যাওয়া হয় নি। যে-টুকু দেখ্‌লাম, তাইই আমার অন্তরের পীড়াদায়ক হ'লো। জনপদবহুল গ্রাম একটিও চোখে প'ড়লো না। পল্লীর করুণ দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা টোডা রাইসিংয়ে গিয়ে পৌছি।

এখানে রাইসিং নামে এক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সর্দ্দার বাস ক'রতেন। কালক্রমে তাঁর ক্ষমতা এতো বেড়ে যায় যে তিনি স্বাধীন রাজার মতো চ'ল্‌তে থাকেন। পাহাড়ের তলদেশে তাঁর রাজধানী। সুরক্ষিত ক'রবার উদ্দেশ্যে ও'কে দুর্ভেদ্য প্রাচীর-বেষ্টিত করা হয়। একটি 'কুণ্ড্‌' (পুকুর) দেখ্‌লাম। ওকে বলা হয় 'রাণীকুণ্ড্‌'। ওটা নাকি দুর্গের সর্দ্দার পত্নীর আদেশেই নির্ম্মিত হয়। ও'র আকার চতুষ্কোণ ও সবটাই বাঁধানো। ঐ কুণ্ডের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে ও'র সোপানা-বলীতে। নীচে ঠিক মধ্যস্থলে অতি সামান্য একটু স্থান নিয়ে জল র'য়েছে। সে জল যে কতো প্রাচীন কাল থেকে ওখানে সঞ্চিত হ'য়ে

আছে তা' অনুমান ক'রে ঠিক নিরূপন করা যায় না। জলের বর্ণ গাঢ় সবুজ। ও'র চারিপাশে প্রশস্ত ছাদের মতো। একটা ছাদের ওপর হ'তে এঁকে বেঁকে সিঁড়ি নীচে 'কুণ্ড্' পর্য্যন্ত নেবে গেছে। সে স্থানটিতে গিয়ে সিঁড়ির দু'একটা ধাপ নাবতেই একটা তীব্র উৎকট গন্ধ এসে নাকে লাগ্‌লো। বুঝ্‌লাম, কোনো একটি শার্দুলরাজ নীচে অন্ধকারে আরামে দিবানিদ্রা উপভোগ ক'রছেন! তাঁর আরামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনা বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে বিবেচিত হ'লো না। 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি'—এই মহাজন বাক্যের অনুসরণ ক'রলাম। সঙ্গে যে গাইড্‌টি ছিলো তার কাছ থেকে জান্‌তে পারি পাহাড় থেকে প্রায়ই 'শের' (বাঘ) নেবে আসে ও প্রাচীন রাজধানীটির ধ্বংসস্তুপের মাঝে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ঐ স্থানের অধিবাসীরা 'শের'কে আদৌ ভয় করে না। ঐ কুণ্ড্ ব্যতীত সেখানে দেখ্‌বার মতো আর কিছুই নেই! কিছুক্ষণ রেষ্ট-হাউসে বিশ্রাম ক'রবার পর প্রত্যাবর্ত্তন করি। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই জয়পুরে ফিরে আসি।

(১১)

কয়েকদিন আমাদের বেড়ানোর প্রোগ্রাম বন্ধ থাকে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় জান্‌তে পারি, পরের দিন বাইরে কোথাও যেতে হবে; আমাদের গন্তব্যস্থানের নির্দ্দিষ্টতা কিছু থাক্‌বে না। সঙ্গে অতিরিক্ত একখানি পরিধেয় বস্ত্র, একটা বিছানার চাদর, একটা বালিশ, একটা 'দড়ি' (সতরঞ্চ) ইত্যাদি নিতে হবে—এই কথা শুধু আমাকে জানিয়ে দেয়া হ'লো। বুঝলাম, গন্তব্য স্থানটি অনেকটা দূর এবং কোনো-একটি স্থানে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যেই এই সব! যাহোক, পরদিন যথারীতি আমরা রওনা হই বেলা দশটায়। পৌণে-এগারোটায় গিয়ে পৌছি রামগড়ে। সেখানে একটি জরুরী কাজের জন্য পুর্ণ একঘণ্টা আমাদের অপেক্ষা ক'রতে হয়। ইত্যবসরে নতুন রাজপ্রাসাদটির আভ্যন্তরীণ কারুকার্য্য, সাজসজ্জা প্রভৃতি দেখ্‌বার একটা সুযোগ পাই। ঠিক পৌণে-বারোটায় আমরা ওখান থেকে নিরুদ্দেশ-যাত্রা সুরু করি। প্রায় উনিশ মাইল পথ যেতে হয়—কেনো সময় পাহাড়ের ধার দিয়ে, কোনো সময় মাঠের মাঝখান দিয়ে, আবার কোনো সময় বা খালের পাড়ের ওপর দিয়ে। গাড়ী অতি ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম ক'রতে লাগ্‌লো। খালের ধারের জমিগুলো বেশ উর্ব্বরা ব'লে বোধ হ'লো। ডৌসা নামক স্থানে আগ্রা রোডে যখন এসে আমরা উঠি তখন বেলা প্রায় দেড়টা। ডৌসা হ'তে গাড়ী ছুটে চলে। সুন্দর পরিষ্কার রাস্তা! এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা মহুয়ায় গিয়ে পৌছি।

ঐ স্থানটি জয়পুর থেকে বাহাত্তর মাইল পূর্ব্বে এবং ওদিকে ঐ পর্য্যন্তই

জয়পুর রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমান্ত অঞ্চল। ও'র পরেই আমরা ভরতপুর রাজ্যের সীমানার মধ্যে এসে পড়ি। এই সময়ে জান্‌তে পারি, আমরা বৃন্দাবনের যাত্রী। ওখান থেকে ভরতপুর চল্লিশ মাইল দূরে। ভরতপুরের এলাকাধীন রাস্তা অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও সর্ব্বত্র উঁচু-নীচু। মনে হ'লো, রাস্তাঘাটের উন্নতির দিকে কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ দৃষ্টি নেই। কোনো-কোনো স্থানে রাস্তার অবস্থা এতো শোচনীয় যে গাড়ীর গতি সে সকল স্থানে ঘণ্টায় আট-দশ মাইলে গিয়ে নাব্‌লো। ওখানকার মাটির উর্ব্বরতা শক্তি খুব বেশী, কেন না দেখ্‌লাম দুই ধারের ক্ষেত-খামার সব শস্য-শ্যামলা। পথে আমরা কয়েকটি নদী অতিক্রম ক'রে এসেছি! বাংলা, বিহার বা সংযুক্ত প্রদেশের নদীগুলি অতিক্রম করা অর্থে যা বুঝোয় রাজপুতানার নদীগুলি অতিক্রম করা অর্থে ঠিক তা' বুঝোয় না। রাজস্থানের প্রায় কোনো নদীর ওপরেই সেতুর ব্যবস্থা নেই। ও'র মাঝখান দিয়েই বরাবর রাস্তা চ'লে গেছে। পথিমধ্যে যেখানেই নদী আছে সেখানেই রাস্তা অত্যন্ত ঢালু হ'য়ে গেছে। সর্ব্বদাই নদী শুকনো থাকে। শুধু অতিরিক্ত বৃষ্টি হ'লে পাহাড় থেকে জল নেবে এসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীকে খরস্রোতা ক'রে তোলে। আবার বৃষ্টি থেমে গেলে ঘণ্টা দুই-তিনের মাঝেই নদী আগের মতো শুকিয়ে যায়। তখন এক বিন্দু জলও আর ওতে দেখা যায় না।···ক্রমে নানা দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভরতপুরে গিয়ে যখন আমরা পৌঁছি তখন বেলা পাঁচটা। শহরের ভেতর দিয়ে না গিয়ে ও'র বহির্ভাগ দিয়েই আমরা চ'ল্‌লাম।

এই সূত্রে ভরতপুর রাজ্যের ইতিহাস একটু বলা প্রয়োজন। ভরতপুর জাঠরাজবংশের উদ্ভব হয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ফেরিস্তায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে একদল জাঠ গজনীর সুলতান মামুদকে

গুজরাট হ'তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিশেষভাবে নির্য্যাতিত করে, কিন্তু মামুদের হস্তে তারা প্রায় সকলেই নিহত হয়। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-অভিযানকালে তৈমুরলঙ্গকে জাঠেরা বাধা দিতে যায়, কিন্তু সকলকেই তাঁর হস্তে প্রাণ দিতে হয়। আবার ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে আক্রমণকালে বাবরের সৈন্যদল জাঠদের হস্তে নিপীড়িত হয়। এই সকল ঘটনা হ'তে অনুমিত হয় যে, এই জাঠজাতি অতি দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দান্ত ছিলো। চূড়ামন নামে এ'দের নির্ব্বাচিত এক পরাক্রান্ত সর্দ্দার দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে প্রভৃত শক্তিশালী সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের যথেষ্ট সহায়তা করেন। বিনিময়ে তিনি প্রচুর অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পকালপরেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনে তাঁকে সম্রাটের বিরাগভাজন হ'তে হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন ক'রে নিজকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাট সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু ভরতপুরের জাঠদের হস্তে তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়।

চূড়ামনের পৌত্র সুরজমল কোনো কারণে জয়পুরাধিপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরই সাহায্যে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ডীগ্ ও কুম্ভের দুর্গ দু'টি নির্ম্মিত হয়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সুরজমল রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। আহম্মদ শাহ্ দুরানীর বিরুদ্ধে ইনিও বিপুল সৈন্যসামন্ত নিয়ে মরাঠাদের সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইনি এঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে আসেন। এ'র পরে ভরতপুর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজদের সঙ্গে ভরতপুরের রাজার বিবাদ বা'ধবার উপক্রম হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের রাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে হোল্‌কারের সঙ্গে যোগদান করেন। তাই ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি

লেক ভরতপুর দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হ'য়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। পরপর আরো তিনবার আক্রমণ চলে, কিন্তু ভরতপুরের দুর্ভেদ্য মাটির দুর্গ অধিকার করা ইংরেজদের পক্ষে সাধ্যাতীত হ'য়ে ওঠে। বিজয়ী হ'লেও রাজার বারবার আক্রান্ত হবার আশঙ্কা রইলো। সেজন্য উভয় পক্ষেরই সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এক সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। ভরতপুরের জাঠদের বিশ্বাস ছিলো, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইংরেজগণ কর্তৃক প্রথম অবরোধকালে তা'দের ভারতীয় সৈনিকগণের মধ্যে অনেকেই নাকি স্পষ্টতঃ দেখ্‌তে পায় যে পীতবসন-পরিহিত শ্যামনটবর বংশীধর স্বয়ং নগর রক্ষায় ব্যাপৃত আছেন। ভরতপুরের মাটির দুর্গের চতুষ্পার্শ্ব জলপূর্ণ পরিখাবেষ্টিত। পাঠ্যাবস্থায় ইতিহাসে যা প'ড়েছিলাম তাই এবার স্বচক্ষে দেখে নয়ন সার্থক ক'রলাম।

ভরতপুর হ'তে মথুরা চব্বিশ মাইল দূরে। এ'র কতোকটা ভরতপুরের এলাকাধীন, তার পরেই ইংরেজের মুলুক। মথুরা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গেছে সেটা যান-চলাচলের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নয়, কিন্তু জয়পুর রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ভরতপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা, তা'র চেয়ে বহুগুণে প্রশংসনীয়। পৌণে-ছয়টায় আমরা মথুরায় গিয়ে পৌছি। শহরের বহির্ভাগ হ'তেই মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেব-প্রতিষ্ঠিত বিরাট মস্‌জিদের গুম্বজ নয়নগোচর হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এই মথুরায়। কিন্তু ও'র বর্ত্তমান অবস্থা দেখে কোনোই পুলক মনে জাগ্‌লো না, অন্তরে কোনোই সাড়া পেলাম না! শহরের অভ্যন্তর এমন কদর্য্যতায় পূর্ণ যে মনে হ'তে লাগ্‌লো, যতো শীঘ্র ওখান থেকে অপসৃত হওয়া যায় ততোই মঙ্গল। ধূলিধূসরিত পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে অনেকটা পরিমাণ ধূলি আমাদের গলাধঃকরণ ক'রতে হ'লো। অবশ্য মথুরা হ'তে বৃন্দাবন

পর্য্যন্ত রাস্তাটি অতি সুন্দর এবং মাত্র ছয় মাইল দূর। কিন্তু নানা কারণে ঐটুকু পথও অতিক্রম ক'রতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লেগে গেলো। দূর হ'তে বৃন্দাবনের অগণিত মন্দির-চূড়া নয়নপথে পতিত হওয়ায় মনে একটা অভিনব অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হ'লো। বাংলা দেশের নবদ্বীপধামের সঙ্গে বৃন্দাবনধামের তুলনা সত্যি অশোভন হয় না পল্লীতে-পল্লীতে মন্দির! ঘন ঘন শঙ্খঘণ্টার মধুর ধ্বনি! যুগপৎ চক্ষুকর্ণের তৃপ্ত!

আমাদের গাড়ী অম্বরাধিপতি মানসিংহ-প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো! অমনি চারিদিক হ'তে ব্রজপুরীরা এসে আমাদের ঘিরে ফেল্‌লো। গোপালদা' এমনি সুরসিক ও নির্দ্দোষ-পরিহাসপ্রিয় যে তাঁর সরস বাক্যচ্ছটায় তা'দের মধ্যে এক হাসির ফোয়ারা ছুটে গেলো। তারা আমাদের উত্যক্ত ক'রতে বিরত হ'য়ে শীগ্‌গীরই সেখান হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'লো। লালপাথরের এই মন্দিরটির চূড়া এতো বেশী উঁচু ছিলো যে মথুরার বড়ো মস্‌জিদের উঁচু গুম্বজও ছাড়িয়ে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো। পরধর্ম্মবিদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের এটা সহ্য হয় না! তাঁরই আদেশে মন্দিরের চূড়া ভেঙে ফেলা হয়! তারপর মন্দির কলুষিত হবার আশঙ্কায় গোবিন্দজীকে গোপনে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। তদবধি ঐ সুদৃশ্য বিরাট মন্দিরটি দেবমূর্ত্তি-শূন্য হ'য়ে র'য়েছে। বহুকাল পরে পুনরায় গোবিন্দজীর প্রতিকৃতি আসল গোবিন্দজীর মন্দিরের পশ্চাতে এক কুঠরীতে স্থাপিত ক'রে নিত্য পূজার ব্যবস্থা চ'লে আস্‌ছে।

সেখান হ'তে আমরা রঙ্গনাথজীর মন্দিরে যাই। ঐ মন্দিরের পরিচালনা-ভার মাদ্রাজীদের ওপর। এখানে দেখ্‌লাম সোনা-রূপার, মনি-মানিক্যের ছড়াছড়ি! কিন্তু যিনি স্বয়ং ঐশ্বর্য্যের

খনি তাঁকে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব ঐশ্বর্য্য দিয়ে তুষ্ট ক'রতে যাওয়া কি মূঢ়তা নয়? ঐ রঙ্গনাথজীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু। বৃন্দাবনে তাঁরই আলয়ে আমরা দু'দিন ছিলাম। সেই ভদ্রমহোদয়ের আপ্যায়নগুণে আমরা মুগ্ধ হই। ইনি এককালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ক'রেছেন, ক'ল্‌কাতায় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিলো। পরে ইনি কর্ম্মজীবনে অবসর গ্রহণ ক'রে পারমার্থিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনকল্পে শ্রীবৃন্দাবনে অবশিষ্ট জীবন যাপন ক'রতে কৃতসঙ্কল্প হন। দেখলাম, বৃন্দাবনধামের সর্ব্বত্রই ইনি সুপরিচিত। পরদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইনি আমাদের সঙ্গে ক'রে বহু মন্দির-দর্শন করাতে নিয়ে যান। সময় অল্প হ'লেও আমরা এখানে দর্শনীয় অনেক কিছু দেখবার সুযোগ পাই। নিধুবনে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জ দেখলাম। সেখানকার অনেক কিছুই কৃত্রিম বোধ হ'লো। সেখান থেকে যাই বংশীবটে। ঐ স্থানটি অতি মনোরম। এখানে নিত্যই বালকদের সাজিয়ে লীলাকীর্ত্তন করা হয়।

এক-একটি মন্দিরে ধর্ম্মপ্রাণ ধনী ব্যক্তিগণ যে কতো লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে ধর্ম্মপিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ ক'রেছেন, তার সবিস্তার বর্ণনা আমার দুর্ব্বল লেখনীতে একরকম অসম্ভবই মনে হয়। এখানে বৃটিশ-রাজমার্কা ও গোয়ালিয়ার-রাজমার্কা পয়সা প্রচলিত আছে। পাই পয়সার চল্‌তি থাকায় বৃন্দাবনে একটি পয়সা তিনজন ভিখিরীকে দেয়া যায়। বৃন্দাবনে এতো অধিকসংখ্যক বাঙালীর বসতি যে প্রায় আটশত মাইল দূরত্বের ব্যবধানেও মনে হয় না যে আমরা বাংলার-বাইরে এসেছি। শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন এই শ্রীবৃন্দাবন। যদিও অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ অনেক রকমের কৃত্রিম নিদর্শন খাড়া ক'রে রেখেছে, কি জানি কেন মনে হয় প্রাচীনতম কালে শ্রীভগবান

এই পুণ্যভূমিতে সত্যিই লীলাই ক'রে গেছেন। স্থান-মাহাত্ম্য ব'লে যদি কিছু থাকে তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বীকার ক'রবো, বৃন্দাবনের মাটি, বাতাস, জল, সবই আমার মনের ওপর দিয়ে একটা পুলকের শিহরণ খেলিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো। গোপালদা' মুখে স্বীকার না ক'রলেও অন্তরে যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ ক'রছিলেন তা' তাঁর হাবভাবে ও কার্য্যকলাপেই প্রকাশ পাচ্ছিলো।

দ্বিতীয় দিবসে যমুনায় স্নান ক'রে আসি। কিন্তু যমুনাকে দেখে কবির ভাষায় প্রশ্ন ক'রতে ইচ্ছে হয়—"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী, যার বিশাল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীল কান্তমণি?" নদীর মধ্যে খানিকটা দূর গিয়েও এক হাঁটু গভীর জলের অধিক পেলাম না। অগণিত বৃহৎ বৃহৎ কচ্ছপের উৎপাতে নদীর মধ্যে নাব্‌তেই ভয় ক'রতে লাগ্‌লো। একজন ব্রজপুরী আমার সঙ্গী ছিলো। তারই সঙ্গে সঙ্গে নেবে কোনোমতে স্নান সেরে উঠি। বৃন্দাবনে ছিলাম মাত্র দু'দিন। ঐ সময়টুকুর মধ্যেই বহু মন্দির দর্শন ক'রেছি। নবদ্বীপের মতো এখানেও জঘন্য ভেটপ্রথা প্রচলিত। তবে বৃন্দাবনে কেউ যে অভুক্ত থাকে না তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেলো প্রতি মন্দিরে প্রসাদ-বিলির ব্যবস্থা দেখে। আমাদের অতিথিপরায়ণ বন্ধুটির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধসত্ত্বেও তৃতীয় দিবসের বেলা বারোটায় আমরা জয়পুর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলাম। মথুরায় গিয়ে গাড়ীর একটা টায়ার লীক্ করায় আধঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। তারপরে পথে আর কোথাও বিঘ্ন ঘটে নি বা গাড়ীও থামে নি। ভরতপুর হ'তে মহুয়া পর্য্যন্ত গাড়ীর গতি অতি ধীর ছিলো। তার পর হ'তে অতি বেগে ছুটে আমাদের গাড়ী বেলা সাড়ে-পাঁচটায় জয়পুরে এসে পৌঁছে।

(১২)

কয়েকদিন পরে গোপালদা' তাঁর পূর্ব্বপরিচিত এক বন্ধুকে সঙ্গে ক'রে এক সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হন। তাঁকে আমার সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেন। এঁর নাম হরেন্দ্রনাথ জোয়ারদার—আলোয়ার ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার। গোয়ালিয়রে ইনি বহুকাল ইরিগেশন-ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইনি ক'ল্‌কাতা ইউনিভারসিটীর একজন প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। প্রায় প্রতি পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রে স্বুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজেও ইনি প্রায় প্রতিবার প্রথম স্থান অধিকার করেন।

একদিন শুন্‌লাম, জয়পুর হ'তে দেড়শো মাইল দূরবর্ত্তী কোটায় যেতে হবে এবং সেটা আবার পরদিন সকালেই। আমি সানন্দেই রাজী হ'য়ে যাই। কারণ, গণ্যমান্য বরেণ্য ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুদ্বয়ের অযাচিত অনুরোধ উপেক্ষা করা চলে না! উপেক্ষা করা বরং আমার পক্ষে কতোকটা ক্ষতিকরই, কেন না এ স্বুযোগ হারালে হয়তো রাজস্থানের অনেক কিছুই আমার কাছে অপরিজ্ঞাতই র'য়ে যাবে!...পরদিন বেলা সাড়ে-দশটায় আমাদের বাসায় গোপালদার গাড়ী এসে দাঁড়ালো। এই সুদূর পথের যাত্রী হ'লাম আমরা তিনটি প্রাণী—মিঃ জোয়ারদার, গোপালদা' ও আমি। জয়পুর হ'তে কোটায় যাবার পথে আরো দুইটি দেশীয় রাজ্য অতিক্রম ক'রে যেতে হয়। একটি মুসলমানরাজ্য—টঙ্ক্, অপরটি হিন্দু-রাজ্য—বুন্দি। বুন্দি ও কোটা উভয় রাজ্যের নৃপতিদ্বয় একই রাজ-বংশসম্ভূত।

আমরা বরাবর টঙ্ক্ রোড ধ'রে চ'ল্‌লাম। যখন সাঙানীর ছাড়িয়ে যাই

তখন দেখতে পাই, রাস্তার উভয় পার্শ্বে জনপ্রানীহীন, বৃক্ষলতাশূন্য প্রান্তর ধূ ধূ ক'রছে! কচিৎ কোথাও দু'একটি পথিককে কোনো বৃক্ষের ছায়াতলে ব'সে শ্রান্তি-অপনোদন ক'রতে দেখা যাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি, বহুদূরে প্রান্তর মধ্যে ঘুর্ণিবাত্যা প্রবল বেগে বইছে! গরম দম্‌কা হাওয়া এসে আমাদের গায়ে লাগছে! ঐ দেশে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও দুপুরের গরম প্রায় অসহনীয়, অথচ সকাল বেলায় ও রাত্রিকালে শীতল হাওয়া শরীর স্নিগ্ধ ক'রে দেয়। যাহোক, তখনকার মতো কাঁচের শার্সি উঠিয়ে দিয়ে আমরা নিস্তার পাই। কিন্তু ঐ ভীষণ উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির মাঝ দিয়ে ঐ প্রচণ্ড রৌদ্রে কেমন ক'রে মানুষ ঘরের বা'র হ'তে পারে এটাই আমার ধারণায় আসছিলো না!...জয়পুর থেকে টঙ্ক্ ষাট্ মাইল দূর। জয়পুর রাজ্যের এলাকায় যে সামান্য দু'চারখানি জমিতে কিছু শস্য দেখা গেলো সেটাও অনাবৃষ্টিহেতু জ্বলে' গেছে! পথে দু'একটা জলশূন্য নদী অতিক্রম ক'রে আসতে হ'য়েছে। পাহাড়ের তো কথাই নেই! রাজস্থানের কোথায় পাহাড় নেই? আরাবল্লী-পরিবেষ্টিত সমগ্র রাজস্থান! চ'লতে চ'লতে যখনি মুসলমান পথিকদের সাক্ষাৎ পাই তখনই বুঝি আমরা মুসলমান রাজ্যের সীমান্তে এসে প'ড়েছি। ক্রমে ঐ রাজ্যের কাস্টম্‌স্ অফিসের গেটের সাম্‌নে আসতেই দেখি, ওখানকার কর্ম্মচারীরা সকলেই মুসলমান। ঐ রাজ্যের মধ্যে হিন্দুর দেখা পাওয়াই দুষ্কর!

ক্রমে আমরা বানাস নদীর তীরে এসে উপস্থিত হই। তার কিছু আগেই রাস্তার উভয় পার্শ্বে এখানে-ওখানে কয়েকটি অভ্রের খনি দেখতে পাই। অভ্রখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় টঙ্ক্ রাজ্যের সমৃদ্ধি কতোকটা বৃদ্ধি পেয়েছে! বানাস্ নদীর ওপর আধুনিক ধরণের সুন্দর একটি সেতু র'য়েছে। তার ওপর দিয়ে আমাদের

গাড়ী চ'ল্‌লো। নীচে বালু ধূ-ধূ ক'রছে। মাত্র পাহাড়ের পাশ কেটে একটা ক্ষীণ জলধারা তর্‌তর্‌ ক'রে ব'য়ে চ'লেছে। বৃষ্টির পর নাকি নদীটি কানায়-কানায় ভ'রে ওঠে ও খরতর বেগে স্রোত বইতে থাকে। সেতু পার হ'য়ে মোড় ফিরতেই রাস্তার বাঁদিকে একটা ঝিল আর তারই ওপর একটি সুদৃশ্য প্রমোদভবন র'য়েছে দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দর একটি প্রমোদকুঞ্জও সেখানে র'য়েছে। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য বৃক্ষের ছায়াতলে গাড়ীটাকে রেখে আমরা একটু হেঁটে বাঁচি! মিঃ জোয়ারদার একটি পাত্রে সুপেয় জল-ভরতি ক'রে নিয়ে এসেছিলেন, কয়েকটি সুমিষ্ট কদলীও সঙ্গে ছিলো। ওখানে আমরা সকলেই জলপান ক'রে তৃষ্ণা দূর করি! ঐ সময় মুখরোচক সুস্বাদু কদলী ভক্ষণের সুযোগও নষ্ট করি না। আবার গাড়ী চ'ল্‌তে সুরু ক'রলো। অত্যল্প সময়ের মাঝেই আমরা টঙ্ক্‌ শহরে এসে পৌছলাম।

এই রাজ্যটি পূর্ব্বে জয়পুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আমীর খাঁ নামে এক অতি দুর্দ্ধর্ষ দস্যু ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ভূপাল রাজ্যের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়। কিন্তু শীগ্‌গীরই ঐ কাজ ত্যাগ ক'রে সে যশোবন্ত রাও হোলকারের অধীনে কাজ ক'রতে থাকে। যশোবন্ত রাও জয়পুরের মহারাজার নিকট হ'তে টঙ্ক্‌ রাজ্য কেড়ে নেন ও পরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রশংসনীয় কাজের পুরস্কারস্বরূপ আমীর খাঁকে দিয়ে দেন। আমীর পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তায় আরো অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিজ রাজ্যভুক্ত ক'রে নিতে সমর্থ হয়। আমীর খাঁর মৃত্যুর পরে তার পুত্র অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত হ'য়ে পড়ে। ফলে, তাকে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হ'তে হয়। ঐ ঋণ পরিশোধের আর কোনোই উপায় না থাকায় রাজ্যের অনেকটা অংশ বেরিয়ে যায়। তাই বর্ত্তমানে টঙ্ক্‌ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য।

টঙ্কের সীমা ছাড়িয়ে আমরা বুন্দিরাজ্যের এলাকায় এসে পড়ি। কিন্তু

টঙ্ক্‌ হ'তে বুন্দি পর্য্যন্ত যে দূরত্বের ব্যবধান তার মধ্যে মাঝে মাঝে জয়পুর, উদয়পুর ও বৃটিশ রাজ্যের খণ্ড খণ্ড অংশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খুব শীগ্‌গীরই আমরা দেউলীতে গিয়ে পৌছি। ঐ স্থানটি বৃটিশের শাসনাধীন। তাই গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেউলীতে বন্দীশালা নির্ম্মিত হয়। অনেক বাঙালী যুবক ওখানে বন্দী জীবন যাপন ক'রে গেছেন। আমরা দেখ্‌লাম, দেউলী ক্যাম্পটি ভেঙে দেয়া হ'য়েছে। তবে কয়েকটি বাংলো তখনো অক্ষত অবস্থায় আছে এবং বৃটিশের কর্ম্মচারী দু'চারজন সেখানে তখনো বাস ক'রছেন। বছরখানেক বাদে আর-একবার গিয়ে দেখি ক্যাম্পের সংস্কার কার্য্য আবার সুরু হ'য়েছে।

ঐ স্থানটি অতিক্রম ক'রে যখন বুন্দি রাজ্যের সীমানায় এসে পড়ি তখন এক অভাবনীয় দৃশ্য আমাদের একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলে। দেখি গরু, মহিষ, উট, গাধা, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির অগণিত শ্রেণী নিয়ে অসংখ্য লোক পথ বেয়ে চ'লেছে। ধূলায় গগন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। আপন ঘর-বাড়ী ছেড়ে সপরিবারে স্ব স্ব সম্পত্তি সঙ্গে ক'রে তারা নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু ক'রেছে। গোপালদা' ঝাড়শাহী ভাষা (রাজপুতানার চল্‌তি ভাষা) এতো বেশী আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন যে, রাজপুতানার যে-কোনো স্থানে গিয়েই সেখানকার অধিবাসিগণের কথা বুঝতে বা তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে তাঁর আদৌ অসুবিধে হয় না। ঐ সকল নিরুদ্দেশ যাত্রী ও গো-মহিষাদির জন্য আমাদের গাড়ীর গতি অতিমাত্রায় ধীর-মন্থর হ'য়ে যায়। নিরুদ্দেশ যাত্রিদের মধ্যে মাতোব্বর শ্রেণীর দু'চারজনকে ডেকে গোপালদা' তাদেরই মাতৃভাষায় তাদেরই নিকট হ'তে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তাদের বেশভূষা ও বাহ্য অবস্থা দেখে আমরা অনুমান ক'রে নিলাম, ওরা যাযাবর জাতি। হয়তো একস্থানে কিছুদিন ছিলো আবার

অপর স্থানে আশ্রয় খুঁজবার জন্য বেরিয়েছে। এক হিসেবে ওরা যে যাযাবর এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের হাবভাবে আমরা ধ'রে নিলাম ওরা অর্থ সাহায্য প্রার্থনা ক'রছে। কিন্তু গোপালদা' যখন তাদের সঙ্গে আলাপের মর্ম্ম আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, তখন দেখি আমরা ঠিক বিপরীত অর্থটি ধ'রে ব'সে আছি। তাদের নিজেদের জন্য প্রাণ থাক্‌তে একমুষ্টি ভিক্ষারও প্রত্যাশী তারা নয়! তবে তারা যে তাদের চিরপ্রিয় বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যাচ্ছে তা' শুধু ঐ মূক পশুদের জন্য। তারা আস্‌ছে মাড়োয়ার প্রদেশ হ'তে! যোধপুর,বিকানীর প্রভৃতি রাজ্যে উপর্য্যুপরি চা'র বছর অনাবৃষ্টি হওয়ায় গো-মহিষাদি বাঁচাবার জন্য সে সকল অঞ্চলে তৃণজল নেই। তাই যে দেশে তৃণজল আছে সেই দেশের দিকেই ওদের যাত্রা! মলিন বেশ ও রুক্ষ কেশের মাঝে এতোখানি আত্মমর্য্যাদার ভাব লুকিয়ে থাক্‌তে পারে এটা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলো। 'যতোক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে একটুও শক্তি-সামার্থ্য আছে ততোক্ষণ পর্য্যন্ত কারোও অনুগ্রহপার্থী হবো না'—এই উক্তির মাঝে কতোখানি গরিষ্ঠ ভাব, কতোখানি আত্মমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখ্‌বার স্পৃহা! ঐ নিরক্ষর, মলিনবেশ, রুক্ষকেশ যাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপিনই মস্তক নত হ'য়ে আসে! ধীরে ধীরে আমরা পথ অতিক্রম ক'রে চ'ল্‌লাম। বুন্দিরাজ্যের এলাকার জমি সবই প্রায় অনুর্ব্বর! ঐ সব দেখি আর ভাবি, রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যগুলির আয়ের পথ কি? কোন্ উপায়ে ওরা রাজস্ব সংগ্রহ করে? ভেবে অবশ্য কোনোই প্রকৃত সমাধানে পৌছতে পারি নি।

ক্রমে আমরা বুন্দির নিকটবর্ত্তী হই। দূর হ'তে বুন্দির রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ কী অপূর্ব্ব দেখায়! সত্যিই এমনটি আর কোথাও দেখিনি। এ যেন শক্তিশালী শিল্পীর হাতে-আঁকা নিখুঁত একখানি ছবি। মনে

হয়, প্রকাণ্ড একখানি চিত্রপট পাহাড়ের গায়ে এঁটে দেয়া আছে। ১৩৪২খৃষ্টাব্দে দেবরাও কর্ত্তৃক বুন্দিরাজ্য স্থাপিত হয়। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে বুন্দির অধিপতি রাও সুরজান মেবারাধিপতির অধীনে থেকে যে রনথম্বর দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ক'রতেন, এক রাজ্যখণ্ডের লোভে সেটা তিনি মোগল সম্রাটের হস্তে সমর্পণ ক'রতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না! সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে বুন্দিরাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সম্রাট ঐ রাজ্যের কতোকাংশ অর্থাৎ চম্বল নদীর দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ মাধো সিং নামে রাও সুরজানের এক প্রপৌত্রকে অর্পণ করেন এবং তাঁকে 'কোটার রাও' আখ্যায় অভিহিত করেন। তাহ'লে বুন্দি ও কোটা যে একই রাজবংশসম্ভূত এ সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় রইলো না। সম্রাট শাহ্‌জাহানের জাবদ্দশাতেই যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা ও তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবের মধ্যে সংগ্রাম বাধে, তখন বুন্দির অধিপতি ছত্তরশাল জ্যেষ্ঠ দারার পক্ষাবলম্বন করেন, কিন্তু তিনি সামগড়ের যুদ্ধে নিহত হন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় আজিম ও মোয়াজ্জেমের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিবাদ বাধে। বুন্দির হাড়া রাজ-পুতগণ তখন মোয়াজ্জেমের পক্ষাবলম্বন করেন এবং যুদ্ধে তাঁদেরই জয়লাভ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হোল্‌কারের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যায়। বুন্দির রাজা এই যুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করেন। ফলে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বুন্দিরাজের এক সন্ধি হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বুন্দিরাজ্যের অধীশ্বরের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর এগারো বৎসরের বালক-পুত্র সিংহাসনে বসেন। বালক-রাজার মাতাই প্রতিভূস্বরূপ রাজকার্য্য পরিচালনা ক'রতে থাকেন। কিন্তু রাজমাতার

কর্ত্তৃত্বে রাজ্যের সর্ব্বত্র অরাজকতা দেখা দেয়। ক্ষমতার মোহ তাঁকে এমনি পেয়ে ব'সে যে পুত্র যখন রাজ্যভার নিজেই গ্রহণ ক'রবার উপযুক্ত হন তখনো তিনি কিন্তু ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হন না। আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজ গর্ভজাত সন্তানকে নানা প্রলোভনের মধ্যে রেখে উন্মার্গগামী ক'রে তুল্‌তেও ছাড়েন না। এই সব দেখে-শুনে ঐ রাজ্যের এক রাজনীতিকুশল মন্ত্রী আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজমাতার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁর পরিচালনাধীনে রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু অত্যল্পকালমধ্যেই গুপ্তঘাতকের হস্তে এঁর প্রাণ বিনষ্ট হয়। ক্রমে রাজ্যের আভ্যন্তরীন অবস্থা অতি শোচনীয় হ'য়ে ওঠে। পরে এক বিচক্ষণ ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির পরিচালনাধীনে রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা আবার ফিরে আসে।

* * * *

আমরা বুন্দি শহরের বাইরের যে অবস্থা দেখ্‌তে পেলাম তা'তে মনে হ'লো রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অনেকটা হ'য়েছে। কিন্তু শহরের ভেতরের অবস্থা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। শহরটি অতি ক্ষুদ্র, তার ওপর যারপরনাই অপরিচ্ছন্ন। রাস্তাগুলি অতি সঙ্কীর্ণ। অতি কষ্টে আমাদের গাড়ী শহরের বাইরে এসে পড়ে। বাইরে এসে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। দেখি, অনেক নতুন নতুন সুন্দর প্যাটার্ণের বাসভবন নির্ম্মিত হ'য়েছে ও হ'চ্ছে। এ পর্য্যন্ত রাজস্থানের যতোগুলি স্থান দেখ্‌লাম, বুন্দির মতো রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি। বুন্দি হ'তে কোটা বাইশ মাইল। ওখান থেকে যখন গাড়ী ছাড়ে তখন সোয়া-পাঁচটা। রাস্তা বেশ সুন্দর। গাড়ী খুব ছুটে চলে। প্রায় একঘণ্টা সময়ের মধ্যে চম্বল নদীর ব্রিজের

ওপর আমরা এসে উঠি। রাজস্থানে এই প্রথম স্রোতস্বিনী নদী চোখে প'ড়লো। এই কারণেই ঐ রাজ্যের জমিগুলি খুব উর্ব্বরা। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল দেখে মন আনন্দে নেচে উঠ্‌লো। নদীবহুল বাংলা দেশের লোক আমরা। সুতরাং নদীবিরল দেশে নদী দেখ্‌তে পেয়ে মন আনন্দে মেতে উঠ্‌বে না কেন? নদীটি পার হ'য়ে আমরা কোটা শহরে প্রবেশ করি। শহর ব'ল্‌লেই ঐ দেশের লোকে প্রাচীর-বেষ্টিত নগর বুঝে থাকে। কিন্তু আমরা যেস্থানে গিয়ে উপস্থিত হই সেটা প্রাচীরের বাইরে। পূর্ব্বেই ঠিক ছিলো, আমরা ডাক-বাংলোয় গিয়ে রাত্রিবাস ক'রবো। তাই সেই দিকেই আমাদের গাড়ী চ'ল্‌তে থাকে। পথের মাঝে পড়ে সুন্দর ছবির মতো কলেজভবন, প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন, আরো কতো কি! আর-একটু-চ'ল্‌তেই হঠাৎ পথের মাঝখানে গাড়ীর ইলেক্ট্রিক হর্ণটি বিগ্‌ড়ে যাওয়ায় বিরামহীন বিকট শব্দ হ'তে থাকে। আমরা গাড়ী থেকে নেবে পড়ি। ড্রাইভার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইঞ্জিনের সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হয়।

ঠিক ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে কোটা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় আপ্‌জি সাব্‌ জুড়িগাড়ীতে যাচ্ছিলেন। ওখানে এসেই তিনি তাঁর গাড়ী থামাতে আদেশ দেন। আমরা বুঝতেই পারিনি যে ইনিই ঐ রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু গোপালদা' তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন, তবে না চিন্‌বার ভান ক'রে তিনি তাঁর প্রশ্নাদির যথাযথ উত্তর দিতে থাকেন। মাননীয় আপ্‌জি সাব্‌ চ'লে যাবার পর সব কথা তিনি আমাদের খুলে বলেন।......গাড়ীর সংস্কারকার্য্য শেষ হ'তে প্রায় আধঘণ্টা সময় কেটে যায়। আবার আমরা গাড়ীতে উঠে বসি। অত্যল্পকাল মধ্যেই ডাক-বাংলোয় গিয়ে পৌঁছি। বাংলোটি কোটা রেলষ্টেশনের অতি সন্নিকট। আমাদের সকলেই তখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। আহারের

প্রচুর আয়োজন আমাদের সঙ্গেই ছিলো। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে আমরা আহারে বসি। আহারান্তে কিছুক্ষণ গল্পগুজবে সময় কেটে যায়। মিঃ জোয়ারদার তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র একটি কাম্‌রা বন্দোবস্ত ক'রে নিলেন। গোপালদা' আর আমি একই কাম্‌রায় মেঝেতে বিছানা ক'রে শুয়ে পড়ি। অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের উভয়ের মধ্যে গল্পগুজব চলে। তারপর রাত্রি প্রায় দেড়টায় আমরা নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাই।

পরদিন প্রাতে শয্যাত্যাগ ক'রে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ ক'রে চা-পান করি। ইত্যবসরে মিঃ জোয়ারদার নিজকার্য্যব্যপদেশে গাড়ীখানি নিয়ে বেরিয়ে যান। কথা ছিলো, শীগ্‌গীর ফিরে আসবেন, কেন না কোটা শহরের যা-কিছু দর্শনীয় আছে সে-সব দেখে সেইদিনই দুপুরে আমাদের জয়পুরে ফিরবার কথা। কিন্তু যথাসময়ে গাড়ী ফিরে আসে না দেখে আমরা উভয়ে বাংলো হ'তে বেরিয়ে রাস্তায় চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে রাজপ্রাসাদের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হই। কোটা রাজপ্রাসাদের চতুঃসীমা বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত। প্রাসাদের চতুঃসীমার এক ঘেরা অংশে একটি কৃত্রিম বন দেখ্‌তে পাই। শুনি, সেই বনে মহারাজার শিকারের সুবিধের জন্য চিতাবাঘ, হরিণ, শূকর প্রভৃতি হিংস্র পশু ছেড়ে দেয়া আছে। প্রতি দ্বারে শাস্ত্রী প্রহরায় নিযুক্ত আছে। রাস্তার ধারে একস্থানে ব'সে আমরা নানা গল্পে সময় অতিবাহিত ক'রতে থাকি। বেলা প্রায় এগারোটা তখন বাজে! তখনো গাড়ী ফেরে না! আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রবার পর আমরা ডাক-বাংলোয় ফিরে যাই। কোটায় সম্পূর্ণ একটা দিন অপেক্ষা ক'রবার উপায় আমাদের ছিলো না। সুতরাং শহরের ভেতরে কিছুই আমাদের আর দেখা হ'লো না। বেলা বারোটায় মিঃ জোয়ারদার গাড়ী নিয়ে ফিরে আসেন। জানা যায়,

তাঁকে কয়েকদিন কার্য্যোপলক্ষে কোটায় থাক্‌তে হবে। আমরা তখনি গাড়ীতে উঠি।

ফিরবার পথে আবার সেই জনস্রোতের সম্মুখীন হ'তে হয়। মনে হ'লো, মাড়োয়ার প্রদেশ একেবারে জনশূন্য হ'য়ে গেছে! আমাদের গাড়ী ও আমরা একেবারে ধূলিধূসরিত হ'য়ে যাই। পথভ্রমণের একঘেয়ে ভাবটা কাটাবার উদ্দেশ্যে রসসাগর গোপালদা' নানা কৌতুকপ্রদ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে থাকেন। সানন্দে সময় অতিবাহিত হয়। বাংলা দেশে নৈহাটীর এক অভিজাত পণ্ডিতবংশে এঁর জন্ম। সুতরাং ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের নীরস কটমট কার্য্যে ব্যাপৃত থাক্‌লেও সংস্কৃত ভাষার লালিত্যের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হন নি। ভারত-বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এঁর জ্যেষ্ঠতাত। জয়পুর মহারাজা কলেজের তৎকালীন ভাইস্-প্রিন্সিপাল স্বর্গত পূজ্যপাদ মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য এঁর পিতা। এঁর মধ্যম ভ্রাতা ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল জয়পুর ষ্টেটের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-এ হুগ্‌লী গভর্ণমেণ্ট কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। অর্থকরী বিদ্যা হিসেবে অপর বিদ্যায় পারদর্শিতা লা'ভ করলেও জন্মগত বা বংশগত সংস্কার যাবে কোথায়? সাহিত্যের রসবোধ এঁর মজ্জাগত। তাই সাহিত্যের চর্চ্চা এঁর ভালো লাগে, অনুসন্ধিৎসা এঁর স্বভাবসিদ্ধ। যাহোক, এরূপ সরস আলাপ-প্রসঙ্গ ক'রতে ক'রতে আমরা সন্ধ্যা সাড়ে-ছয়টায় জয়পুরে এসে পৌছি। সুদীর্ঘ দেড়শো মাইল পথভ্রমণের অবসান ঘটে!

(১৩)

জয়পুরের বাঙালী প্রবাসীরা এখানে প্রতি বৎসর জগন্মাতার অর্চ্চনা ক'রে থাকেন। ঐ কাজেরও প্রধান পাণ্ডা গোপালদা'। একটা বিষয় লক্ষ্য ক'রবার আছে এই, জয়পুরের যে-কোনো সার্ব্বজনীন ব্যাপারে আমার গোপালদা'র সহযোগিতা যেন অপরিহার্য্য। তাঁর সহায়তা না পেলে যেন কোনো কার্য্যই সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হবার উপায় নেই। দুর্গাপূজা আসন্ন। সুতরাং মনে ক'রলাম, আমাদের ভ্রমণ তালিকারও পরিসমাপ্তি ঘ'ট্‌লো। এমন সময় হঠাৎ একদিন জান্‌তে পারি, আশী মাইল দূর আজমীরে যেতে হবে। আমার দিক দিয়ে অসম্মতির কারণ থাকৃতেই পারে না। এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে যতোটা নতুন নতুন স্থান দেখে নেয়া যায় আমার পক্ষে ততোই ভালো! আজমীর বৃটিশ শাসনাধীন। জয়পুর হ'তে সোজা আজ্‌মীর রোড্‌ ধ'রে ও'র শেষ প্রান্তে আমাদের পৌছতে হবে। মাঝে কিষেনগড় ষ্টেট্‌ নামে অতি ক্ষুদ্র একটি দেশীয় রাজ্য পড়ে। রাজ্যটি ক্ষুদ্র হ'লেও রাজস্থানের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বংশের মর্য্যাদা ও অভিজাত্য হিসেবে এ'র স্থান অনেক উচ্চে।......যতোই আমরা আজমীরের নিকটবর্ত্তী হই ততোই পাহাড়ের ঘন সন্নিবেশ চোখে প'ড়তে থাকে।

আজমীর শহরের বহির্ভাগ হ'তেই রাস্তা খুব আঁকা-বাঁকা দেখ্‌তে পাই। ক্রমে অনেক সরকারী দপ্তরখানা, কয়েকটি জীবনবীমার অফিস, খৃষ্টান মিশনারীদের ডোম্‌স্‌ ইত্যাদি পেছনে ফেলে রেখে আমরা ক্লকটাওয়ারের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হই। ওখানে আমার এক খুড়তুতো ভাই রেলওয়ে ট্রেনিংয়ে ছিলো। প্রথমেই তার সন্ধান নেয়া হয়। আমাদের

সহগামী এক বন্ধু এদিকে তাঁর নিজের ও আমাদের সকলের পেটের জ্বালা নিবারণকল্পে রেলওয়ে রেস্তোঁরায় যাবার জন্য অস্থির হ'য়ে ওঠেন। তাঁর এই সুন্দর প্রস্তাবটি অবশ্য সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন ক'রে তাঁর অনুবর্ত্তী হয়। সাহেবীখানার ব্যবস্থা হয়। সকলের উদরপুষ্টি হ'লে সেই বন্ধুটিই রেস্তোঁরার পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেন।

এবারে আজমীরের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ স্থান দু'একটা দেখ্‌বার পালা! প্রথমেই যাই 'আনাসাগর' দেখ্‌তে! এটি একটি ক্ষুদ্র হ্রদ, চারিদিকেই পাহাড়। সম্ভবতঃ চৌহানরাজবংশের প্রথম রাজা অর্ণরাজের নামানুসারেই হ্রদটির নামকরণ হয়। এ'র একদিকে শ্বেতপাথরের তিনটে প্যাভিলিয়ন র'য়েছে। ঐ তিনটে প্যাভিলিয়ন সম্রাট শাহ্‌জাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। অদূরে কয়েকটি বাঁধানো ঘাটও দেখ্‌তে পাই। বর্ষাকালে ঐ হ্রদ নাকি অতি ভীষণাকার ধারণ করে। এ'র প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কতো মনোরম তা' স্বচক্ষে না দেখ্‌লে হৃদয়ঙ্গম করাই কঠিন। পাহাড়ের ওপর একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন দুর্গ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ওটাই নাকি চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের দুর্গ। ওকে বলা হয় তারাগড়। এখন সবই বৃটিশের কর্ত্তৃত্বাধীনে। হ্রদের ওপর একটি পাহাড়ের মাথায় চীফ্‌ কমিশনারের কুঠী। এ সব দেখ্‌বার পর প্রস্তাব হয়, আজমীরে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান সেই প্রাচীন দর্গাটি দেখ্‌তে হবে। সম্রাট আকবর নাকি তাঁর পুত্র সেলিমের দীর্ঘজীবন কামনায় পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতিমতো আগ্রা হ'তে কিঞ্চিদধিক দু'শো মাইল পথ পদব্রজে গিয়ে উক্ত দরগায় সিন্নী দেন! ঐ স্থানটিতে গিয়ে পৌছতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়। রাস্তাগুলি এতো সঙ্কীর্ণ, অপরিসর ও অপরিচ্ছন্ন যে গাড়ী ও'র মধ্য দিয়ে চালানোই দুষ্কর। শহরের বা'রে থেকে আজমীরের দৃশ্য অতি সুন্দর ব'লে মনে হয়,

কিন্তু ভেতরে গেলেই সুখস্বপ্ন ভেঙে যায়। ঐ দরগাটি দর্শন ক'রবার পরই জয়পুরে ফিরে যাই। ওখান থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে প্রসিদ্ধ পুষ্করতীর্থ আর দেখা হয় না শুধু সময়াভাবে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই আমরা জয়পুরে পৌঁছে যাই। তখনো বেলা আছে! দুর্গাপূজার আগে এইটেই আমাদের শেষভ্রমণ!

* * * *

অক্টোবর মাসের শেষ হপ্তায় আমার এলাহাবাদে যাবার কথা ছিলো। কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব হ'তে থাকে। এদিকে পূজার পর এক হপ্তা কেটে যায়, তথাপি আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। শেষে দেয়ালী উৎসবের দু'তিন দিন আগে গোপালদা', তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক মঞ্জুবাবু ও আমি জয়পুরাধিপতির প্রাচীন রাজধানী অম্বর (আমের প্রাসাদ) দেখ্‌তে চ'ল্‌লাম। জয়পুর হ'তে অম্বর মাত্র ছয় মাইল! অথচ জয়পুরে যাবার পর প্রায় দুই মাসের মধ্যে বহু দূরের অন্যান্য স্থানসমূহের ইতিবৃত্ত কতোকটা সংগ্রহ ক'রলেও অতি-নিকটের এই স্থানটি দেখ্‌বার সুযোগই জুটে ওঠেনি!......প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপর এই প্রাচীন রাজধানীটি অবস্থিত। মহারাজা দ্বিতীয় রামসিংয়ের রাজত্বকালেই জয়পুর হ'তে অম্বর যাবার রাস্তা আধুনিক প্রণালীতে সুন্দর ক'রে প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে মোটর একেবারে মায়ের মন্দিরের গেটের সাম্‌নেই গিয়ে পৌঁছতে পারে। তবে স্বয়ং জয়পুরাধিপতি ব্যতীত অপর কেউ মোটরে ক'রে ওপরে ওঠ্‌বার অধিকারী নন। রাজপ্রাসাদটি মন্দিরের সহিত সংলগ্ন। ঐ মন্দিরে দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। রাজা মানসিং কিছুকালের জন্য বাংলার সুবাদার ছিলেন। সেই সময়ে ইনি যশোরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা প্রতাপাদিত্যকে এবং বিক্রমপুরের

চাঁদরায় ও কেদাররায়কে যুদ্ধে পরাভূত করেন। কেউ কেউ বলেন, মানসিং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে যশোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরীকে এনে অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু আবার কারো কারো মতে ইনি বিক্রমপুরের শীলা দেবী। তবে মায়ের পূজারীদের কাছ থেকে সুস্পষ্টভাবেই জানা গেছে, ইনিই যশোরেশ্বরী। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশ থেকে এই দেবী-মূর্তি আন্‌বার কালে ঐ সঙ্গে পুরোহিতকেও আনা হয়। সেই বংশই এখনো মায়ের পূজারী। এঁদের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ এঁদের বেশভূষা, কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদি দেখে কেউই বুঝতে পারবেন না যে এঁরা বাঙালী। ঐ মন্দির ব্যতীত অম্বরে আরো অনেকগুলি মন্দির দেখ্‌তে পাই। তার মধ্যে মীরা বাঈয়ের মন্দির, কল্যাণজীর মন্দির ও নরসিংজীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য। ঐ সব দেখে আমরা 'পান্নামিঞার কুণ্ড' দেখ্‌তে যাই। টোডারাইসিংয়ে 'রাণীকুণ্ড' দেখেছিলাম, এবারে 'পান্নামিঞার কুণ্ড' দেখ্‌লাম। মনে হ'লো, উভয়ের মধ্যে নক্সার কোনোই পার্থক্য নেই।...ওখান থেকে আমরা রাজপ্রাসাদ দেখ্‌বার উদ্দেশ্যে ক্রমোন্নত পাহাড়ের ওপর উঠ্‌তে থাকি। খানিকটা পথ উঠে হাঁপিয়ে যাই। আরো একটু উঠে আবার খানিকটা হাঁপাতে হয়। এই রকম ক'রে বহুকষ্টে প্রাসাদের পেছন-দিকের প্রবেশদ্বারের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হই। তখন আমরা সকলেই তৃষ্ণার্ত। দেওয়ান-ই-আম-এর (দরবার-গৃহের) চত্বরে গিয়ে ব'সবার পর আমাদের জন্য অতি সুপেয় জল আনা হয়। জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। এবার প্রাসাদের অভ্যন্তর দেখ্‌বার পালা। প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে প্রাসাদের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ ক'রবার দ্বারটির ওপর। শুধু এই সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত দ্বারটিতেই কতো অর্থ যে ব্যয়িত হয় তা' আমাদের ধারণার বাইরে। তারপর মোমবাতির সাহায্যে

গাইড্ নীচে এক ঘোর অন্ধকারময় স্থানে অতি সন্তর্পনে আমাদের নিয়ে চলে। সে স্থানে রাজমহিষীরা স্নান ও অতিরিক্ত গ্রীষ্মে বিশ্রামলাভ ক'রতেন। সেখান থেকে আবার আমরা ওপরে উঠে এবারে যাই দেওয়ান-ই-খাস-এ (জেনানা দরবার-গৃহে)।

এখান হ'তে নীচের উপত্যকায় দৃষ্টিপাত করি। ঐ দৃশ্যটি খুবই চমকপ্রদ ব'লে প্রতীয়মান হয়। প্রাসাদাভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই সুদক্ষ শিল্পীর নিপুন হস্তের পরিচয় পাই। সিস্‌মহলের সৌন্দর্য্যই দর্শকের চিত্ত সবচেয়ে অধিক বিমোহিত করে। দেখে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ভাষায় সম্যক্ প্রকাশ করা অতি দুরুহ। দেয়ালের গায়ে, ছাদে, সর্ব্বত্রই কাঁচের সূক্ষ্ম কার্য্য বিদ্যমান। শিল্পী বা ঐতি-হাসিকের চোখ দিয়ে দেখ্‌তে হ'লে অত্যল্প-সময়ে ঐ সকল দেখে আদৌ তৃপ্তি হয় না। সাধারণ দর্শক হিসেবে দেখেই আমাদের প্রায় তিনঘণ্টা সময় লেগে যায়। একস্থানে একটি শিলালিপি দেখ্‌তে পাই। তার ওপর ফারসী ভাষায় কতো কি লেখা! তা'থেকে জানা যায়, অম্বরাধিপতি মানসিং রাজা ভগবানদাসের পুত্র নন— তাঁর পিতার নাম ভগবন্তদাস। জেষ্ঠতাত তাঁকে পোষ্য নিয়েছিলেন। ভগবানদাসের মৃত্যুর পর মানসিং সিংহাসনারোহণ করেন। দেওয়ান-ই-আম-এর তলভাগ একটি অন্ধকারময় প্রকাণ্ড ভল্ট্। মাত্র ক'বছর হ'লো, তার অভ্যন্তর হ'তে ভাঁজ-করা খুব বড়ো একখানা গালিচা ও বিস্তর পুরোণো দলিলপত্র উদ্ধার করা হ'য়েছে। ষ্টেট্ রেকর্ড থেকে নাকি জানা গেছে ঐ গালিচাখানি ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পারস্য হ'তে খরিদ করা হয়।

বর্ত্তমানে ওটা জয়পুর মিউজিয়মে রক্ষিত হ'য়েছে। মঞ্জুদা' ও আমি একদিন গিয়ে সেটা দেখে আসি। তার মূল্য নাকি দেড়লক্ষ

টাকা ধার্য্য হয়। কিঞ্চিদধিক তিনশো বছর ধ'রে ঐরূপ অনাদৃত অবস্থায় প'ড়ে থেকেও ও'র সৌন্দর্য্য যে অক্ষুন্ন র'য়েছে তা হ'তেই ও'র প্রস্তুতকারকের কর্ম্মকুশলতা উপলব্ধি করা যায়। যাহোক, এই সব দেখে আমরা যখন দেবী-দর্শনে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হই তখন মায়ের অর্চ্চনাদি শেষ হ'য়ে যাওয়ায় মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করা হ'য়েছে! বেলা তখন একটা। বারোটার মধ্যেই পূজার্চ্চনাদি, ভোগরাগ সবই শেষ হ'য়ে যায়। দেবী-দর্শন আর আমাদের হ'লো না! সুতরাং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা মন্দির-প্রাঙ্গনের বাইরে এসে যাই। পরে অম্বরে আরো দু'বার যাই এবং দু'বারেই মায়ের দর্শন পাওয়ায় প্রথমবারের ক্ষোভ মিটে যায়। আমাদের গাড়ী ছিলো অনেকটা নীচে। সেখানে পৌছতে আমাদের বেশ সময় লাগে। গাড়ীতে উঠে ব'স্‌বার আগে আর-একবার প্রাচীন রাজপ্রাসাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি! দূর হ'তে দৃশ্যটি মনের ওপর একটা স্থায়ী ছাপ মেরে দেয়। রাজপ্রাসাদের তলদেশে প্রাচীন অম্বর শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান এখন ভীষণ অরণ্যসঙ্কুল ও হিংস্র বন্যপশুদের আবাসস্থল। মাঝে মাঝে ঐ সব স্থান হ'তে বাঘ বেরিয়ে আসে। গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যা সাম্‌নে পায় মেরে খেয়ে ফেলে। সুযোগ পেলে মানুষকেও আক্রমণ করে।

(১৪)

আমার ঐতিহাসিক মনোভাব বুঝে গোপালদা' একদিন প্রস্তাব করেন, একবার প্রাচীন রনথম্বর দুর্গ-দর্শনে গেলে কেমন হয় ? প্রস্তাবটি শুনে আমি আনন্দে আত্মহারা ! এমন সুযোগটি আর কবে পাবো ? তখনি যাবার ব্যবস্থা পাকাপাকি হ'য়ে যায় ! অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে একদিন গোপালদা', তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ হিতেন ও আমি—এই তিনজনে রনথম্বর-দর্শনে যাত্রা করি। বেলা তখন অনুমান এগারোটা। সোয়াই-মাধোপুর জয়পুর রাজ্যের একটি জিলা শহর—দূরত্ব জয়পুর হ'তে পুরোপুরি একশো মাইল। সেখান হ'তে রনথম্বর দুর্গ সাত মাইল মাত্র। আগ্রা রোড্ ধ'রে বরাবর বত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রবার পর ডৌসায় এসে পৌছানো যায়। সেখান থেকেই সোয়াই-মাধোপুরের রাস্তা বেরিয়ে গেছে। কি সুন্দর মসৃণ রাস্তা ! এমনটি কোথাও দেখিনি ! কিছুদূর গিয়েই লালসোট শহর। মরাঠাদের সঙ্গে রাজপুতদের এই স্থানে নাকি ভীষণ এক যুদ্ধ হয় !...আমরা দ্রুত ছুটে ক্রমে বানাস্ নদীর তীরে এসে উপস্থিত হই। তখন ফ্ল্যাট্ বোটে ক'রে মোটরগাড়ী পারাপার করা হ'তো। পরে আরো দু'একবার যখন সোয়াই-মাধোপুরে গেছি তখন অবশ্য নদীর মাঝখান দিয়েই চ'লে গেছি, ফ্ল্যাটে পার হ'তে হয় নি। তবে বর্ষাকালে স্বতন্ত্র কথা ! বেলা আড়াইটায় সোয়াই-মাধোপুরে গিয়ে পৌছি। কিন্তু দিন থাক্‌তে-থাক্‌তে রনথম্বরে গিয়ে আবার দিন থাক্‌তে থাক্‌তেই ফিরে আস্‌তে না পারলে বাঘের মুখে প'ড়ে যে-কোনো মুহূর্ত্তে প্রাণ

হারাবার আশঙ্কা আছে ! এই কারণে আমরা স্থির করি, সোয়াই-মাধোপুর হ'তে চব্বিশমাইল দূর খণ্ডারে গিয়ে সেদিনকার মতো রাত্রিবাস ক'রবো। পরদিন সকালে সেখান থেকে ফিরে এসে রনথম্বরে যাত্রা ক'রবো এবং সেখানকার সব কিছু দেখে-শুনে দিন থাক্‌তে-থাক্‌তেই আবার নেবে আস্‌বো। এই পরিকল্পনানুযায়ী আমরা বেলা চারটায় খণ্ডার অভিমুখে রওনা হই। প্রথমে জয়পুর ও গোয়ালিয়র রাজ্যের সীমারেখা চম্বলনদী-তীরে পালি নামক স্থানে যাই। সেখান থেকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে খণ্ডারের দিকে রওনা হই। এই অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব খুব বেশী। শোনা যায়, সন্ধ্যার আঁধারে তারা রাস্তার ধারে ওৎ পেতে ব'সে থাকে এবং চল্‌তি গরু, মহিষ বা উটের দলের মাঝ থেকে দু'একটিকে মুখে ক'রে উধাও হয়। সুবিধে পেলে পথিকদেরও আক্রমণ করে এবং দু'একজনকে মুখে ক'রে নিয়ে যায়।

রাত্রি সাড়ে-আটটায় আমরা খণ্ডার পাহাড়ের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হই। ডাক-বাংলোটি কোথায় অন্ধকারে তা' ঠিকমতো ঠাহর ক'রে উঠ্‌তে না পেরে একস্থানে সমবেত কয়েকটি লোককে জিজ্ঞেস করি তখন এক বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীর ধারে এগিয়ে আসেন। তিনি গোপালদা'র পূর্ব্বপরিচিত। খণ্ডার সোয়াই-মাধোপুর জিলার অধীন একটি মহকুমা। ইনি সেখানকার নায়েব-নাজিম। নাম তাঁর মনীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বাঙালী ভদ্রলোকটি খণ্ডারে ছিলেন ব'লেই আমরা সেখানে যাবার সঙ্কল্প করি। তিনি আমাদের সঙ্গে ক'রে ডাক-বাংলোয় নিয়ে যান এবং রাত্রিকালীন আহার ও বাসের সুবিধে ক'রে দেন। একটু-একটু মিঠে শীত ছিলো। রাত্রিটা বেশ আরামেই কেটে যায়। ভোর হ'তে না হ'তেই দেখি চা ও আনুসঙ্গিক মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি সব টেবিলের ওপর সাজানো ! প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে

আমরা সকলে টেবিলে বসি। বৃন্দাবনে গিয়ে কোন্‌সূত্রে গোপালদা' জান্‌তে পারেন যে আমি আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে মিষ্ট দ্রব্যেরই পক্ষপাতী একটু বেশী। তখন হ'তে যেখানেই আমরা উভয়ে গেছি মিষ্টি খাবার আমার ভাগেই বেশী প'ড়েছে। এবারেও সেই ব্যবস্থার কোনো ব্যতিক্রম হ'লো না! চায়ের সঙ্গে মিষ্টি খাবার যা-কিছু ছিলো তার অধিকাংশই আমার দিকে এগিয়ে দেয়া হ'লো। অবশ্য সেগুলির সদ্ব্যবহার ক'রতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি আমি রাখিনি!

ডাক-বাংলোর সাম্‌নেই খণ্ডার পাহাড় আর তারই মাথায় একটি সুদৃশ্য দুর্গ। দুর্গটি অব্যবহৃত অবস্থায় প'ড়ে আছে। কিন্তু কী মনোহর দৃশ্য! চারিদিক ফাঁকা, মাঝখানে দুর্গটি পাহাড়ের ওপর মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! ওপরে আর উঠ্‌লাম না, সময় সংক্ষেপ ছিলো। চা-পানাদি হ'য়ে যাবার পর খণ্ডারের বাঁধ দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়ি। এতে ঘণ্টাখানেক সময় অতিবাহিত হয়! বেলা সাড়ে-আটটায় সেখান থেকে সোয়াই-মাধোপুরের দিকে রওনা হই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে এসে যাই! রনথম্বরের পাশপোর্ট সংগ্রহ ক'রতে নাজিমের কাছে যেতে হয়। তাতেও আধঘণ্টা কেটে যায়। বেলা সাড়ে-ন'টায় আমরা রনথম্বরের দিকে যাত্রা করি। কিন্তু যাত্রা-পথে একটা বড়ো রকমের বাধা ছিলো—সোয়াই-মাধোপুর হ'তে রনথম্বরের দিকে মোটরের রাস্তা নেই। পায়ে-হাঁটা পথ অবশ্য আছে, কিন্তু বড়োই দুর্গম এবং তা'ও আবার ঐ অঞ্চলের পাহাড়িয়াদেরই কাছে সুপরিচিত! সুতরাং মাঠের মাঝ দিয়ে চার-পাঁচ মাইল পথ আমরা মোটরেই চ'ল্‌লাম। দু'জন গাইড্‌ সঙ্গে নেয়া হ'লো। মাঝে মাঝে গাড়ী হ'তে নেবে খানিকটা পথ পদব্রজে আমাদের যেতে হ'লো। কোনো সময় হয়তো বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ওপর দিয়ে ধীর-মন্থর গতিতে গাড়ী চালিয়ে নেয়া হ'লো।

এই রকম ক'রে ঐ সামান্য পথটুকু অতিক্রম ক'রতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় কেটে যায়। পাহাড়ের তলদেশে গিয়ে যখন পৌছানো গেলো। তখন বেলা অনুমান এগারোটা হবে। ঐ স্থানে গাড়ীখানি একজন গাইডের তত্ত্বাবধানে রেখে আমরা অপর গাইড্‌টিকে সঙ্গে ক'রে এক সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করি। উভয় পার্শ্বে গগনস্পর্শী পর্ব্বত-প্রাচীর আর তাদেরই মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ! এই গিরিসঙ্কটই সম্ভবতঃ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হিন্দাবত গিরিসঙ্কট—যে পথে শত্রুরা বারবার রনথম্বর দুর্গ আক্রমণ ক'রেছে।

যেখানে গিয়ে ঐ গিরিসঙ্কটটি শেষ হ'য়েছে সেখানে একটি প্রাচীন তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাই। সেটা অতিক্রম ক'রতেই এক বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ি। সেখানে বহু ফল-ফুলারীর গাছ আমাদের নয়নগোচর হয়। মাঝে মাঝে কুলগাছ হ'তে কুল পেড়ে খেতে খেতে আমরা হাঁটতে থাকি। তারপর এমন একটি স্থানে গিয়ে উপস্থিত হই যেখান থেকে উত্‌রাই-চড়াই সুরু হয়। হয়তো পাঁচশো ফুট ওপরে উঠি আবার চারশো ফুট নীচে নাবি। এইভাবে তিন-চারবার উত্‌রাই-চড়াই ক'রতে আমরা একেবারে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে যাই। যাঁদের এরূপ অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে কখনো হয়নি তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারবেন না, এই রকম অভিযানের কষ্টের মাত্রা কতোখানি। আর যেন পেরে উঠিনে! অত্যন্ত হাঁপাতে থাকি, অথচ দাঁড়িয়ে একটু দম নেবার অথবা পেছনে ফিরে তাকাবার উপায় নেই। তা'হলেই মাথা ঘুরে গড়িয়ে নীচে গভীর খাতে প'ড়বার সম্ভাবনা! শ্রীমান্ হিতেন একে যুবাপুরুষ, তারপর পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে চেহারা! সে সকলের আগে তাড়াতাড়ি উঠে গেলো, আমরা অনেকটা পেছনে প'ড়ে রইলাম। বহুক্ষণ পরে বহুকষ্টে আমরা 'নওলাক্ষা পোলের' সম্মুখীন হই। এটা

রন্থম্বর দুর্গের একটা গেট। 'সূর্য্য পোল' ও 'দিল্লী পোল' নামে এরূপ আরো দু'টি গেট আছে। সেদিকে আর আমাদের যাওয়া হয় নি। সেই দু'টি গেট নাকি এখন কি কারণে বন্ধ আছে! এই স্থানটিতে আমাদের পাসপোর্ট দেখাতে হয়। গেটরক্ষক তখন আমাদের বলে টুপী অথবা 'সাফা' (পাগ্ড়ী) দিয়ে মাথা না ঢেকে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রবার হুকুম নেই! অবশ্য আমরা সকলেই সাহেববেশী। তবে আমার একটা অসুবিধে ছিলো—মস্তক-আচ্ছাদন ব'লে আমার কিছু ছিলো না। অপর দুই সঙ্গীর মাথায় টুপী ছিলো। তখন আইন বাঁচাবার জন্য আমি আমার রুমালখানা মাথায় রেখে ওপরে উঠি। তিন-চার ফুট প্রশস্ত ও বিশ-পঁচিশ ফুট দীর্ঘ প্রায় দেড়শো সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে আমরা শিখরপ্রদেশে গিয়ে পৌছি। হাজার ফুট উঁচু ঐ শিখরের ওপরে ছয়বর্গমাইলব্যাপী দুর্গটি অবস্থিত—চারিদিক ব্যাট্লমেণ্টস্ (ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীর) দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুর্গটির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ওটা যে-পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত সে-পাহাড়টিও আবার অপরাপর পাহাড়ের দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত। ফলে, বা'র থেকে এই বিরাট দুর্গের অবস্থিতি আদৌ উপলব্ধ হয় না। এই প্রাকৃতিক বেষ্টনীর জন্যই এ'কে দুর্ভেদ্য বলা হ'য়েছে!

স্থানে স্থানে কামান সাজানো র'য়েছে! অবশ্য সেগুলো অতি পুরোণো ও জীর্ণ! এককালে যে ঐ দুর্গ বিরাট, আড়ম্বরপূর্ণ ও ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত ছিলো, একবার দৃষ্টিপাতেই তা' বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। দুর্গের ওপর সৈন্যদের যে-সকল ব্যারাক ছিলো সেগুলো এখন মীনাদের বাসগৃহে পরিণত হ'য়েছে। এই মীনারাই ছিলো রাজপুতানার আদিম অধিবাসী! এককালে এ'রা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলো। এখন চাষবাসই হ'য়েছে এ'দের প্রধান উপজীবিকা। আবাদোপযোগী বহু জমি দুর্গের

চারিধারে র'য়েছে। দেখে-শুনে বারবার আমার এই কথাই মনে হ'তে থাকে, সাময়িক প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে চিন্তা ক'রে দেখ্লে যাকে যোগ্যতম স্থান ব'লে ধরা যেতে পারে এই রন্থম্বর সত্যিই সেই রকমের স্থান। যে-ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম এই স্থানটি আবিষ্কার করেন তাঁর দূরদর্শিতা অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব এবং তিনি সর্ব্বথা আমাদের নমস্য। একদিকে প্রাকৃতিক বেষ্টনী দ্বারা দুর্গটি সুরক্ষিত, অপরদিকে পানীয় ও আহার্য্য অফুরন্ত—এমনই সুযোগ্য স্থান এই রন্থম্বর! সেখানে দু'তিনটি প্রাকৃতিক জলাশয় ও একটি প্রাকৃতিক কূপ দেখ্তে পাই। এই কূপটি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় সে অভিজ্ঞতা যে-কারো জীবনে সম্পূর্ণ অভিনব ব'লে মনে হবে। এটা যেন ঈশ্বরের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! একে বলা হয় গুপ্তগঙ্গা—এই কূপটি সর্ব্বদাই কানায় কানায় পূর্ণ থাকে! আশ্চর্য্য এই যে, যতো জলই এ'র থেকে তোলা হোক না কেন এ'র কিনারা কখনো অপূর্ণ থাকে না। তা' ছাড়া, এ'র জল এতোই সুস্বাদু যে একবার তা' পান ক'রলে কেউ কখনো ভুল্তে পারবে না! আরো একটু বিশদ্ভাবে এবিষয়ের অবতারণা পরে করা যাবে।

আমরা সর্ব্বপ্রথম যাই 'বাদল' (হাওয়া) মহলে। পূর্ব্বে রাজা-রাণীরা এই মহলে ব'সে হাওয়া খেতেন। সত্যিই হাওয়া খাওয়ার প্রকৃষ্ট স্থান! ওখান থেকে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়! নীচে থেকে ঐ স্থানটি হাজার ফুট উঁচু। সেখান থেকে যাই রাজপ্রাসাদে। বর্ত্তমানে ঐ রাজপ্রাসাদে বাস করে নাগা সাধুগণ। রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে আমরা একটি 'জলঘড়ি' দেখ্তে পাই। যখন দুর্গটি সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয় সেই সময় থেকেই নাকি আজ পর্য্যন্ত একই ভাবে ঐ ঘড়ি সময় দিয়ে আস্ছে! বিভিন্ন মহলের অবস্থা অতীব শোচনীয়! যে-সকল দর্শক সেখানে দুর্গ-দর্শনে গেছেন একটি বিষয় অবশ্যই তাঁদের দৃষ্টি এড়ায়

নি। ঐ দুর্গে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতীয় প্রভাবেরই একটা সংমিশ্রণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়! একদিকে যেমন মন্দির ও ছত্রী, অপরদিকে তেমনি মস্‌জিদ্‌ ও কবর পাশাপাশি থাকায় উভয় রাজশক্তির সাময়িক শাসন-আমলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের এক মুসলমান সাধুর সমাধি-সৌধ দেখ্‌তে পাই। সেই প্রাচীনকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত পাহাড়ের তলদেশস্থ অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর স্মৃতিপূজা ক'রে আস্‌ছে। প্রাচীনকালের একটা বারুদখানা নয়নগোচর হয়। শোনা যায়, জয়পুর গভর্ণমেণ্টের বারুদ সরবরাহ আজ পর্য্যন্ত সেখান থেকেই হ'য়ে আস্‌ছে। অবশ্য এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ বিদ্যমান।

এখানে-ওখানে চলাফেরা ক'রতে ক'রতে আমরা সকলেই অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে পড়ি। এক নাগা সাধু আমাদের নিয়ে চ'ল্‌লো গুপ্তগঙ্গার দিকে। গুপ্তগঙ্গার কথা শুনে প্রথমে আমার মনে ঐ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কল্পনার উদয় হ'য়েছিলো। ভাব্‌লাম, হয়তো বা কালিঘাটের আদি গঙ্গার মতোই কিছু সেখানে দেখ্‌তে পাবো! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেখানে গিয়ে দেখি, একটা ছোটো ঘর—তালাবদ্ধ! আমাদের সঙ্গী নাগা সাধুটি গিয়ে ঘরের দরজা খুলে ব'ল্‌লো, সিঁড়ি বেয়ে নীচে গেলে গুপ্তগঙ্গা পাওয়া যাবে। খানিকটা দূর গিয়ে দেখি, বড়োই অন্ধকার। সাধুটি দেশলাই জেলে আগে-আগে চ'ল্‌লো, তার পেছনে ছিলো হিতেন আর তার পেছনে আমি! গোপালদা' আর নাব্‌লেন না। আমিও খানিকটা দূর গিয়েই উঠে আসি। হিতেন শেষ পর্য্যন্ত একাই নীচে নেবে যায়। একটু পরে ফিরে এসে বলে, ওটা একটা কূপ,কিন্তু সর্ব্বদাই কানায়-কানায় পূর্ণ র'য়েছে। একটু পরে আমাদের জন্য ঐ কূপ হ'তে অতি স্বচ্ছ পানীয় জল আনা হয়। সেই জল পান ক'রে আমাদের তৃষ্ণা দূর হয়।

এমন সুস্বাদু, শীতল জল বোধ হয় জীবনে কখনো পান করিনি। আমাদের সঙ্গে পাউরুটি ও মাখন ছিলো। ঐ সময় তারও সদ্ব্যবহার করা হয়।

অল্পদূরে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বৃদ্ধ ব'সে ছিলো। নীচে কয়েকটি গরু চ'রে বেড়াচ্ছিলো। প্রশ্ন করায় জানা যায়, সে জাতিতে পাঠান মুসলমান! পূর্ব্বে ঐ দুর্গেরই এক সৈন্য সে ছিলো। জয়পুর গভর্ণমেণ্ট হ'তে এখন সে পেন্সন পায়! আলাউদ্দিনের সময় হ'তে নাকি তার পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ দুর্গেই বসবাস ক'রে আস্‌ছে। সে বলে, তাকে দুর্গ হ'তে নীচে কখনো নাব্‌তে হয় না। প্রতি দু'হপ্তা অন্তর-অন্তর সোয়াই-মাধোপুর হ'তে ব্যাপারী এসে তার ঘরে-প্রস্তুত ঘি কিনে নিয়ে যায়। ঐ আয় হ'তেই তার স্বচ্ছন্দভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হ'য়ে থাকে। মাত্র আড়াই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা আমরা দুর্গের ওপরে ছিলাম। এই অত্যল্প কালের মধ্যে কি সত্যিকার দেখার আনন্দ পাওয়া সম্ভব? কিন্তু তখনি না ফিরে আমাদের উপায়ান্তর ছিলো না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের নীচে নাব্‌তেই হবে। নইলে বাঘের মুখে পড়া একটুও অসম্ভব নয়। তাই কালবিলম্ব না ক'রে আমরা তখনি দুর্গ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হই। হিতেন আমাদের আগে-আগে নেবে যায়। গোপালদা,' আমাদের ড্রাইভার, একজন গাইড্‌ ও আমি পেছনে-পেছনে চলি। উঠ্‌বার সময় দেখার আনন্দের লোভে খুব উৎসাহ ছিলো। সুতরাং অত্যধিক শ্রান্তি বোধ হ'লেও তখন ঠিক তৎপরিমাণে ক্লান্তি বোধ করিনি। কিন্তু নাব্‌বার সময় একটা অবসাদ এসে আক্রমণ করে।

ধীরে ধীরে আমরা অবতরণ ক'রতে থাকি। কিয়দ্দূর চ'ল্‌বার পর একটি সমতলক্ষেত্রে এসে পৌছি। সেখানে এসে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। কিন্তু হিতেনকে আর দেখা যায় না! এতে আমাদের মনে

একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়। মনে হ'লো, সে নিশ্চয়ই বিপথে গেছে, কারণ পার্ব্বত্য পথ ঐ অঞ্চলের লোক ব্যতীত কারোও সুনির্দ্দিষ্টভাবে ধ'রবার উপায় নেই। এইজন্যই ঐ সকল স্থানে গাইড্ সঙ্গে ক'রে নেবার রীতি আছে। হিতেনের হয়তো মনে হয়, যে-পথ দিয়ে ওপরে ওঠা গিয়েছিলো সে-পথ দিয়েই যখন নাবা হ'চ্ছে তখন আর বিপথে যাবার কি কারণ ঘ'ট্‌তে পারে? কিন্তু সত্যিই তো সে পথ হারা হ'য়ে অন্যদিকে চ'লে গেছে! তখন গোপালদা'র মুখের ভাব দেখে বিশেষ শঙ্কিত হই। এরূপ অবস্থায় কা'র মনে ভীতি-বিহ্বলতার উদ্রেক না হয়? তিনি শুধু বিলাপ ক'রতে লাগ্‌লেন, রন্থম্বর-অভিযানের দুর্গম পথে জামাইকে কেনই বা আনা হ'লো! আর-একটু আঁধার ঘনিয়ে এলেই তো বাঘের মুখে প'ড়বে, এ সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ নেই! আমি তাঁকে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিতে থাকি, কিন্তু তখন কি মন কোনো প্রবোধ মান্‌তে চায়? আমরা 'হিতেন' 'হিতেন' ক'রে চীৎকার করি, কিন্তু শব্দ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

আমাদের সঙ্গী গাইড্‌টিকে হিতেনের সন্ধানে সোয়াই মাধোপুরের পথে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো। তখন আমরা পাহাড়ের তলদেশে মোটরের কাছে প্রায় এসে গেছি। আমরা উভয়েই ধীর-মন্থর গতিতে হেঁটে চ'লেছি। কিছুক্ষণ পরে পেছন ফিরে দেখি গাইড্ হিতেনকে সঙ্গে ক'রে আন্‌ছে। গোপালদাকে সেই কথা বলায় তখনো যেন তাঁর বিশ্বাস হ'তে চায় না। যখন তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় তখন সকলেই আশ্বস্ত হই। হিতেন বলে, সে সোয়াই-মাধোপুরের দিকে চ'ল্‌ছিলো, কিন্তু প্রায় দেড় মাইল এইভাবে অতিক্রম ক'রবার পর তার যেন মনে হয় সে পথহারা হ'য়েছে। তখন সেখান থেকে ফিরে প্রাণপণ শক্তিতে ছুট্‌তে থাকে। খানিকটা পথ আস্‌তেই গাইডের সঙ্গে তার

সাক্ষাৎ হয়। তখন আমাদের এমন অবস্থা যে কোনোপ্রকারে একবার গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌তে পারলেই যেন বাঁচা যায়। পা যেন আর চলে না। বেলা যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে তখন আমরা গিয়ে গাড়ীতে উঠি। পূর্ব্ববর্ণিত পথ বেয়ে গাড়ী চলে! সুতরাং গতি দ্রুত হ'তেই পারে না! যখন সোয়াই-মাধোপুর রেলষ্টেশনে গিয়ে পৌছি তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আঁধার ঘনীভূত হ'য়ে এসেছে। ষ্টেশন-রেস্তোঁরায় ঢুকে আমরা সমস্ত দিনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করি। তারপর গাইড্ দু'জনকে পুরস্কৃত ক'রে গাড়ীতে উঠি। খুব বেগে ছুটে রাত্রি পৌনে-দশটায় জয়পুরে এসে পৌছি।

(১৫)

সংস্কৃত ভাষায় খোদিত প্রস্তর ফলকাদিতে রনস্তম্ভপুরের উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পরে তাই হ'তেই সম্ভবতঃ রনথম্বরের উদ্ভব হ'য়েছে। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ তোমারা রাজবংশের রাজা অনঙ্গপালের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র পৃথ্বীরাজ চৌহান দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আটবৎসর। কিছুকাল পরে তাঁর পিতা রাজা সোমেশ্বরের মৃত্যু হ'লে আজমীরের সিংহাসনেও তিনিই অধিরোহণ করেন। ফলে, পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীরের সম্রাট ব'লে ঘোষিত হন। শৌর্য্যে-বীর্য্যে তিনি ভারত-ইতিহাসে অমর কীর্ত্তি রেখে গেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দু'-দু'বার তাঁকে বৈদেশিক আক্রমণকারী শিহাবুদ্দিন-মহম্মদ ঘুরীর সম্মুখীন হ'তে হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথমবারে শিহাবুদ্দিন কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। দ্বিতীয়বারে পৃথ্বীরাজ নিহত হন এবং দিল্লী ও আজমীর মুসলমানের করতলগত হয়। এই ঘটনার পর এইটেই অনুমান করা স্বাভাবিক যে চৌহান বংশের যে-সকল রাজপুতবীর তখনো জীবিত ছিলেন তাঁদের কেউই আর সিংহাসনে আরোহণ ক'রতে সমর্থ হন নি। তবে কেউ কেউ বলেন, শিহাবুদ্দিন ঘুরী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবার পূর্ব্বে পৃথ্বীরাজের অল্পবয়স্কপুত্র গোবিন্দরাজকে আজমীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ক'রে যান। কিন্তু পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিরাজের নিকট এটা অসহনীয় হ'য়ে ওঠে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুসলমানদের হস্তের ক্রীড়নক হ'য়ে রাজ্য পরিচালনা করেন এটা তিনি সইতে পারলেন না। তাই শিহাবুদ্দিন ঘুরী স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হরিরাজ গোবিন্দরাজকে

রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন ও নিজেকে স্বাধীন নৃপতি ব'লে সর্ব্বত্র প্রচার ক'রে দেন। তখন গোবিন্দরাজ উপায়ান্তর না দেখে রনথম্বরে গিয়ে এক রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু এই রাজ্য তিনি নতুন ক'রে স্থাপন করেন অথবা পূর্ব্ব হ'তেই ঐ রাজ্য সেখানে ছিলো, তা' তিনি অধিকার করেন মাত্র, এ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায় না।

রনথম্বরের এক পর্ব্বত-শিখরে ছয় বর্গমাইলব্যাপী বিরাট দুর্গ! অনুমিত হয়, গোবিন্দরাজের সময় হ'তেই এই দুর্গের অভ্যুদয় হ'য়েছে। কিন্তু রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার নিকট প্রশ্ন ক'রেও জান্‌তে পারি নি, কোন্ সময়ে এবং কা'র দ্বারা ঐ দুর্গটি প্রথম নির্ম্মিত হয়। হরিরাজের কুচক্রের ফলেই গোবিন্দরাজকে আজমীর ছেড়ে রনথম্বরে যেতে হয়। তবে যতোদূর মনে হয়, হরিরাজ মহামতি পৃথ্বীরাজের অযোগ্য ভ্রাতা ছিলেন না। পৃথ্বীরাজের শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যু তাঁর নিকট নিতান্ত অসহনীয় হ'য়ে ওঠে। আজমীরের সিংহাসনে আরোহণ ক'রবার কিছুকাল পরেই হরিরাজ দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে তাঁকে ফিরে আস্‌তে হয়। সেই সময় হ'তে কিছুকাল যাবৎ তিনি নির্ঝঞ্ঝাটে রাজ্য পরিচালনা ক'রে আস্‌ছিলেন। সেই সময়টায় শাসন কার্য্যে ঔদাসীন্য আসে—তিনি বিলাসব্যসনে মগ্ন হন। এতে রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবাক্ এই সুযোগে আজমীর আক্রমণ করেন এবং হরিরাজকে বিতাড়িত ক'রে ঐ রাজ্য অধিকার করেন। রনথম্বরে গোবিন্দরাজের রাজত্বকালে বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র বল্লানদেব সিংহাসনে আরূঢ় হন। বল্লানদেবও বিশেষ কোনো কীর্ত্তি রেখে যান নি। তাঁর দুই পুত্র—প্রহ্লাদদেব ও ভাগবত। তাঁর

মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রহ্লাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র ভাগবত তাঁর মন্ত্রী নিযুক্ত হন। একদিন মৃগয়া ক'রতে গিয়ে একখানি হস্ত ব্যাঘ্রদষ্ট হওয়ায় প্রহ্লাদের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভাগবতকে ডেকে তিনি পুত্র বীরনারায়ণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর বালক বীরনারায়ণ সিংহাসনে বসেন এবং খুল্লতাত ভাগবতের মন্ত্রীত্বে রাজ্য পরিচালনা ক'রতে থাকেন। মাত্র ক'বছর পরে অম্বররাজ-কন্যার সঙ্গে বীরনারায়ণের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। অম্বরের পথে বরপক্ষ দিল্লীর সুলতান সামসুদ্দিন ইল্‌তুত্‌মিস কর্ত্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়। পূর্ব্ব হ'তেই রন্‌থম্বরের প্রতি ইল্‌তুত্‌মিসের শ্যেন দৃষ্টি ছিলো, শুধু সুযোগের অভাবেই আপন অভিলাষ সিদ্ধ হয় নি। কিন্তু এবার সুযোগ পেয়েও তাঁকে পরাজিত হ'য়ে দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে হয়। সুলতান দেখ্‌লেন, শৌর্য্যে-বীর্য্যে রাজপুতদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। তাই তিনি স্থির করেন, কৌশলে কার্য্য-সিদ্ধি ক'রতে হবে। কোনোক্রমে সুলতান বীরনারায়ণকে তাঁর প্রস্তাবিত সর্ত্তে স্বীকৃত করান। এই সময় সুলতানের সম্বন্ধে মন্ত্রী ভাগবত রাজা বীরনারায়ণকে সতর্ক বাণী শোনাতে গিয়ে অপদস্থ ও অপমানিত হন। বীরনারায়ণ ইল্‌তুতমিস কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হ'য়ে দিল্লীতে যান। ভাগবতও মনের দুঃখে রন্‌থম্বর ত্যাগ ক'রে মালবের রাজদরবারে উপস্থিত হন। ইত্যবসরে শোনা যায়, দিল্লীতে পৌছবার অনতিকালপরেই আহার্য্যের সঙ্গে তীব্র হলাহল মিশিয়ে দিয়ে বীরনারায়ণের প্রাণসংহার করা হ'য়েছে। ইল্‌তুত্‌মিস যখন জানতে পারেন, ভাগবত মালবের রাজসভায় আছেন তখন তিনি মালবরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ভাগবতের হত্যার জন্য তথায় ঘাতক প্রেরণ করেন। কিন্তু পূর্ব্বে

এই সকল ব্যাপার বুঝতে পেরে তীক্ষ্নদর্শী ভাগবত মালবরাজকে হত্যা ক'রবার পর একদল সৈন্য সংগ্রহ ক'রে রন্‌থম্বরের দিকে অগ্রসর হন ফিরে এসে তিনি রন্‌থম্বর দুর্গ অধিকার করেন। এ'র অব্যবহিত পরেই সুলতানের কন্যা রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ়া হন। তিনিও দুর্গটি অবরোধ ক'রবার জন্য নতুন সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজপুতদের অসীম সাহস ও পরাক্রম দেখে মুসলমানদের পালিয়ে যেতে হয়।

১২৪৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান নাসিরুদ্দিন সিংহাসনে আরূঢ় হন। ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রন্‌থম্বরের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ দুর্গের বিরুদ্ধে পুনরায় এক অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু এবারেও মুসলমানদের অপদস্থ হ'য়ে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে হয়। দিল্লীর সুলতানের এইরূপ উপর্য্যুপরি পরাভবে প্রমাণিত হয় যে রাজপুতেরা অধিকতর বলবিক্রমশালী ও রণনিপুন ছিলেন এবং রন্‌থম্বর দুর্গ নিতান্তই দুর্ভেদ্য ছিলো। ভাগবত ঐ সময়ে হিন্দুস্থানের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ব'লে পরিগণিত হন। তাঁর শাসনকাল অত্যন্ত গৌরবময় ছিলো। সীমান্তের বিভিন্ন অংশে তিনি সৈন্য সমাবেশ ক'রেছিলেন ব'লে শত্রুরা বিশেষ সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারতো না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জৈতসিং রন্‌থম্বরের সিংহাসনে বসেন। সুলতান নাসিরুদ্দিনের রাজত্বকালের শেষভাগে জৈতসিং রন্‌থম্বরের রাজা হন, আর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বল্‌বনের শাসন-কালে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ রায় বাহাদুর ওঝাজী মহারাজা হামীরের সময়ের একটি প্রস্তর ফলক প্রাপ্ত হন। এই ফলকটি ১২৮৮ খৃষ্টাব্দের ব'লে জানা যায়। কোটা রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত কোট্রী বল্ভন হ'তে আট মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থানে 'কাওয়াল-জী-কা কুণ্ড' নামে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্যে ঐ প্রস্তর-ফলকটি পাওয়া যায়। এ'তে হিন্দীভাষায় যা' লেখা আছে তা'র মর্ম্মার্থ এই—"জৈতসিং মাণ্ডুর দ্বিতীয় জয়সিংকে পরাভূত করেন, কারাক্রালগিরির কাছোয়া রাজের মস্তক বিচ্যুত করেন এবং মালবের একশত বীরকে বন্দী ক'রে রন্থম্বরে নিয়ে যান।"

জৈত সিংয়ের অনুপমা রূপবতী ও অশেষ গুণবতী মহিষী হীরাদেবীর গর্ভে রাজপুত-কেশরী হামীরের জন্ম হয়। পরে সুরত্রান ও বিরাম নামে আরো দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা উভয়েই বড় বীর। জৈতসিং নিজে একজন সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি রাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি হামীরকে সিংহাসনে বসিয়ে ১২৮২ খৃষ্টাব্দে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। হামীর হিন্দুস্থানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু নরপতি ব'লে দূরদিগন্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। হামীরের রণথম্বর শাসনকালে গিয়াসউদ্দিন ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুলতান বল্বনের পরে কাইকোবাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ১২৯০ খৃষ্টাব্দে জালাল্উদ্দিন খাল্জী তাঁকে হত্যা ক'রে সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও মনস্থ করেন, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই রন্থম্বর দুর্গ জয় ক'রতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই এক বিরাট অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু রন্থম্বরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অবলোকন ক'রে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে যান। সুতরাং সেবারের মতো কোনোপ্রকার আক্রমণ না চালিয়ে তিনি দিল্লীতে ফিরে যান। কিছুকাল পরে আরো সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ ক'রে সুলতান পুনরায় রন্থম্বর আক্রমণ ক'রবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন বুঝলেন, শুধু সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ক'রলেই ঐ দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করা সম্ভবপর নয় তখন তিনি ঐ মতলব জন্মের মতো

ত্যাগ ক'রে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কয়েক বৎসর পরে সুলতান জালাল্উদ্দিন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হন। আলাউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

আলফ্ খাঁ ও নসরৎ খাঁ নামে দুই উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের অধিনায়কত্বে আলাউদ্দিন গুজরাটের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁরা সহজেই এই প্রদেশটি অধিকার ক'রতে সমর্থ হন এবং গুজরাটের রাজা দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। তখন লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে সুলতানের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়। ঐ বিদ্রোহীদের মধ্যে মীর মহম্মদ শাহ নামে এক মোগল ছিলেন। বিদ্রোহকালে সেনাপতির ভ্রাতা ঐ মোগল বিদ্রোহীর হস্তে নিহত হন। বহুকষ্টে ঐ বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকেরই প্রাণ হারাতে হয়। তখন নিরুপায় হ'য়ে বিদ্রোহী মীর মহম্মদ শাহ্ তাঁর কয়েকজন অনুচর নিয়ে রাজা হামীরের শরণাপন্ন হন। মহামতি হামীর তাঁদের আশ্রয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। আলফ্ খাঁ ঐ দুর্গাধিপতির শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পূর্ব্বেই পেয়েছিলেন। তাই তাদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রতে আর তিনি সাহস করেন না। ঐ দুঃসংবাদসহ তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আলাউদ্দিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ভারতের এই অভেদ্য দুর্গ করতল-গত ক'রতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি দুর্গটি আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ ক'রছিলেন। এমন সময়ে জান্তে পারেন, রাজা হামীর তাঁর কোটিযজ্ঞের পর মৌনব্রত অবলম্বন ক'রেছেন। এই ঘটনা ঘটে ১২১৯ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে এক বিরাট সৈন্যদলসহ আলফ্ খাঁ ও নসরৎ খাঁ রন্থম্বর আক্রমণে প্রেরিত হন। তখন পর্য্যন্ত রাজা হামীরের মৌনব্রত চ'লছিলো ব'লে তিনি নিজে শত্রুর সম্মুখীন হ'তে পারেন না। শত্রুরা বানাস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত এসে পৌছেচে এই সংবাদ তিনি পান।

ধরমসিং ও ভীমসিং নামে উপযুক্ত সেনাপতিদ্বয়কে আহ্বান ক'রে তিনি আদেশ দেন, বানাস-তীর হ'তে মুসলমানদের বিতাড়িত ক'রতে হবে। রাজপুতেরা অনায়াসেই শত্রুকে পরাভূত ক'রতে সমর্থ হন। বিজয়গর্ব্বে উল্লসিত রাজপুত বীরগণ তখন রন্থম্বরের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন, কিন্তু আলফ্‌খাঁ যে তাঁর সৈন্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হ'য়ে রাজপুতদের অনুসরণ ক'রতে আদেশ দিয়েছেন সে সম্বন্ধে রাজপুতেরা কিছুমাত্র জানতে পারেন নি। রাজপুতেরা বরং জানতেন শত্রুরা পরাজিত হ'য়ে পলায়ন ক'রেছে। সুতরাং তাঁরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে অগ্রসর হ'চ্ছিলেন। সৈন্যদলের এক বিরাট অংশ ধরমসিংয়ের নেতৃত্বে দুর্গাভিমুখে দ্রুত ছুটছিলো। ভীমসিং অতি অল্পসংখ্যক রাজপুত সৈন্য নিয়ে হিন্দাবত গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করেন। ঠিক সেই সময়ে মুসলমানেরা চারিদিক থেকে অতর্কিত-ভাবে আক্রমণ চালায়। রাজপুত-সেনাপতি অধিকক্ষণ তাদের প্রতিরোধ ক'রতে সমর্থ হন না। ফলে, শত্রুর হস্তে অনুচরবর্গসহ ভীমসিংকে প্রাণ দিতে হয়। মুসলমানেরা ঐ কার্য্য ক'রেই দিল্লীর দিকে পলায়ন করে।

এই সংবাদ অবগত হ'য়ে মহারাজা হামীর মর্ম্মাহত হন। ধরমসিংয়ের অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। শুধু ভর্ৎসনা ক'রেই ক্ষান্ত হন না, চক্ষু উৎপাটন ক'রে তাঁকে অন্ধ ক'রে তবে ছাড়েন। ভোজদেব নামে তাঁর পিতার দাসীর গর্ভজাত এক পুত্রকে হামীর ধরমসিংয়ের স্থলে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ধরমসিং তখন থেকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাধারাণী নামে এক নর্ত্তকীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই নর্ত্তকীর ষড়যন্ত্রের ফলে সব দিকে একটা দ্রুত

পরিবর্ত্তনের ভাব দেখা যায়। ধরমসিং আবার রাজার বিশ্বাসভাজন হন এবং শীগ্‌গীরই মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ভোজদেবকে মন্ত্রীর অধীনে কোতোয়ালপদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চ'লতে থাকে। ফলে, ভোজদেব কর্ম্মচ্যুত হন এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শুধু তাই নয়, শেষটায় তাঁকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ক'রে রন্থম্বর থেকে বিতাড়িত করা হয়। ভোজদেব গত্যন্তর না দেখে তাঁর ভ্রাতা পিতামাকে নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ভ্রাতৃদ্বয়কে আলাউদ্দিন সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁরা বড়ো একটা জায়গীর পান। ঐ জায়গীরে পিতামা বাস ক'রতে থাকেন এবং ভোজদেব দিল্লী-রাজদরবারে সদস্য নিযুক্ত হন। ভোজদেবের সহায়তায় সুলতান আলাউদ্দিন রন্থম্বরের আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্যক্ অবগত হন। উৎপন্ন শস্যাদি ভাণ্ডারে সঞ্চিত ক'রবার পূর্ব্বেই গ্রাস ক'রতে না পারলে দুর্গজয় যে অসম্ভব বিশাসঘাতক ভোজদেবের কাছ থেকে সুলতান এই তথ্য সংগ্রহ করেন।

আলফ্‌খাঁকে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ তৃতীয়বার রন্থম্বরের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়। তারা হিন্দাবত গিরিসঙ্কটে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে রাজপুতেরা তাদের বিপদসঙ্কুল অবস্থার কথা জানতে পারে সেই মুহূর্ত্তেই তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাদলে বিভক্ত হ'য়ে যায়, যা'তে ক'রে চারিদিক থেকে একই সময়ে আক্রমণ চালাতে পারে। ফলে, অসাধারণ সাফল্য দেখা দেয়। সুলতানের সৈন্যেরা রাজপুতদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে না পেরে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। হামীর এক বিজয়োৎসবের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে যোগ্য ব্যক্তিগণকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করা হয়। এই সময় মীর-মহম্মদ শাহ্‌ মহারাজা হামীরের নিকট প্রস্তাব করেন, বিশ্বাসঘাতক

ভোজদেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। এই প্রস্তাবে মহারাজা সম্মতি দেন। তখন তিনি তাঁর মোগল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভোজদেবের জায়গীরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। জায়গীর অধিকৃত হয় এবং পিতামাকে বন্দী ক'রে রনথম্বরে আনা হয়। এই সকল ব্যাপারে আলাউদ্দিন হৃদয়ে দারুণ আঘাত পান। সুলতান এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে চৌহানবংশকে, যে-কোনো প্রকারে হোক, একেবারে নির্ম্মূলিত ক'রতে হবে। এই প্রতিজ্ঞাপূরণমানসে তিনি এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন। এই সুবিশাল সৈন্যবাহিনী নসরৎ খাঁয়ের অধিনায়কত্বে পাঠানো হয়। আলফ খাঁ তাঁর সহকারী হ'য়ে যান।

এইরূপে তাঁরা পুনরায় হিন্দাবত গিরিসঙ্কটে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু কোনোপ্রকার আক্রমণ না চালিয়ে নসরৎ খাঁ আলফ খাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এবার এক কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি মহারাজা হামীরের রাজদরবারে এক হিন্দু দূতকে শান্তির বার্ত্তাবাহকরূপে পাঠান। কিন্তু তা'তে কতোকগুলি হীন সর্ত্ত থাকে। হামীর দূতের নিকট হ'তে সকল সংবাদই অবগত হন, কিন্তু সুলতানের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন না ক'রে তাকে ছেড়ে দেন। দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত চ'ল্‌তে থাকে। ইত্যবসরে সুলতানের সৈন্যেরা অগ্রসর হ'য়ে আসে এবং রনথম্বর দুর্গের অতি নিকটে এসে উপস্থিত হয়। এই সময় সুলতানের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নসরৎ খাঁ মীর মহম্মদ শাহের এক শরাঘাতে প্রাণ হারান। তখন মুসলমান সৈন্যদলে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হামীর এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ক'রে সসৈন্যে দুর্গ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে মুসলমানদের ভীষণভাবে আক্রমণ করেন। সেই প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ ওরা সহ্য ক'রতে পারে না। অগণিত মুসলমান সৈন্য হতাহত হয়।

দিল্লীতে এই দুঃসংবাদ পৌছিলে আলাউদ্দিন স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি কালবিলম্ব না ক'রে দুর্গ অবরোধ করেন। রাজপুতেরা দুর্গের ওপর হ'তে অনবরত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ ক'রতে থাকে। ফলে, সুলতানের বহু সৈন্য-ধ্বংস হয়। উপায়ান্তর না দেখে শেষকালে আলাউদ্দিন সন্ধির সর্ত্ত দিয়ে পাঠান। হামীর সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন না আলাউদ্দিন দেখ্‌লেন, বলপ্রয়োগে তাঁর উদ্দেশ্য কখনো সাধিত হবে না। সুতরাং তাঁর চেষ্টা রইলো রনথম্বরে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করা। কোনোক্রমে তিনি হামীরের রতিপাল ও রণমল্ল নামে রাজপুত বীরদ্বয়কে বশীভূত ক'রে আপন দলে টেনে আন্‌তে সমর্থ হন। রনথম্বর-দুর্গপ্রাকারের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যেন বিশ্বাসঘাতকতার কৃষ্ণঘণ ছায়া!

এই সকল ঘটনার পরে যখন হামীর জান্‌তে পারেন যে শস্যভাণ্ডারের শস্যও নিঃশেষিত হ'য়ে এসেছে তখন শেষ আশাটুকুও নির্ম্মূলিত হ'য়ে যায়। সেই সময়ে হামীর সত্যিই হতাশ হ'য়ে পড়েন। তিনি অন্তঃপুরচারিণীদিগকে জৌহরব্রত উদ্‌যাপন ক'রতে আদেশ দেন। এই আদেশ যথাযথরূপে পালিত হ'লে হামীর তাঁর কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরবর্গসহ উন্মুক্ত তরবারিহস্তে দুর্গ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হন। তাঁরা প্রচণ্ড ঝটিকা-প্রবাহের ন্যায় এসে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুধ্বংস ক'রতে ক'রতে তাঁরা ধাবিত হন। কিন্তু মুষ্টিমেয় রাজপুতবীর অগণিত মুসলমানের সহিত আর কতোক্ষণ যুঝ্‌বেন? তবে তাঁরা তো প্রাণ দিতেই এসেছেন! একে একে সকল রাজপুতবীর রণশয্যায় শায়িত হন! সর্ব্বশেষে রাজপুতকুলতিলক, বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজ চৌহানের যোগ্যতম শেষ বংশধর রাজা হামীর নিজেকে বলি দেন। সুলতানের চাতুর্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু এই মৃত্যুর একটা বৈশিষ্ট্য

এই যে, শত্রুর হস্তে তাঁর মৃত্যু হয় নি। বীর হামীর নিজহস্তেই আপন মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেন। এইরূপে ১৩০১খৃষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্গ মুসলমানের করতলগত হয়। এই ঘটনার পরে অবশ্য রন্‌থম্বর আরো বহুবার হস্তান্তরিত হয়। শেষটায় মোগল শাসনকালের প্রারম্ভে রন্‌থম্বর সম্রাট হুমায়ুনের হস্তে এসে পড়ে। তারপর ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে মালবের অধীনে আসে। মোগল-রাজত্বের শেষভাগে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গ জয়পুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তদবধি জয়পুরেরই অধীন আছে।

(১৫)

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জয়পুর হ'তে এলাহাবাদে যাই। মাত্র দু'তিন দিনের জন্য আমার বন্ধু শৈলেন মুখুজ্জের বাড়ীতে থাকি। তারপর বি-এন-ডাব্‌লিউ রেল-কোম্পানীর ট্রেনে ক'রে বারাণসী ধামে যাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখানে গিয়ে পৌছি। আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান! ভারতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে যে চিত্রটি কল্পনায় এঁকেছিলাম সেখানে গিয়ে বাস্তবে তার সাথে কোনোই সাদৃশ্য খুঁজে পাইনে! কেন, সে কথা পরে ব'ল্‌ছি। ষ্টেশন থেকে বরাবর 'বীরেশ্বর পাঁড়ে' ধর্ম্মশালায় এসে উপস্থিত হই। ত্রিরাত্র বাস ক'রবার যথাযোগ্য স্থান বটে! এক-একটা কামরা এক-একজন ভদ্রলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট র'য়েছে। দৈনিক ভাড়া হিসেবে অতি সামান্যই আগন্তুকদের নিকট হ'তে কর্ত্তৃপক্ষ নিয়ে থাকেন। দ্বিতলবাটী! নীচের কাম্‌রা দৈনিক চার আনা আর ওপরের কাম্‌রা আটআনা হিসেবে ভাড়া যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। নীচের একটা কাম্‌রা ভাড়া ক'রে তা'তে তালা দিয়ে আমি তখনি বিশ্বনাথ-দর্শনে বেরিয়ে যাই। কোথায় বিশ্বনাথের মন্দির তা' জানিনে, অথচ এবিষয়ে কারো সাহায্য গ্রহণ ক'রবো না মনে মনে এটাও সিদ্ধান্ত ক'রে রেখেছি। আমাকে নতুন আগন্তুক মনে ক'রে অনেকেই পেছন নেয়। উদ্দেশ্য, যদি কিছু বাগিয়ে নেয়া যায়। কাশীর লোকের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেকে আমাকে সতর্ক ক'রে দেয়। আমিও তাই কাকেও কিছু না ব'লে যে দিকে জনস্রোত চ'লেছে, সেই দিকেই অগ্রসর হ'তে থাকি। এমনই ভান করি যেন কাশী আমার

কাছে আদৌ অপরিচিত স্থান নয়। ধর্ম্মশালা হ'তে অনেকটা পথ হেঁটে জনস্রোতের সাথে-সাথে এক সঙ্কীর্ণ গলির সম্মুখে এসে পৌঁছি। দেখি অসংখ্য নরনারী পিপীলিকাশ্রেণীবৎ আনাগোনা ক'রছে। সংখ্যায় নারীই অধিক। কারো-কারো মুখে 'জয় বিশ্বনাথ' রব শোনা যাচ্ছে! কতোরকমের লোক, কতোরকমের বেশ-বিন্যাশ, কতো-সাজসজ্জা চোখে পড়ে! ঐ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গলির মুখে ও দু'ধারে বিপণি-শ্রেণী কর্ম্মব্যস্ত—মুহূর্ত্ত মাত্র অবসর কারো নেই! হৈ-রৈ লেগেই আছে!

এই সব দেখে-শুনে আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে ঐটেই বিশ্বনাথের গলি। ঠেলে ঠুলে কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে ঐ ভিড়ের সাথে-সাথে বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হই। দেখি, একটি স্থানকে অগণিত নরনারী বেষ্টন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আর তারই মাঝখান থেকে কারো-কারো অশুদ্ধ-উচ্চারিত মন্ত্রের শব্দ কানে আস্‌ছে। বুঝলাম ঐ স্থানটিতেই দেবাদিদেব বিশ্বনাথ অধিষ্ঠিত র'য়েছেন। এখন সমস্যা এই, কি ক'রে দেব-দর্শন পাওয়া যায়! ভিড় একটু ক'মে গেলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে মনে হ'লো, কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার ভিড় জমে' উঠ্‌লো। উপায়ান্তর না দেখে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি। তখন দেখি কালো পাথরের একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ জলের মধ্যে মাথা জাগিয়ে র'য়েছেন। কিন্তু কই কোনোই ভাবান্তর উপলব্ধি তো হয় না! কিছুক্ষণ পরে ধর্ম্মশালায় ফিরে আসি। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। ধর্ম্মশালায় আহারাদির কোনোই বন্দোবস্ত নেই। তৎসংলগ্ন এক বহিঃপ্রকোষ্ঠে এক বাঙালী ভদ্রলোক একটি হোটেল খুলে ব'সে আছেন। ধর্ম্মশালায় এসে যাঁরা আশ্রয় নেন তাঁদের অধিকাংশই ঐ হোটেলের অন্নে উদরপূর্ত্তি ক'রে থাকেন। তবে যাঁরা সপরিবারে আসেন তাঁরা হয়তো নিজেরাই রান্নাবান্না ক'রে আহারের বন্দোবস্ত করেন। আমাকে

হোটেলেরই শরণাপন্ন হ'তে হয়। আহার্য্যদ্রব্যাদি অতি কদর্য্য হ'লেও আমার ব'ল্‌বার কিছুই ছিলো না। তবু এই ব'লে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি যে, আমাকে 'কাশীর পাণ্ডা'র হাতে প'ড়ে নাস্তানাবুদ হ'তে হয় নি।

পূর্ব্বে যখন স্বনামধন্য মনোমোহন পাঁড়ে ও মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় মহাপ্রাণ বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত এই রকমের কোনো ধর্ম্মশালা কাশীধামে গ'ড়ে ওঠেনি তখন নিতান্ত বাধ্য হ'য়েই বাঙালী তীর্থ-যাত্রীদের ঐ সকল পাণ্ডা-গুণ্ডাদের খপ্পরে প'ড়ে বহু প্রকারে নির্য্যাতিত হ'তে হ'তো। অনেক সময় ধনপ্রাণ সবই হারাতে হ'তো। এখন অবশ্য সে সমস্যার অনেকটা সমাধান হ'য়েছে······যাহোক, আহারাদি শেষ ক'রে আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করি। আমার সঙ্গে দু'খানি পত্র ছিলো—একখানি রাজরাজেশ্বরী সত্রের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে, অপরখানি কুইন্‌স্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের নামে। প্রথম পত্রখানি যাঁর নামে ছিলো তিনি আমার জনৈক আত্মীয়ের মন্ত্রশিষ্য। প্রথমেই তাঁর নিকট যাই। পত্রখানি পেয়ে তিনি আমাকে ধর্ম্মশালা থেকে তাঁর নিজগৃহে উঠে আস্‌তে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান। যে-কয়দিন কাশীতে আমার অবস্থিতি হবে সে-কয়দিন তাঁর আলয়েই থাকি এইটে তাঁর ইচ্ছে! অনুরোধ উপেক্ষা না ক'রে আমি তাঁর কথামতোই কাজ করি—তাঁর বাসাবাটীতে উঠে আসি। চারদিন আমি ঐ ভদ্রলোকের আলয়ে অবস্থান করি। কেমন ছিলাম, কিরূপ অবস্থায় ছিলাম, কিভাবে সময় কাটাতে হ'য়েছিলো, এসম্বন্ধে সামান্য বিবরণ না দিলে আমার কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই এখানে সামান্য কিছু লিপিবদ্ধ ক'রতে হ'চ্ছে।

যে-বাড়ীতে সত্রাধ্যক্ষ বাস করেন সেই বাড়ীর তেতলার একটি ক্ষুদ্র

প্রকোষ্ঠে আমার অস্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এই প্রকোষ্ঠটি যে কতোকাল ধ'রে অব্যবহার্য্য অবস্থায় প'ড়ে ছিলো তা' অনুমান-শক্তির সবখানি উজাড় ক'রে দিলেও প্রকৃতভাবে কেউ নিরূপণ ক'রতে পারতেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিলো। আমি শুধু এই কথাই বল্‌তে পারি, তাঁর ভৃত্য যখন প্রকোষ্ঠটির ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলে তখন দেখা যায়, পুরোপুরি এক ঝুড়ি বা'র হ'য়েছে। অবশিষ্ট যেটুকু ছিলো তা'র আর উদ্ধার হয় না। আমিও বলি, থেকে যায় থাক্! পুণ্যতীর্থে আসা গেছে, তীর্থরেণু না হয় অঙ্গে একটু মাখাই যাক্। তা'র ওপরেই আমার শয্যা বিছিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং আমার শয্যাটি কি অনুপম রূপ পরিগ্রহ করে তা' বোধ করি বিশদ ক'রে না ব'ল্‌লেও চলে। আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট এই প্রকোষ্ঠটির পাশেই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অপর এক প্রকোষ্ঠ ছিলো। সেই প্রকোষ্ঠে বেদান্তের এক ছাত্র থাকৃতো। ছাত্রটি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার অনুগত হ'য়ে পড়ে।

আহারের বন্দোবস্ত হ'লো সত্রে। সত্র বস্তুটি কি তা' আমার সম্পূর্ণ অবিদিত ছিলো। এবার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ওটার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রতে সমর্থ হই। বহুকাল পূর্ব্বে পাবনা জিলার শিতলাইয়ের জমিদার বাবুরা কাশীতে রাজরাজেশ্বরী দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁর নিত্যপূজার ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করেন। ঐ সঙ্গে এই ব্যবস্থাও করেন যে, বেলা দশটার মধ্যে যতো আগন্তুক আহারের জন্য তথায় উপস্থিত হবে তা'দের সকলকেই মায়ের ভোগ বণ্টন ক'রে দিতে হবে। উদ্দেশ্য, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত কেউ যেন অনাহারে ফিরে না যায়। অন্ন-ব্যঞ্জন, পায়স-পিষ্টকাদি কোনো কিছুরই আয়োজনের ত্রুটি নেই, অথচ বর্ত্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় যেন সবই অন্তঃসারশূন্য!

মায়ের ভোগে যে-সকল দ্রব্য পূর্ব্ব হ'তেই কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন, তৎসমুদয়ের সংখ্যার ব্যতিক্রম আজ পর্য্যন্ত একটুও হয় নি, কিন্তু গুণের ব্যতিক্রম যথেষ্টই ঘ'টেছে অর্থাৎ চল্‌তি কথায় যাকে বলে Quantity আছে Quality নেই। যে কোনোপ্রকার আহার্য্যই হোক না কেন, জগন্মাতার তাতে কিছুই এসে যায় না, কেন না তিনি সর্ব্বভুক্! কিন্তু তাই ব'লে তাঁ'র সন্তানদেরও যে সবরকমের আহার্য্যেই রুচি থাকৃবে এ'র কোনো অর্থ নেই!

অবশ্য একথা অস্বীকার ক'রবার কোনো উপায় নেই যে, ক্ষুধার তাড়নায় রুচি-অরুচির ভেদাভেদ থাকে না। যারা আহারের জন্য সত্রে এসে উপস্থিত হয় তা'দের খাদ্যাখাদ্যের বিচার-বোধ থাকৃতে পারে না, কারণ তখন তারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর! তারা সাম্‌নে যা' পায় তাইই গোগ্রাসে ভক্ষণ করে, রুচি-অরুচির ধার ধারে না। যাঁরা সত্রাধ্যক্ষের গৃহে আগন্তুক তাঁদেরও আহারের ব্যবস্থা হয় এই সত্রে! এঁদের অবশ্য এই প্রকার আহারে অরুচি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমারো তাই হয়। আমি অরুচি ভাঙ্‌তাম কোনো রেস্তোরায় বা খাবারের দোকানে গিয়ে। যেদিন সত্রাধ্যক্ষের আলয়ে আশ্রয়লাভ ঘটে, তার পরদিনই সেই বেদান্তের ছাত্রটি আমাকে কাশীর দেবদেবী-দর্শনে নিয়ে যায়। পুণ্যাপুণ্য বুঝিনে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিনে, শুধু মানসিক শান্তিলাভের জন্যই আমার এই দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরি! যদিও জানি প্রকৃত শান্তি অন্তরের জিনিষ—বাইরের নয়, তথাপি বহির্দৃশ্যের একটা প্রতিক্রিয়া যে মনের ওপর হয় এটা অবিসম্বাদী সত্য।......সর্ব্বপ্রথম আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে যাই। তখন তেমন ভিড় ছিলো না। ছাত্রটি আমাকে জলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বিশ্বনাথকে স্পর্শ ক'রতে বলে। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাই করি।

এই নাকি বিশ্বনাথ-দর্শনের চিরন্তন শাশ্বত পদ্ধতি! শুধু চোখের দেখায় নাকি পুণ্য সঞ্চয় হয় না!

বিশ্বনাথের মন্দিরের পাশেই অন্নপূর্ণার মন্দির। অন্নপূর্ণা দর্শনের পর কাশীর প্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। এই দুর্গাবাড়ী নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত। দুর্গাবাড়ী হ'তে বেরিয়ে হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে যাই। বেদান্তের ছাত্রটি সেখান থেকে আরো বহুস্থানে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেব-দেবী দর্শন করায়। এই সব দর্শনে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করি। কিন্তু একটি দৃশ্যে যে মন বিচলিত হয় একথা অস্বীকার ক'রতে পারি নে। সেটি হ'চ্ছে মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের কুকীর্ত্তি! কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস ক'রে তার ওপর তিনি মস্‌জিদ্ খাড়া করেন। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্ এখনো সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। পরধর্ম্মবিদ্বেষের একটা জলন্ত নিদর্শন!

রাত্রি আটটায় আমরা বাসায় ফিরি। পরদিন মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথের সন্দর্শনে চলি। জয়পুর থেকে আস্‌বার প্রাক্কালে গোপালদা ওঁর বরাবর একখানা পত্র আমার হাতে দেন। গোপীনাথ পাঠ্যাবস্থায় জয়পুর কলেজের তদানীন্তন ভাইস-প্রিন্সিপাল পরলোকগত মেঘনাথবাবুর (গোপালদা'র পিতা) বাসায় থাকতেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। অধ্যয়নশেষে উত্তরকালে কাশীর কুইন্‌স্ কলেজে অধ্যক্ষের পদ ইনি অলঙ্কৃত করেন। সংস্কৃত ভাষায় ও দর্শনশাস্ত্রে এঁর প্রগাঢ় জ্ঞান। পূর্ব্ব থেকেই ইনি লোকচক্ষুর অন্তরালে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলনে যত্নবান হন।...অনেক খোঁজা-খুঁজির পর গোপীনাথ কবিরাজের বাড়ীর সন্ধান পাই। তাঁর বাড়ীখানি একটা আশ্রমের মতো। বারাণসীধামের যে অঞ্চলে তাঁর বাড়ী সে

অঞ্চলে লোকের বসতি খুবই কম। ঐ পাড়াটায় সোরগোল নেই ব'ল্‌লেই হয়। সকালে গিয়ে শুনি তিনি পূজোর ঘরে—উঠ্‌তে উঠ্‌তে বেলা এক-টা বেজে যাবে। অগত্যা সেদিনকার মতো ফিরে আসি। পরদিন বেলা তিনটেয় যাই। যে-ঘরটিতে তিনি বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন সে-ঘরটি দোতলায়। যেমন কোনো আশ্রমের শিষ্য-ভক্তেরা নীচে জুতো খুলে রেখে নিঃশব্দে আচার্য্যদেবের ঘরে গিয়ে বসে মহামহোপাধ্যায় গৃহী হ'লেও তাঁর সেই ঘরটিতেও তেমনি দর্শনাভিলাষীরা নীচে জুতো রেখে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপপ্রসঙ্গাদি করে। আমি গিয়ে দেখি, কয়েক ব্যক্তি আগে থেকেই ব'সে আছেন, কিন্তু কারো মুখে কথাটি নেই! সকলেই যেন কিসের জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'সে আছেন! সন্ন্যাসী নয়, সংসারত্যাগী নয়, একজন গৃহীমাত্র! অথচ তাঁরই গৃহে আগন্তুকেরা তাঁরই আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে র'য়েছেন দেখে খুবই কৌতূহল হ'লো!

একটু পরেই লম্বা, পাত্‌লা, ছিপ্‌ছিপে, শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক সেই ঘরটিতে প্রবেশ ক'রতেই উপস্থিত সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। বুঝতে বাকী রইলো না যে ইনিই মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ। তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে তিনি ব'স্‌লেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বাক্! গোপীনাথের দৃষ্টি ভাসা-ভাসা! কারো দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ নয়! দর্শনার্থীদের মধ্যে আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রুযুক্ত গেরুয়া-ধারী এক ব্যক্তি ছিলেন। পরিচয়ে জানি, তিনি পূর্ব্বে ডাক্তারী ক'রতেন; বর্ত্তমানে নাকি বিন্ধ্যাচলের কোন্ আশ্রমে থেকে ভজন-সাধনে রত। সর্ব্বপ্রথম তাঁর সাথে গোপীনাথের কথাবার্ত্তা হয়। কথাবার্ত্তা আর কিছুই নয়, শুধু দার্শনিক তত্ত্বালোচনা! কিয়ৎকাল পরে দুই হিন্দুস্থানী সংস্কৃতের অধ্যাপক তথায় এসে উপস্থিত! একখানি মোটা সংস্কৃত বই

তাঁরা মহামহোপাধ্যায়কে উপহার দিয়ে অনুরোধ জানান তিনি যেন বইখানা সম্বন্ধে একটা সুচিন্তিত মন্তব্য লিখে পাঠান! আমি যে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি তাঁরই ঘরে তাঁরই সাম্‌নে অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে আছি সেদিকে যেন কোনো লক্ষ্যই নেই। আমি এজন্য একটু অস্বস্তিই বোধ ক'রছিলাম!

গেরুয়াধারী সাধুটি যখন তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আমি তাঁরই কাছে এসেছি তখন তাঁর হুঁস্ হয়! তিনি জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, কোত্থেকে আমি আস্‌ছি। তখন তাঁর নামে-লেখা চিঠিখানা তাঁর হাতে দিই। চিঠিখানা প'ড়ে তিনি 'গোপাল', 'ব্রজ', 'মঞ্জু', 'যুগল' প্রভৃতির খোঁজখবর নিতে লাগ্‌লেন। যতোটুকু আমার ব'ল্‌বার ছিলো তাঁকে ব'ল্‌লাম। কিন্তু আমি এসে কোথায় উঠেছি, কি ক'রছি ইত্যাদি কোনো প্রশ্নই আমাকে ক'রলেন না। উঠ্‌বার সময় নমস্কার ক'রলাম, প্রতিনমস্কারও ক'রলেন না। এতে মনে মনে একটু বিরক্তই হ'লাম। কিন্তু পরে জান্‌তে পারি যে বর্ত্তমানে ঐ রকম অবস্থায়ই উনি এসে পৌঁছেচেন অর্থাৎ মন সর্ব্বদার জন্য অন্তর্মুখী থাক্‌বার দরুণ বাইরের ব্যবহারে ঐরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রায়ই ঘ'ট্‌তে দেখা যাচ্ছে! আমি তাঁর গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে আবার বাঙ্গালীটোলার দিকে ফিরে যাই। সত্রাধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট বিদায় নিয়ে ঐ দিনই এলাহাবাদে রওনা হই।

(১৭)

এবার গিয়ে উঠি আমার আত্মীয় ও বাল্যবন্ধু প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্যের বাসায়। গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের পাশে বাইকাবাগে তার বাসা। উদ্দেশ্য ছিলো, দু'চার দিন ওখানে থেকে আবার জয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবো। যেদিন এলাহাবাদ গিয়ে পৌঁছি তার পরদিন আমার পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু সেণ্ট্রাল বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভার্গবের সাথে দেখা হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ক্লাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট একখানি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের নোট-বই লিখ্‌তে তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার পর আমি ঐ কার্য্যে ব্রতী হই। সুতরাং জয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন-ব্যাপারটা তখনকার মতো স্থগিত রাখ্‌তে হয়। ঐ সূত্রে চার মাস আমাকে ওখানেই থাক্‌তে হয়। শুধু আত্মীয়তার অজুহাতে প্রফুল্লের বাসায় অতো দিন থাকা আমার পক্ষে হয়তো অসম্ভবই হ'তো, কিন্তু বাল্যবন্ধু হিসেবে তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে পারি নি। চারটে মাস কি আনন্দেই না কেটেছিলো! একটা দিনের জন্যও প্রফুল্লের ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ধরা পড়ে নি। সে কাজ করে মিলিটারী একাউণ্টস্ অফিসে। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় ঐ অফিসেরই এক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। তিনি প্রবাসী বাঙালী মহলে একজন সাহিত্যিক ব'লে পরিচিত। আমি একটু-আধটু সাহিত্যানুশীলন করি জান্‌তে পেরে অবনীবাবু একদিন প্রফুল্লের বাসায় এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়েই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে যান। সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যিক-প্রীতি—দু'টোই তাঁর মধ্যে ছিলো।

একদিন এসে অবনীবাবু আমাকে অনুরোধ করেন 'প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সভায়' কোনো একটা প্রবন্ধ আমাকে পাঠ ক'রতে হবে। আমার হাতে জরুরী কাজ আছে এই অছিলা ক'রেও নিস্তার পাইনে। প্রতি মাসে ঐ সভার একটি ক'রে অধিবেশন হবার কথা! কিন্তু এমনো হ'য়েছে যে কোনো মাসে হয়তো সভার অধিবেশনই হ'লো না! ওখানে আমার চার মাস অবস্থিতির মধ্যে তিনটে অধিবেশন হয়। দু'টোতে আমাকে প্রবন্ধ প'ড়তে হয়। আমার প্রবন্ধাদি সাধারণতঃ ঐতিহাসিক ব্যাপার নিয়ে লেখা। যে-দু'ইটি প্রবন্ধ 'প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সভা'য় পাঠ করি সে দু'টোই নাকি শ্রোতাদের খুব ভালো লাগে। যদিও আমার নিজের কাছে প্রবন্ধ দু'টোর কোনোপ্রকার বৈশিষ্ট্য ছিল ব'লেই মনে হয় নি তথাপি সুধীবৃন্দের প্রশংসাব্যঞ্জক মন্তব্য বড়োই শ্রুতিসুখকর হয়। যাহোক, অত্যল্পদিনেই আমি তথাকার প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সুপরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করি। অবশ্য সাহিত্যসেবী অবনীবাবুর চেষ্টায়ই এসব হ'য়েছিলো একথা স্বীকার ক'রতেই হবে।

বাইকাবাগ অঞ্চল হ'তে যমুনা খুব বেশী দূরে নয়। একটা মাঠ পাড়ি দিলেই হ'লো! তবে গঙ্গা বা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল অনেকটা দূর। এলাহাবাদ দুর্গের নীচে যমুনার জল কালো, স্বচ্ছ। আগ্রার যমুনা দেখেছি, মথুরা-বৃন্দাবনের যমুনাও দেখেছি! সে যমুনা যেন একেবারেই মরা, কিন্তু এলাহাবাদের যমুনার জীবন্তভাব এখনো একটু আছে! দুর্গের পাশে একটা বড়ো বাঁধানো ঘাট আছে। স্থানটি খুবই জনবিরল। মাঝে মাঝে ঐ দেশীয় দু'একখানা ব্যাপারী নৌকো ঘাটটিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনতিদূরে যমুনা-ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেনের চলাচল স্বদেশের ও মাতৃহারা কন্যার স্মৃতি জাগ্রৎ করে। ঐ স্থানটির শান্তস্নিগ্ধ ভাব আমার স্বভাবতঃ নির্জ্জনতাপ্রিয় মনকে বড়োই

আকৃষ্ট ক'রতো। তাই আমি প্রায়ই ঐ ঘাটটিতে গিয়ে সান্ধ্যবায়ু সেবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য-দর্শনসুখ উপভোগ ক'রবার লোভ সংবরণ ক'রতে পারতাম না। স্থানমাহাত্ম্যে মনের ভাব অনেকটা লঘু হ'য়ে যেতো। তখন জীবনের সুখদুঃখ-বিজড়িত স্মৃতিগুলি এসে হাল্‌কা মনকে একটু-আধটু দুলিয়ে দিয়ে যেতো। বিবাহিত জীবনের মধুর স্মৃতিগুলি পরতঃপর আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত ক'রে দিতো।........

"মাত্র চোদ্দবছর!—তারপর সব শেষ! একমাত্র সন্তান—একটি মেয়ে! যৌবন ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বে গিয়ে পৌছতে না পৌছতেই আমার জীবনের আনন্দোৎস রুদ্ধ হ'য়ে যায়। মেয়েটিকে নিয়ে বিপদে পড়ি! তখন আমাকে ছেড়ে সে এক মুহূর্ত্তও থাকৃতে চাইতো না। কিছু কাল পর্য্যন্ত এই মাতৃহারাকে নিয়ে আমার বড়োই বেগ পোহাতে হয়। ঐ সময় কতোজনের কাছ থেকেই না হৃদয়হীন ব্যবহার পেতে হ'য়েছে! সংসার-হারা হ'য়ে সংসারের স্বরূপ আমার কাছে তখন মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিলো! তবে যতো ঝড়ঝাপটই আমার ওপর দিয়ে ব'য়ে যাক্ না কেন, মঙ্গলময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি! আমাকে তিনি অনেক দেখিয়েছেন, অনেক শিখিয়েছেন! জীবনের এই অভিজ্ঞতার মূল্য যে কতোখানি তা' এক ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে? যৌবনোদ্গমের প্রারম্ভ থেকেই আমি বাইরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তরের সৌন্দর্য্যেরই উপাসক বেশী ছিলাম। আমার উপাসনায় চিরসুন্দর সন্তুষ্ট হ'য়ে আমার অভীপ্সা পূরণও ক'রেছিলেন। তারপর একদিন তাঁরই জিনিষ তিনি ফিরিয়ে নেন, কিন্তু আমাকে রিক্ত করেন না—আমার অন্তর ভরপুর ক'রে রাখেন। Thomas Carew-এর একটি কবিতা আমার খুব ভালো লাগে। প্রায়ই সে কবিতাটি আমি মনে মনে আবৃত্তি ক'রে থাকি। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য'-এর

একটি কবিতা প'ড়ে মনে হয় ওটা যেন Carew-এর কবিতাটিরই অনুবাদ। দেহের বর্ণের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ ছিলো না। রূপজ মোহের মধ্যে ছিলো মুখের কমনীয়তা-প্রীতি। আমি তা' পেয়েছিলাম। সে ছিলো যেন শান্তির মূর্ত্ত প্রতীক। যে তাকে দেখ্‌তো সে-ই ব'ল্‌তো—কি শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানির ভাব!

* * *

মেয়ে আমার মাতৃহারা ব'লে ক্ষণিকের জন্য একটা অনুকম্পা জেগে ওঠায় আমার অনুজ তাকে জয়পুরে নিয়ে যায়। সংসারে আমার একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তুটি বাংলা থেকে হাজার মাইল দূরে চ'লে যাওয়ায় আমার মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মেয়ে সেখানে যাবার পাঁচ মাস পরেই আমিও সেইদিকে ছুটে যাই। মনে মনে স্থির করি উত্তর ভারতে আমার কর্ম্মক্ষেত্র যদি গ'ড়ে তুল্‌তে পারি তবে মেয়েটির কাছে-কাছে থাকা হবে।....আমার ধারণা ছিলো, সুদূর প্রবাসে বাঙালী সংখ্যায় কম ব'লে একের প্রতি অপরের কতোকটা টান আছে। মনে ক'রতাম, বাংলা থেকে যতোই দূরে যাওয়া যাবে ততোই বাঙালীর প্রতি বাঙালীর একটা মমত্ববোধ বা আন্তরিকতার ভাব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌তে দেখা যাবে, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছে তাতে আমার পূর্ব্ব-ধারণা সব আমূল পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছে। 'যেখানে বাঙালী সেখানে দলাদলি'—এই যে একটা প্রবাদ আবহমান কাল থেকে চ'লে আস্‌ছে এ'র মূলে যদি সত্যই না থাকবে তবে ও'র অস্তিত্ব এতাদিনে অবশ্য লুপ্ত হ'য়ে যেতো।

একথা ব'ল্‌লে বোধ হয় অতিরঞ্জন-দোষের অপরাধ স্কন্ধে এসে ভর ক'রবে না যে ভারতের মধ্যে, শুধু ভারত বলি কেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই বাঙালী হিন্দুজাতির মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর, কিন্তু এই উর্ব্বরতার অতিমাত্রাই উক্ত জাতিকে একেবারে মেরুদণ্ডহীন ক'রে

ফেলেছে। যে জাতির বুদ্ধির প্রখরতা যতো বেশী সে জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধও ততো বেশী জেগে ওঠে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান—বাধ্য-বাধকতার বালাই ওদের মধ্যে নেই। Obedience is the bond of rule বাক্যটি ওদের নিকট অপরিজ্ঞাত ব'লেই মনে হয়। পরে যখন দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে গেছি, সে সব স্থানেও বাঙালী সমাজের ঐ একইভাব লক্ষ্য ক'রেছি। তবে ঐ সকল স্থানের বাঙালী সংখ্যায় অত্যধিক হওয়ায় ওরূপ অবস্থার উদ্ভাবনা সম্বন্ধে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শিত হ'তে পারে, কিন্তু যেখানে সংখ্যাই নগন্য সেখানে ও'র স্বপক্ষে কোনো যুক্তির অবতারণা করা যায় না। যেখানে অল্পসংখ্যক বাঙালী, সেখানে Superiority ও Inferiority complex-এর ফলে একটা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হয়।

রাজপুতানার বহু দরিদ্র মাড়োয়ারী আমাদের বাংলাদেশের ধনে ধনী হ'য়ে ক'ল্‌কাতা শহরের বুকের ওপর সুরম্য হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ ক'রে দশজনের একজন ব'লে গণ্যমান্য হ'য়েছেন। তাঁদের মধ্যে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে যে তাঁরা ধনী তাঁদের পূর্ব্ব দারিদ্র্যকে বিস্মৃত হন না। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের অন্যান্য গরীব ভাইদের নিজেদের মতো ধনী ক'রে তোলবার জন্য যথাসাধ্য ক'রে থাকেন। কিন্তু এরই ঠিক বিপরীতটি দেখতে পাওয়া যায় আমাদের বাঙালী সমাজে। যিনি হয়তো এক সময়ে সমপর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন তিনিই কোনো এক শুভ মুহূর্ত্তে লক্ষ্মীর বিশেষ অনুগৃহীত হবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে পূর্ব্বজীবনের স্মৃতিগুলো পর্য্যন্ত মন হ'তে জোর ক'রে মুছে ফেল্‌বার চেষ্টা করেন এবং এমন ভাবেই চ'ল্‌তে থাকেন যেন কোনো কালেই দারিদ্র্যের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয় নি। এককালে একই পংক্তিভুক্ত

যিনি ছিলেন এখন হয়তো তাঁকেই সম্ভবর্দ্ধিষ্ণু বন্ধুর সঙ্গে পূর্ব্বের মতো অকপট ব্যবহার ক'রতে গিয়ে অবমাননা ও লাঞ্ছনার গ্লানি শিরে বহন ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে হ'য়েছে! এই অপগুণটির অধিকার নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে বাঙালী জাতির সঙ্গে অপর কোনো জাতির তুলনাই হয় না! বাংলা হ'তে বহুদূরে যে-সকল বাঙালী প্রবাসজীবন যাপন ক'রছেন তাঁদের মধ্যে ধন-ঐশ্বর্য্যের মাপকাঠি দিয়ে একের প্রতি অপরের অন্তরঙ্গতার অস্তিত্বের বা রক্ষণের যৌক্তিকতা বিচার করা হয় না—এইটেই বিশ্বাস ক'রতে প্রবৃত্তি হয় বা ভালোও লাগে। কিন্তু এটা লক্ষ্য ক'রবার খুবই সুবিধে হ'য়েছে যে দূরপ্রবাসে আর্থিক অবস্থার তুলাদণ্ডেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার বিনিময়ের পরিমাপ নেয়া হ'য়ে থাকে।

ফলকথা, প্রবাসী বাঙালীর জাতীয়তাধ্বংসী এই মনোভাব সম্পূর্ণ অশোভন—শুধু অশোভন কেন, একেবারে অমার্জ্জনীয়। তাই বলি, এ'র যবনিকাপাত ক'রে পটপরিবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হ'য়েছে। বাংলার-বাইরে বহুদূরে সমাজ-সামাজিকতা থাকৃতে পারে না, থাকা সঙ্গতও নয়। বাংলার পল্লীর কূপমণ্ডুকদের মাঝেই কুসংস্কারপূর্ণ, গলিত, পূতিগন্ধময় সমাজকঙ্কাল প'ড়ে থাকা স্বাভাবিক। তারা ঐ আবর্জ্জনার মাঝেই থাকৃতে ভালোবাসে, কিন্তু যারা ভাগ্যচক্রে পল্লীসমাজের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বহুদূরে এসে ছিট্‌কে প'ড়েছে তাদের কাছে জাতির ছোটো-বড়ো, পদমর্য্যাদার ছোটো-বড়ো এসব বালাই থাকৃবে কেন? বাঙালী শুধু বাঙালী—একই জন্মভূমির, একই ভাষার ও একই ভাবের লোক—এই কথাই মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে হবে। সুদূর প্রবাসে সকলকেই একই ভ্রাতৃত্বের গ্রন্থিতে গ্রথিত হ'তে হবে, এইটেই মনে করা বাঞ্ছনীয়। অর্থের দিক দিয়ে, পদমর্য্যাদার

দিক দিয়ে, তুমি বড়ো আছো, আমি তো তা' অস্বীকার ক'রতে চাইনে, আমি তো তোমার ধন-ঐশ্বর্য্যের ঈর্ষাও করিনে, ওতে বরং গৌরবই অনুভব ক'রে থাকি, কিন্তু তোমার ধন আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, সম্মান-প্রতিপত্তি আছে ব'লেই যে তুমি আমার দারিদ্র্যকে অবমানিত ক'রবে, লাঞ্ছিত ক'রবে—এটা কিছুতেই মেনে চলা যেতে পারে না! খাঁটি দরদের অভাবই সকল অনর্থের মূল, এটা কি কেউ অস্বীকার ক'রতে পারেন?

একটা বিষয় লক্ষ্য ক'রে বড়ই ব্যথা পেয়েছি, সেটা হ'চ্ছে—বাঙালী হ'য়ে বাঙালীর আদর্শকে ক্ষুন্ন ক'রবার, বাঙালীর সত্ত্বাকে হারাবার স্বেচ্ছাকৃত অপচেষ্টা। যে জিনিষটা সম্পূর্ণ নিজেদের সামান্য যত্ন ও চেষ্টার ওপর নির্ভর করে সেটাকে অবহেলা করা শুধু অন্যায় নয়, গুরুতর অপরাধ। যেখানে একরকম স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়ে বসবাস ক'রতে হ'চ্ছে, যেখানে হয়তো জন্মগ্রহণও ক'রতে হ'য়েছে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে অবশ্য স্থানীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কইতে হয়, কার্য্যক্ষেত্রে হয়তো স্থানীয় বেশভূষারও প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তাই ব'লে নিজেদের মাঝেও কি মাতৃভাষার অমর্য্যাদা ক'রে পরকীয় ভাষা ও ভাবের বিনিময় করায় কোনো সার্থকতা বা গৌরব আছে? সমগ্র ভারতের মাঝে এক বাঙালী ছাড়া অপর কোনো জাতি হয়তো এমন ক'রে নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দেয় না। এতো বড় অনুকরণ-প্রিয় জাতি পৃথিবীতে আর কোথায় আছে? স্বীকার করি, মস্তিষ্কের অত্যধিক উর্ব্বরতা হেতু বাঙালী সবকিছুই অতি সহজে আয়ত্ত ক'রতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে এই শক্তির অপব্যবহার করার পক্ষে কোন্ সুযুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে? আমি চাই, প্রত্যেক বাঙালী প্রবাস-জীবনেও বাঙালীই থাকৃবে। কোনো অবস্থাভেদেই তার

আপন সত্তার বিলোপসাধন সে ক'রবে না! এ'র বিপরীতটি প্রত্যক্ষ ক'রে চিত্তের অসুস্থতা কিছুতেই দূর হ'তে চায় না।"

মাঝে মাঝে যখনি ঐ ঘাটটিতে এসে ব'সতাম তখনি এই রকমের নানা চিন্তা আমার মগজে গিয়ে ঢুকতো। একদিন এইভাবে ব'সে আছি, এমন সময় দেখি, একদল মাথা-ন্যাড়া মেয়ে-পুরুষ সঙ্গমের দিক থেকে (তখন বাৎসরিক মাঘ-মেলা আসন্ন) দুর্গপ্রাকারের নীচে যমুনার ধার দিয়ে আমার দিকে আসছে। তাদের মধ্যে যে-লোকটি দলের পাণ্ডা ছিলো, তার হাতে অল্পদামের একখানা হিন্দী বই দেখতে পাই। আমাদের দেশের বটতলায়-ছাপা ঐরকমের বই ফেরিওয়ালারা রাস্তায়-রাস্তায় অলিতে-গলিতে বিক্রী ক'রে বেড়ায়। সে লোকটি এসে আমাকে ঐ ভাবে ব'সে থাকতে দেখে হয়তো ভাবে, আমি একজন ভগবদ্ভক্ত। আমাকে জিজ্ঞেস করে—বাবুজী, আপ ক্যা প্রয়াগকে রহনেবালা হৈঁ?" আমি জবাব দিই "হাঁ জী প্রয়াগমে মৈ নে রহতা হুঁ।" সে লোকটি তখন বলে—"বাবুজী, তব্ তো আপ্ সব দেবতা হৈঁ। "ইয়ে আপ্ কিঁউ বাতাতে হৈঁ?"—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলে "ইস্ কিল্লেকে অন্দরমে যো অক্ষয় বটকা পেড় হৈ পুরানে জমানেমে উস্‌কা ছাঁয় পাচ কোশ তক্ পড়তা থা। রহ্ পাঁচ কোশকে বীচমে যো যো গাঁও থা উন্ গাঁওকে আদমী সব দেবতা থে।" আমি তার কথা শুনে হাসি। সে ভাবে আমি তার কথা অবিশ্বাস ক'রছি। সে তখন একটু রাগতভাবেই বলে, "বাবুজী, আপ্ হস্‌তে হৈঁ! মেরা বাত্‌মে আপ্‌কো বিশ্বাস নহী হোতা হৈ? আচ্ছা বাবুজী, প্রতিষ্ঠানপুরকো আপ্ জান্‌তে হৈঁ?" আমি জবাব দিলাম, "নহী জী, প্রতিষ্ঠানপুরকা নাম তো কভ্‌ভি মৈ নে শুনাই নহী।"

তখন সেই বইখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "ইস্‌মে দেখিয়ে ক্যা লিখা হৈ।" দেখি, প্রতিষ্ঠানপুরে পৌরাণিক যুগের রাজা ঐল, রাজা বুধ প্রভৃতি রাজত্ব ক'রতেন আর দেবতারা তথায় আনাগোনা ক'রতেন, ইত্যাদি সব লেখা! আমি সেই লোকটিকে বলি, "আচ্ছা, মৈ নে এক রোজ প্রতিষ্ঠানপুরমে জাউঙ্গা, কুছ্ না কুচ্ পাওা জরুর মিল্ জায়গা।" এই সব কথাবার্ত্তার পর ও'রা সকলেই আমাকে 'সেলাম' ক'রে চ'লে যায়। ওদের সঙ্গে আলাপে জানি, ওরা গোরক্ষপুরের লোক। কী জলন্ত বিশ্বাস ওদের! কথায় বলে—বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর!

কিছুক্ষণ বাদে সূর্য্যাস্ত হয়। আমিও বাসার দিকে ফিরে চলি। ঐ সময় প্রফুল্লের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি এলাহাবাদে ছিলো না। একদিন তার নিকট প্রতিষ্ঠানপুরে আমার সঙ্গী হ'য়ে যাবার জন্য প্রস্তাব করি। সে যেতে স্বীকার করে। যদি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের ওখানে গিয়ে নৌকোয় পেরিয়ে যাই তা হ'লেই সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু তা না ক'রে আমরা বি-এন্-ডাবলিউ-আর এর গাড়ীতে উঠে গঙ্গা-ব্রিজের ওপর দিয়ে ঝুন্সি ষ্টেশনে গিয়ে নামি। প্রতিষ্ঠানপুরের বর্ত্তমান নাম ঝুন্সি। আমাদের ধারণা ছিলো, প্রতিষ্ঠানপুরের প্রাচীন কীর্ত্তির যা কিছু সবই ঝুন্সি ষ্টেশনের খুব নিকটে হবে। কিন্তু এখন দেখি—ষ্টেশন থেকে অনেকটা দূর! চ'লতে চ'লতে আমরা আবার সেই গঙ্গা ব্রিজেরই সাম্‌নে এসে উপস্থিত! ওপারেই দারাগঞ্জ! ওখান থেকে গঙ্গার তীর বেয়ে পথ অতিক্রম ক'রতে থাকি। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু! মার্চ্চমাস! প্রচণ্ড রোদ্দুর! একেবারে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে উঠ্‌লাম। এ'র মধ্যে এক নৌকোর মাঝির সঙ্গে দেখা হয়। কিছু বক্‌শিসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে আমাদের গাইড্ ক'রে নিই।

সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। অদূরে উঁচু একটি স্থান দেখিয়ে বলে—'বহ্ ঝুন্সি হৈ'। এই ব'লে সে কিন্তু ওপরের পথে না গিয়ে গঙ্গার তীরে আমাদের নিয়ে উপস্থিত করে।

ঠিক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মুখে একটা টানেলের মতো গুহার ভিতরে আমরা প্রবেশ করি। ঐ গুহাটি ঘোর অন্ধকারময়। গাইড্‌টি আগে আগে চ'ল্‌ছে, আমরা পেছনে পেছনে তার অনুসরণ ক'রছি! খানিকটা দূর গিয়ে সে বলে, "বাবুজী, সাম্‌নে মহাবীরজীকা মন্দর হৈ।" কি ছাই দেখ্‌বো? অতো অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়? তারপর একটু বাদেই বলে, "ইয়ে সিড়্ডি হৈ। আইয়ে, খুব হুঁসিয়ার্‌সে উঠিয়ে।" সিঁড়িগুলি একেবারে খাড়াই। কতোগুলি সিঁড়ি অতিক্রম ক'রতে হয় সে আর এখন আমার মনে নেই। কিন্তু কোনোমতে ওপরে উঠেই মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবার উপক্রম! চোখে সরষের ফুল! কয়েকজন সাধু সেখানে ছিলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি একটি 'দড়ি' (সতরঞ্চ) বিছিয়ে দেন। চোখে-মুখে জল দিয়ে তার ওপর গা এলিয়ে দিই। প্রায় মিনিট পনের পরে একটু প্রকৃতিস্থ হই। এক গ্লাস জল পান ক'রে সুস্থ হ'য়ে বসি। প্রফুল্ল তখন একটু ঠাট্টার সুরে বলে, "যে লোক রন্‌থম্বর দুর্গে উঠ্‌তে পেরেছে, এইটুকু উঠেই তার এই অবস্থা!" আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বলি, "ভাই, এ অবস্থাটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠ্‌বার জন্য নয়; এটা হ'লো এই দেড় মাইল পথ মার্চ্চ মাসের দুপুরে প্রচণ্ড রোদ্দুরের মধ্যে হেঁটে আসার ফল! তবে তোমার হেল্‌থুল্‌ না খাবার কারণ—তুমি আমার চেয়ে পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু বেশী!"

দেখি, যে-স্থানটিতে আমরা আছি সে স্থান অনেকটা উঁচুতে। সেখানে এখন কয়েকজন সাধু বাস করেন। তাঁদের মধ্যে যিনি প্রধান

তিনি তখন ওখানে উপস্থিত ছিলেন না। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরই আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম, প্রতিষ্ঠানপুরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁরা কি জানেন। তার উত্তরে তাঁরা যা ব'ল্‌লেন তাতে আমার পরিতৃপ্তি হ'লো না। আমি জান্‌তে চেয়েছিলাম, পৌরাণিক যুগ থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ স্থানের একটা সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস। তাঁরা তা' জানেন না, সুতরাং ও সম্বন্ধে আমাকে কোনো তথ্যই দিতে সমর্থ হন না। সেখানে 'সমুদ্রকূপ' নামে একটি কূপ আছে। অনুমান হয়, গুপ্তবংশের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ সমুদ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিসমূহের মধ্যে ঐ কূপটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনুমান ছাড়া স্পষ্ট কিছুই জানাবার উপায় নেই। যুগ-যুগান্তরের ঘোরতম অন্ধকার ঠেলে আলোর সন্ধান কিছুতেই পেলাম না। সেখানে একটি কি দু'টি মন্দির আছে দেখ্‌লাম। আর বিশেষ কিছুই দর্শনীয় ব'লে মনে হ'লো না। এই সব ক'রতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কেটে যায়। শেষটায় সাধুদের কাছে জান্‌তে পারি, এলাহাবাদ চকে একটি হিন্দী বইয়ের লাইব্রেরী আছে, সেখানে নাকি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর সম্বন্ধে কিছু জানা যেতে পারে।

এবারে আমরা স্থির করি, ট্রেনে না গিয়ে নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে যাবো! তারপর দারাগঞ্জ থেকে বাইকাবাগ পর্য্যন্ত টোঙায় অথবা একায় ক'রে বাসায় গিয়ে পৌছোনো যাবে। এই মনে ক'রে আমরা একখানা নৌকো ভাড়া করি। ভাগ্যও এম্‌নি যে মাঝিটিও হ'লো নিতান্ত না-বালক। ঐ স্থানটায় আবার নদীর জলও এক হাঁটুর বেশী গভীর নয়। সবটাই ঠেলে চ'ল্‌তে হ'লো। দেখি, ছেলেটি পেরে ওঠে না। হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! তখন আমরা দু'জনাই নেবে পড়ি। আমরাও নৌকো ঠেলার কাজে লেগে যাই। যে জায়গায় আমাদের নাবিয়ে দেয় সেখান থেকে দারাগঞ্জ বাজার অনেকটা দূর! আমরা কলাইয়ের

ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে শেষটায় এক বাঁধানো ঘাটে এসে উপস্থিত হই। সেখানে একটু বিশ্রাম ক'রবার পর এক্কা ভাড়া ক'রে বাসায় পৌছি। এসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুম দিয়ে তবে শ্রান্তি দূর হয়।

আর একদিন নৌকো ক'রে বেড়াতে গিয়ে দু'টি দৃশ্য দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয়। যমুনায় দেখি, যে-সকল ধনী লোক বিকেল বেলায় নৌকা-বিহার ক'রতে আসেন তাঁরা জলে পয়সা ছুঁড়ে দেন আর কতোকগুলো লোক সঙ্গে সঙ্গে নৌকো থেকে ঝাঁপ্‌ মেরে ডুব দিয়ে সেই পয়সা তুলে আনে। এই নাকি তাদের পেশা। এই ভাবে উপার্জ্জন ক'রেই নাকি তারা সংসার চালায়! যমুনার জল এতো স্বচ্ছ যে পয়সা যখন ছুঁড়ে ফেলা হয় তখন মাটিতে গিয়ে প'ড়তে না প'ড়তেই ওরা ডুব দিয়ে সেই পয়সা ধ'রে ফেলে। ধনী লোকেরা শুধু পয়সাই ছোড়ে না সিকি-দুয়ানী-আধুলি-টাকা পর্য্যন্ত ছুঁড়ে আমোদ উপভোগ করেন। তাঁদের এই আমোদ-প্রমোদ উপভোগ কতোকগুলো দরিদ্রপরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় ক'রে দেয়। আবার গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের ওখানে গিয়ে দেখি দলে দলে লোকে নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে টাকা-আধুলি-সিকি-দুয়ানী-আনী-পয়সা, এমন কি, সোনা-রূপো পর্য্যন্ত পাচ্ছে! একটি লোককে জিজ্ঞেস করি, "ভাইয়া, কিত্‌না মিলা?" সে বলে, "বাবুজী, আপকে কৃপাসে আজ আট রূপয়া মিল্‌ গয়া।" আমি তো শুনে অবাক্! তাদের দু'এক জনের সঙ্গে আলাপে জানি, ঐ ক'রেই তারা তাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, লোকলৌকিকতা, সমাজসামাজিকতা যা কিছু সবই ও'র ওপর দিয়ে চলে। এজন্য নাকি গভর্ণমেণ্টকে ওদের খাজনাও দিতে হয়। প্রয়াগ মহাতীর্থ। ভারতের রাজা-রাজড়া, জমিদার, ব্যাবসাদার প্রভৃতি এসে এই সঙ্গমে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। গঙ্গামায়িজীকে

যে-সকল ধনরত্ন তাঁরা উৎসর্গ ক'রে যান সেই সব ও'রা কুড়িয়ে নেয়।

এই যে দু'রকমের অভিজ্ঞতা আমার হ'লো এটা কিন্তু অনেকের কাছেই বিস্ময়কর! অবশ্য ঐ অঞ্চলের যাঁরা এসব দেখেছেন তাঁরা হয়তো এই অভিজ্ঞতাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব'লেই মনে করেন না। তাঁদের কাছে এ'র কোনো অভিনবত্বই নেই। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিলো অনিসন্ধিৎসু হ'য়ে সবকিছু দেখ্‌বো, সবকিছু জান্‌বো! তাই, অনেক সময় দৈহিক ক্লেশ উপেক্ষা ক'রেও আমি অনেক স্থানে গেছি, অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'রেছি। আমাদের বাংলা দেশে কিন্তু এরকমের উপার্জ্জনক্ষেত্র কোথাও আছে ব'লে আমার জানা নেই।

একদিন এলাহাবাদ চকে গিয়ে পূর্ব্বোক্ত লাইব্রেরীতে প্রতিষ্ঠানপুর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। লাইব্রেরিয়ান আমায় একখানি হিন্দী ও একখানি ইংরেজী বই দেখ্‌তে দেন। দু'খানি বইতেই ঐ সম্বন্ধে তিন লাইনের বেশী লেখা নেই! সুতরাং নৈরাশ্য নিয়ে সেখান হ'তে ফিরতে হয়। পরে রামকৃষ্ণ-মিশনের এক সাধুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তিনি আমাকে একখানা চটি বই দেন। কোনো-এক সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রয়াগের এক ধর্ম্মসভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর অভিভাষণ পরে ছোটো একখানা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। এই বইখানি সেই অভিভাষণ-পুস্তিকা। আদ্যপান্ত পাঠ করি, কিন্তু এতে আমার কৌতূহল প্রশমিত হয় না। এক কথায়, পৌরাণিক যুগের কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানপুর সম্বন্ধে আমার জানবার আকাঙ্খা অপূর্ণই র'য়ে যায়। এদিকে শ্রীযুক্ত ভার্গবের সঙ্গে যে চুক্তি হ'য়েছিলো তার সর্ত্তানুযায়ী কাজও শেষ হ'য়ে এলো। তখন আমি জয়পুরে প্রত্যা-বর্ত্তনের বন্দোবস্ত করি। বই ছাপা হ'য়ে যাবার পর মার্চ্চের এক মধ্যাহ্নে প্রফুল্লের নিকট বিদায় নিয়ে জয়পুর যাত্রা করি।

(১৮)

এলাহাবাদ হ'তে জয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবার পর এপ্রিলমাসে (১৯৪০) বৈরাটের প্রাচীন নিদর্শনাদি দেখ্‌তে যাই। জয়পুর-দিল্লীর মাঝামাঝি এই অতি-প্রাচীন নগরটি। স্থানটি বর্ত্তমানে জয়পুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জয়পুর শহর হ'তে এর দূরত্ব চুয়ান্ন মাইল মাত্র। বেলা সাড়ে-দশটায় আমরা মোটরযোগে যাত্রা করি। তথায় যেতে হ'লে কাছোয়া রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী অম্বর (আমের) হ'য়ে যেতে হয়। তখন বেশ গরম। গাড়ী তীরবেগে ছুটে চলে! কিছুক্ষণ বাদেই অদূরে আস্‌রোল গিরিদুর্গটি দেখ্‌তে পাই। দুর্গটি দেখ্‌তে ক্ষুদ্র কিন্তু খুবই সুদৃঢ়। পরক্ষণেই আস্‌রোল নদীটি পার হ'তে হবে! নদীর অপর পারে ক্রমোন্নত বক্রগতি পার্ব্বত্যপথটি ও তার উভয় পার্শ্বে প্রোথিত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত প্রস্তর সকল খানিকটা দূর হ'তে বেশ সুষমামণ্ডিত ব'লে অনুমিত হয়। এই পথটির প্রথম কার্ভটি ঠিক ইংরেজী 'U' অক্ষরের ন্যায় দেখ্‌তে। সেটা অতিক্রম ক'রবার পরই আমরা এক বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে এসে পৌছি। ঐ স্থানটিতে অনেক আবাদী ক্ষেত-খামার আছে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কতোকটা স্বচ্ছল ব'লেই মনে হ'লো। দূরে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়ে। গ্রামটির নাম মনোহরপুর। অল্প সময় পরে সেই গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে দেখি একটি ছায়াশীতল স্থানে কয়েকখানা মোটর বাস দাঁড়িয়ে। আলোয়ার হ'তে জয়পুরগামী বাসসমূহের ওটা একটা হল্টিং ষ্টেশন।

চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে এবারে যে অঞ্চলে এসে উপস্থিত হই তার দৃশ্য শস্যশ্যামলা বাংলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে দিকে তাকাই সেই

দিকেই একটা শান্তশ্রী ভাব! দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা নদীর সম্মুখীন হই। রাজস্থানে এরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঐ সকল নদীর মাঝ দিয়েই সরকারী রাস্তা চ'লে গেছে। নদীতে তো জল থাকে না! অতিরিক্ত বর্ষণে মাত্র অল্প সময়ের জন্যই ঐ সকল ক্ষুদ্র নদী প্রবহমানা হয়! যাহোক, ঐ নদীটি পেরিয়েই আমরা শা-পুরায় পৌছি। এই শা-পুরা একটা মস্তোবড়ো 'ঠিকানা' (এক ঠাকুর সাহেবের বিস্তীর্ণ জমিদারী)। এটা একটা শহর ও চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। বা'র থেকে খুব ছোটোই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ততোটা ছোটো নয়। পরে অন্য এক সময়ে ঐ শহরের ভেতর দিয়ে যাবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। তখন দেখেছি ও'র মধ্যে রাস্তাঘাট, দোকানপাট, মন্দির, মস্‌জিদ, হিন্দু-মুসলমানের বসতি সবই আছে। কিছু সময় পরে আমরা এমন একটা স্থানে এসে উপস্থিত হই যেখান হ'তে রাস্তার এক শাখা ভাব্‌রু হয়ে প্যাওটা পর্য্যন্ত, অপর শাখা বৈরাট ও আলোয়ার হ'য়ে দিল্লী পর্য্যন্ত গেছে। আমরা শেষোক্ত পথেই ছুটে চলি। এবারে সমতলক্ষেত্র ছেড়ে আমরা ঘনসন্নিবিষ্ট গিরিশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করি। যতোই পথ অতিক্রম করি ততোই অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী চোখের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হয়। এ অঞ্চলটিতে যেমন পাহাড়ের পর পাহাড়—শুধু পাহাড়ই—দেখ্‌লাম, এমনটি আর কোথাও দেখিনি।

অবশেষে যেখানে এসে আমাদের গাড়ী থামে সেখানে দেখি, একটি সুন্দর উদ্যান র'য়েছে, কিন্তু লোকের বসতি নেই! ঐ স্থানের একটি দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হই! দেখি, একপাল গরু একটা ছোটো চালা-ঘরের ভেতরে ও বাইরে চলা-ফেরা ক'রছে! তাদের মধ্যে একটা বাছুরের নীচের চোয়াল একেবারে ছিঁড়ে গিয়ে ও'র দু'একটা অংশমাত্র ঝুল্‌ছে আর তা' হ'তে অজস্র রক্তপাত হ'চ্ছে! দৃশ্যটি দেখে দেহের

মধ্যে একটা ভীতির শিহরণ অনুভূত হয়। ভয়ে ভয়ে গোপালদাকে প্রশ্ন করি, "ব্যাপারখানা কি বলুন তো?" ওখানে কয়েকজন 'গেঁয়াড়' (গেঁয়ো লোক) দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে গল্প ক'রছিলো। কোথাও কোনো গুরুতর ঘটনা যে ঘ'টেছে ও'দের ব্যবহারে তার বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া গেলো না। গোপালদা' ওদের একজনকে ডেকে ব্যাপার কি জান্‌তে চাইলেন। এতে লোকটি অবলীলাক্রমে যা' ব'লে উঠ্‌লো তা'র মর্ম্মার্থ এই—"ও! আপনি ঐ বাছুরটার কথা জান্‌তে চান? ও'কে এই আধঘণ্টাটেক আগে একটা বাঘে ধ'রেছিলো, তবে কোনো-রকমে তা'র মুখ থেকে ছিট্‌কে ছুটে এসেছে!" বেলা তখন প্রায় দেড়টা। তাই গোপালদা' ব'ল্‌লেন, "সে কি? দিন-দুপুরেও এখানে বাঘে ধরে নাকি? তা' তোমরা এখন এ'র কি ব্যবস্থা ক'রছো?" সে 'গোঁয়াড়' জবাব দিলো "এ'র আবার করবার কি আছে? এরকম তো হামেসাই হ'য়ে থাকে! ও বাছুরটা আর বাঁচ্‌বে না মশাই!"

ওখান থেকে বৈরাট মাত্র তিন মাইল দূর! আর কালবিলম্ব না ক'রে আমরা দ্রুত ছুটে চলি। বেলা দুটোয় এসে বৈরাটের সরকারী ডাক্তার-খানার ডাক্তার মুখার্জ্জীর বাংলোয় পৌঁছি। ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত এক বন্ধু। ইনি আমাদের যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করেন। বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা তো হ'লোই, নৈশ আহারের নিমন্ত্রণও রইলো। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা! বিশেষ ক'রে সাম্‌নে রাত্রি! সুতরাং এই সাদর আপ্যায়নের জবাবে একবারমাত্র একটা 'কিন্তু' ক'রেই রাজী হ'য়ে যাই। স্থানীয় স্কুলের দু'জন শিক্ষককে ডাক্তার মুখার্জ্জী ডেকে আমাদের গাইড্‌ ক'রে দেন। জলযোগের পরেই আমরা ভীম-জী-কি-ডুংরী দেখ্‌তে চলি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে আমরা ঐ পাহাড়টিতে গিয়ে উপস্থিত হই। বেলা তখন সাড়ে-তিনটে কি চারটে হবে।

সেখানে গিয়ে প্রথমেই দেখি, সম্রাট অশোকের সময়ের একটা শিলা-লিপি। সেটি ভীম-জী-কি-ডুংরীর পাদদেশে পাহাড়টির গায়ে খোদিত। একে তো যে ভাষায় ওটা লেখা তাই আমাদের নিকট অবোধ্য, তার ওপর সে লেখাও আবার লুপ্ত হবার উপক্রম হ'য়েছে। কিঞ্চিদধিক দু'হাজার বছর আগেকার লেখা এটা! ওটা দেখার পর ওপরে উঠি। সেখানে দেখি পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের নিদর্শন! অনেকগুলো ব্যাপার কৃত্রিম ব'লে মনে হয়! তবু স্থানটির প্রাকৃতিক অবস্থিতি দেখে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা সত্য চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো! মহাভারতীয় যুগে স্থানটির বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিলো, কেন না ঐটেই ছিলো মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের রাজধানী। সেকালে তাঁরই নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ হয় বিরাটপুর। এ' হ'তেই ক্রমে বর্ত্তমান নামের উৎপত্তি হ'য়েছে ব'লে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। ভারতের সর্ব্বত্র ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ দর্শনে সত্যিই আনন্দ ও কৌতূহলের উদ্রেক হয়, কিন্তু ঐ সকল স্থানের কোনোটি যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মৃতি বহন ক'রে আনে তবে আনন্দের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। যে কোনো স্থানই তার প্রাচীনত্বের আদর্শে পর্য্যটকদের চিত্ত বিমোহিত করে—এটা অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। প্রাচীন নিদর্শনাদি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে ঐতিহাসিকেরা যে সকল অনুমান ক'রে থাকেন তৎসমুদয় স্থানীয় জনমতের ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে এক সুদৃঢ় মতবাদের সৃষ্টি করে।

বৈরাটে অতি-প্রাচীন যুগের যে-সকল নিদর্শন বিক্ষিপ্তভাবে অদ্যাপি বিদ্যমান দেখ্‌তে পাওয়া যায় সে সব দেখে-শুনে এই প্রতীতি হয় যে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের সহধর্ম্মিনী দ্রৌপদীর সঙ্গে সত্যিই এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের এক নিভৃতাঞ্চলে অজ্ঞাতবাস ক'রে গিয়েছিলেন।

বৈরাটের ভীম-জী-কি-ডুংরী নামীয় ক্ষুদ্র পাহাড়টির গুহাভ্যন্তরেই যে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন একথা সত্যি ব'লেই মনে হয়। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর ও পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ খুব সম্ভব বর্ত্তমান দিল্লীর অনতিদূরে অবস্থিত ছিলো। সুতরাং পাণ্ডবেরা তাঁদের বনবাসের দ্বাদশবৎসর নানাস্থানে অতিবাহিত ক'রে অবশেষে দক্ষিণাভিমুখে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে বিরাটপুরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন এবং এই স্থানেই তাঁদের অজ্ঞাতবাসের উপযোগী নিভৃতাঞ্চলের সন্ধান পেয়ে পুলকিত হন,—এরূপ অনুমান যদি কেউ ক'রে থাকেন তাঁর সে অনুমানকে সত্যের অপলাপ বলা চ'ল্‌বে না। মহাভারতের এই উপাখ্যান কারোও অবিদিত নেই। এ'র মূলে যে সত্য নিহিত আছে তা' অবিশ্বাস ক'রবার সঙ্গত হেতুও নেই। কানিংহাম, কারলাইল ও ভাণ্ডারকার প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণও এ'র কোনো প্রতিবাদ করেন নি। বৈরাট সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনা ক'রতে গিয়ে দেখি, প্রাগৈতিহাসিক যুগ ও বৌদ্ধযুগের মধ্যকার শতসহস্র বৎসরের ঘনান্ধকার কোনো ঐতিহাসিকই দূর ক'রে দিতে সমর্থ হন নি। মনে হয় যেন সহস্র বৎসরের গাঢ় নিদ্রার পর অকস্মাৎ আমরা বৌদ্ধযুগের প্রভাবের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং উত্তরভারতের শেষ বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ভারতপরিদর্শন ক'রতে আসেন। কোনো এক সময়ে তিনি বৈরাটে এসে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, বৈরাটের অর্থাৎ তৎকালীন বিরাটপুরের অধিপতি 'বাই-শী' বা 'বাইশ' (বৈশ্য?) জাতিভুক্ত ছিলেন। তাঁর মতে ইনি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের আত্মীয়। এ'র অদম্য সাহস ও অদ্ভুত রণকৌশল নাকি তৎকালে ভারতবিখ্যাত ছিলো। হুয়েনসাংয়ের বর্ণনানুযায়ী ঐ স্থানটিতে তৎকালে আটটি

বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিলো এবং বৌদ্ধভিক্ষুও সংখ্যায় খুব অল্পই ছিলো। এ'র পরে ঐ স্থান সম্বন্ধে চারশো বছরের কোনো ইতিহাসই পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' 'গজনীর সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণের ব্যাপার। মামুদ ১০০৯ খৃষ্টাব্দে বিরাটপুর আক্রমণ করেন। তথাকার অধিপতি মামুদের আনুগত্য স্বীকার করায় তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু ১০১৪ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজ্য পুনরায় আক্রান্ত হয়। ফেরিস্তার মতে এই আক্রমন হয় ১০২২ খৃষ্টাব্দে। ঐ সময় নাকি তত্রত্য অধিবাসিগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ ক'রতে বাধ্য হয়। কানিংহাম এক বিবৃতি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, তার একটি অনুবাদ এখানে দেয়া হ'লো—"আমীরআলি কর্ত্তৃক এস্থান অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলের নারায়ন গ্রামে একটি প্রাচীন শিলালিপি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঐ শিলালিপির কথা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অট্‌বিও উল্লেখ ক'রেছেন। ও'তে এতো প্রাচীনকালের অক্ষর খোদিত ছিলো যে তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ঠিক-ঠিকমতো তা' প'ড়ে উঠ্‌তে পারেন নি। আমার যতোদূর মনে হয়, ঐটাই অশোকের সুপ্রসিদ্ধ শিলালিপি, যা' পরে বৈরাটের এক পাহাড়ের ওপর মেজর বাট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। সেটা এখন ক'ল্‌কাতার এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে রক্ষিত হ'য়েছে।"

পার্শ্বনাথের মন্দির, ভীম-জী-কি-ডুংরী ও বিজক্-কি-পাহাড়—বৈরাটের এই তিনটি অতি-প্রাচীন নিদর্শনই প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক কৌতূহল উৎপাদন করে। অদ্যাপি সেই জীর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত পার্শ্বনাথের মন্দিরটি স্থানীয় দিগম্বর জৈনদের তত্ত্বাবধানে আছে। পূর্ব্বে অবশ্য এটা ছিলো শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে। ভীম-জী-কি-ডুংরী একটা অনত্যুচ্চ পাহাড়। পাহাড়টির নীচে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসকল সর্ব্বত্র নানাভাবে

বিক্ষিপ্ত র'য়েছে। বৈরাটের-পূর্ব্বাংশে এক মাইল উত্তরে এই পাহাড়টি অবস্থিত। এই ভীম-জী-কি-ডুংরীর পাদদেশে একটি অশোকের শিলালিপি আছে। পূর্ব্বেই সে কথার উল্লেখ করা হ'য়েছে। ওটাকে Minor Rock Edict বলা হয়। পুরাতত্ত্ববিদ্ কারলাইল সর্ব্বপ্রথম ওটা আবিষ্কার করেন।

বিজক-কি-পাহাড় বৈরাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। 'বিজক' অর্থে শিলালিপি। বৈরাটের ঐ পাহাড়টিকে 'বিজক-কি-পাহাড়' এই জন্যই বলা হ'য়ে থাকে। বৈরাটের প্রাচীন লোকেরা বলেন, শিলালিপিটি প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে কোনো সাহেব ঐ স্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান। আমার কিন্তু বিশ্বাস, সাহেবটি মেজর বার্ট ব্যতীত অপর কেউ নন। তিনি ওটিকে 'ভাব্রু শিলালিপি' ব'লে অভিহিত ক'রেছেন। ভাব্রু নামক স্থানটি বৈরাট থেকে মাত্র বারো মাইল দূর। পূর্ব্বে ভাব্রুর বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিলো। তখন তথায় অনেক ধর্ম্মশালা ও সরাই ছিলো। এমনো হ'তে পারে, মেজর বার্ট তাঁর জয়পুরে অথবা দিল্লীতে যাবার পথে ভাব্রুতে কিছুকাল অপেক্ষা করেন। ঐ সময় বিজক-কি-পাহাড়ের ও তথাকার শিলালিপির কথা শুনে তাঁর অবশ্যই স্থানটি পরিদর্শন ক'রবার আগ্রহ মনে জাগে। ঐ সময়ে বৈরাটের প্রসিদ্ধি ততোটা না থাকায় তিনি ওটাকে ভাব্রুর নাম দিয়েই চালিয়েছিলেন। শিলালিপিটি 'তোপ' নামধেয় প্রস্তরখণ্ডটির নিকটে ছিলো। পাহাড়টির উঁচু ও নীচু দু'টি স্তর আছে। প্রথম স্তরটির ওপর শিলালিপিটি ছিলো। যাঁরা ওকে 'তোপ' নাম দিয়েছেন তাঁদের চোখে যদিও ওটা তোপের মতোই দেখিয়েছিলো আমার চোখে কিন্তু ওটা একটা বিরাটকায় কুমীরের মতোই দেখায়।

লোকে বলে, ওখানে প্রচুর গুপ্তধন ছিলো। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে এক কিলেদার ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ঐ গুপ্তধন উদ্ধারকল্পে ঐ স্থানে খননকার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু কানিংহামের মতে সেটা নাকি জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় রামসিংয়ের আদেশে হয়। কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা এটা অনুমান করা সুকঠিন। তবে তথায় কিছুই পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তীকালে কারলাইলের সময় যে খননকার্য্য হয় ওতে নাকি একটি সোনার বাক্স আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও'র মূলেও কোনোই সত্য নেই। এ সবই জনশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈরাটের প্রাচীন দুর্গটি নাকি একটি সু-উচ্চ ধূসরবর্ণের পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিলো। ওটা বৈরাটের বর্ত্তমান শহর থেকে কিছুদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিলো এবং প্রাচীন নগরটি ঐ পাহাড়ের তলদেশ থেকে বর্ত্তমান শহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। শহরাভ্যন্তরে বহু 'সতী-কি-ছত্রী' দেখতে পাওয়া যায়। যে-সকল সাধ্বী-স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে যেতেন তাঁদের ভস্মাবশেষের ওপর নির্ম্মিত সৌধসকলই ছত্রী। রাজপুতানায় ঐ রকমের ছত্রী অবশ্য বহু দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

গত চারশো বছর পূর্ব্বে যে বিরাটপুর বা বৈরাট এককালে জনমানব-শূন্য মরুভূমির ন্যায় হ'য়ে যায় সেই স্থানে পুনরায় জনসমাগম হ'তে থাকে। খুব সম্ভব, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেই পুনরায় ও'র সমৃদ্ধির সূচনা হয়। আবুল্ ফজ্‌ল্ কর্ত্তৃক লিখিত 'আইন-ই-আকবরী'তে যখন এ'র উল্লেখ আছে তখন বুঝতে হবে ঐ সময় অবশ্যই ও'র অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিলো। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ইন্দ্ররাজা নামে এক প্রখ্যাত ব্যক্তির ওপর বৈরাটের বনবিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হয়। সম্রাটের রাজস্ব-মন্ত্রী রাজা টোডরমল পূর্ব্বেই তাঁকে ঐ অঞ্চলের রাজস্ব আদায় ক'রবার জন্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইনি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং এ'র নাম দেন ইন্দ্রবিহার।

এই মন্দিরটি বিমলনাথ নামে এক তীর্থঙ্করের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। আবুল্ ফজ্ল্ তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে লিখে গেছেন যে বৈরাটে বহু তাম্রখনি ছিলো। বৈরাট শহর ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহের যেখানে-সেখানে তাম্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখনো দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বৈরাট পরিভ্রমণকালে আমরা তাম্রের ক্ষুদ্র খণ্ডসকল বিক্ষিপ্ত দেখ্‌তে পাই। দেখেই মনে হয় ওগুলো অতি প্রাচীনকালের!

মহম্মদ সফী নামে এক মুসলমান উকীল ডাঃ মুখার্জ্জীর বাসভবনে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসেন। তিনি তাঁর অশীতিবর্ষবয়স্ক পিতাকেও সঙ্গে আনেন। ওঁর নাম মহম্মদ কাদির খাঁ। তাঁদের উভয়ের নিকট থেকে আমরা বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ ক'রতে সক্ষম হই। তাঁদের উক্তি থেকে এবং যে সকল দলিলপত্র তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন তা' থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে মহারাজা মানসিংয়ের সময়েই বৈরাট অম্বর-রাজ্যভুক্ত হয়। সম্রাটের দরবারে তাঁর অশেষ প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর পুরস্কারস্বরূপ ঐ নগরটি তাঁকে দেয়া হয়। উকীল সাহেবের পূর্ব্বপুরুষগণ মোগল দরবার হ'তে যে-সকল ফার্ম্মান পেয়েছিলেন সে-সবই আমাদের তিনি দেখান। ওগুলো তিন-চারশো বছর আগেকার প্রাচীন ও জীর্ণ হ'লেও অদ্যাবধি ঐ সকলের মসীরেখার উজ্জলতা ও চাকচিক্য প্রনষ্ট হয় নি। বৈরাট নগরটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় ও'র ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তর থেকে যে-সকল মুদ্রা বা'র হ'য়েছে তাদের আকৃতি ও তারিখ দেখে। ১০১৪ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক বৈরাটের ধ্বংসসাধনের পর বহু শতাব্দী ধ'রে এই নগর জনমানবহীন অবস্থায় থাকে। পরে মোগলদের শাসনকালে আবার জনবহুল হ'য়ে উঠে। কিন্তু চান্দেরী নামক স্থানে ফারসী ভাষায় লেখা

এক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। তা'তে লেখা আছে যে সুলতান মামুদের পর বৈরাট চৌহান পৃথ্বীরাজের অধীন হয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই একথা ব'ল্‌লে কোনো অন্যায় হয় না, কেন না এই নগরটি আজমীর হ'তে দিল্লী যাবার পথেই পড়ে।....দু'দিনে প্রায় কুড়িঘন্টাকাল আমরা বৈরাটে থাকি। এই সময়ের মধ্যে যা'কিছু দেখ্‌বার ও জান্‌বার সব সংগ্রহ ক'রে বেলা সাড়ে-এগারোটায় জয়পুর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি। পথে আর কোথাও থাম্‌তে হয় নি। বেলা পৌনে-দু'টোয় বাসায় গিয়ে পৌছি।

* * * *

বৈরাট ভ্রমণের পাঁচ-সাত দিন পরেই সম্বর হ্রদে যাবার বন্দোবস্ত হয়। সম্বর জয়পুর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থান। স্থানটি জয়পুর ও যোধপুর এই উভয়রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে চৌহান রাজপুতদের উৎপত্তিস্থানই এই সম্বর। আবার কেউ কেউ বলেন, পুষ্কর মহাতীর্থে এক যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে এঁদের অভ্যুত্থান হয়। যিনি যা'ই বলুন না কেন, সম্বর যে একটি সুপ্রাচীন নগর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নাই। সেখানে আমার যাবার উদ্দেশ্য জয়পুর গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত খননকার্য্যাদি আর ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত লবণের কারখানাদি দর্শন করা। আজমীরের পথে চব্বিশ মাইল অতিক্রম ক'রবার পর সম্বরের দিকে একটা শাখাপথ বেরিয়ে গেছে। সেই পথে কিছুদূর গিয়েই অমরা পুরাকালের কীর্ত্তিচিহ্নসম্বলিত একটি প্রাচীন গ্রামে গিয়ে পৌছি। যতোটা স্মরণে আসে তা'তে মনে হয় গ্রামটির নাম নারায়ণপুর। ঐ গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তা মন্দ নয়। তারপরই বালুকাময় মরুভূমির মাঝখান দিয়ে যেতে হয়। বর্ষার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কোনোরকমে

ঐ রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায়। কিন্তু বালুর ঝড় উঠ্‌লে সমূহ বিপদ! গাড়ী যেন আর চ'ল্‌তে চায় না!

কোনোরকমে ঠেলেঠুলে আমরা পথ অতিক্রম করি। আবার বালুর সমুদ্র! অনেকটা পথ বহু কষ্টে অতিক্রম ক'রে জয়পুর রেলওয়ে লাইন পার হই। এবার বাঁধের মতো কি একটা দৃষ্টিগোচর হওয়ায় গোপালদাকে জিজ্ঞেস করি, "ওটা কি? আবার ও'র ওপর দিয়ে যেন রেলও পাতা আছে মনে হ'চ্ছে? মালগাড়ীর মতো কি যাতায়াত ক'রছে না?" ছোটো একটা জবাব পেলাম—"একটু পরেই দেখ্‌তে পাবেন!" প্রথমে যাই ডাক-বাংলোর দিকে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে হ্রদ অভিমুখে যাত্রা করি। হ্রদটি প্রকাণ্ড। পূর্ব্বে ঐ হ্রদের সবটাই ছিলো যোধপুর রাজ্যের অধীন। জয়পুর ও যোধপুর রাজপরিবারদ্বয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় জয়পুরাধিপতি যৌতুকস্বরূপ হ্রদের অর্দ্ধেকটা প্রাপ্ত হন। সম্বর হ্রদের জল লবণাক্ত—এই বিষয়টা আবিষ্কার ক'রে ভারত গভর্ণমেণ্ট যোধপুর গভর্ণমেণ্ট ও জয়পুর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। চুক্তির সর্ত্তানুসারে প্রতিবৎসর উভয় রাজ্যই ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বহু লক্ষ টাকা পান। আমাদের গাড়ী একেবারে হ্রদের ধারে গিয়ে থামে। আমরা তখন গাড়ী থেকে নেবে সব দেখ্‌তে থাকি। ঐ সুবিস্তীর্ণ হ্রদের মধ্যে বহুসংখ্যক বাঁধ বেঁধে ওকে বহুভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। দেখে মনে হয় যেন এক-একটা পুকুর!

বর্ষার পর ঐ সকল পুকুরের জল একটু-একটু ক'রে ক'ম্‌তে থাকে। যতোই জল কমে ততোই শ্যাওলা পড়ে। সেই শ্যাওলা উঠিয়ে ফেলা হয়। গুড় জাল দেবার সময় যেমন ওপর থেকে গাদ কেটে ফেল্‌তে হয় তেম্‌নি বারবার ক'রতে হয়। শেষটায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন

জল একেবারে শুকিয়ে যায় তখন যে মাটি প'ড়ে থাকে তাই লবণে পরিণত হয়। ঐ লবণেরই বাঁধ দূর থেকে দেখ্‌তে পাই! তার ওপর রেল পেতে ট্রলির ব্যবস্থা করা আছে। ঐ সব ট্রলিতে ক'রে লবণ নিয়ে এসে এক জায়গায় জমায়েত করা হয়। পরে রেলওয়েযোগে দেশবিদেশে চালান দেয়া হয়। বাংলাদেশে যে লবণকে 'করকচ' লবণ ব'লে সকলে জানে তাই সম্বর হ্রদের লবণ। ঐ লবণের দানাগুলি দেখ্‌তে পাথরের কুচির মতো। কতো সায়েবসুবো, কতো লোকজন দিবারাত্র ওখানে খাটছে! কি যে বিরাট ব্যাপার—প্রত্যক্ষ না ক'রলে ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম হয় না! আবার মজা এই, হ্রদের এলাকাটুকুতেই শুধু লবণাক্ত জল কিন্তু সম্বরের অন্যান্য জায়গায় ইঁদারা বা পাতকুয়োর জল অতি সুপেয়।

ওখান থেকে যাই সম্বরের খননকার্য্য দেখ্‌তে। গোপালদা' তাঁর পরিদর্শন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আমার সঙ্গে যেতে পারেন না। আমি একাই দেখ্‌তে যাই। ঐ দেশীয় এক ব্যক্তি আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে চ'ললো। লবণের কারখানা থেকে সে জায়গা খুব বেশী দূরে নয়। গিয়ে দেখি দু'তিন জায়গায় খননকার্য্য হ'য়েছে। প্রত্যেকটি আনুমানিক আট-দশ ফুট গভীর। তার মধ্যে ইটের বাড়ীর ভিত বেরিয়েছে দেখ্‌লাম। কিন্তু ঘরগুলি সবই অতি ক্ষুদ্র। জয়পুর গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ গবেষণা ক'রে ব'লেছেন মাটীর নীচে যে প্রাচীন নগরের কিয়দংশ খুঁড়ে বা'র করা হ'য়েছে তা' প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার অর্থাৎ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই বলা চলে। বৌদ্ধযুগের অনেক নিদর্শন সেখানে পাওয়া গেছে। সেকালের মৃৎপাত্রাদির ও ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদির যে-সকল ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সে সকল এখন জয়পুর মিউজিয়মে

রক্ষিত আছে। সে সব দেখে মনে হয়, ঐ সময়েও শিল্পকলার কি গভীর অনুশীলন ছিলো, সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কি অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিলো! এ'র কিছুদিন আগে বৈরাটে 'বিজক্-কি-পাহাড়ের' ওপর যে খনন-কার্য্য দেখে এসেছি তারও ঘরগুলি অতি ক্ষুদ্র! হয়তো সেকালে ওদেশে ঐরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরেরই প্রচলন ছিলো। এখনো উত্তর ও পশ্চিম ভারতে সেকেলে প্যাটার্ণের যে সব বাড়ী আছে তাদের ঘরগুলি অধুনা-প্রস্তুত বাড়ীর মতো বড়ো নয় বা জানালা-দরজারও বিশেষ প্রাচুর্য্য নেই। ঐ সব অঞ্চলের বসবাস-পদ্ধতি দেখে মনে হয় লোকে ঘরের বাইরেই শয়ন ক'রতে অভ্যস্ত ব'লে ভেতরের ঘরগুলো বড়ো ক'রবার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত ঐ পদ্ধতিরই অনুসরণ চ'লে আস্‌ছে।

একটি বিষয় দেখে সত্যিই বিস্মিত হ'তে হয়! ওদেশে সবই পাথরের বাড়ী। পাহাড় থেকে পাথর কেটে এনে বাড়ী তৈরী করা হয়। ইটের বাড়ী কোথাও নেই। ওদেশের লোকে জানেই না ইট কাকে বলে। অথচ অতি-প্রচীনকালের যে-সব ঘর-বাড়ীর খোঁজ পাওয়া গেছে সে-সবই ইটের। সেকালের ইটগুলি আকারে খুব বড়ো—প্রায় এক-একখানা টালির মতো! বৈরাট ও সম্বরের খনন কার্য্যাদি দেখে মনে হয়, দুইটি নগরই বৌদ্ধযুগে খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিলো। মহাভারতীয় যুগেও এদের খুব প্রসিদ্ধি ছিলো। সে-কালের এই সকল নগর জনবহুল ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিলো।...বেলা প্রায় এগারোটায় আমরা সম্বর ত্যাগ করি। পথে আবার সেই দুস্তর মরুসাগর পাড়ি দিতে হয়। অতিকষ্টে আজমীর রোডে যখন এসে পৌছি তখন বেলা প্রায় একটা। ওখান থেকে আধঘণ্টার মধ্যেই জয়পুরে পৌছে যাই।

(১৯)

এই সময় আমি জয়পুর হ'তে প্রকাশিত Indian India নামে ইংরেজী প্রত্রিকার সম্পাদকের কাজ করি। হিন্দী পত্রিকা 'প্রভাতের' সম্পাদক ও সত্বাধিকারী লাড্‌লী নারায়ণ গয়াল ইংরেজী পত্রিকারও সত্বাধিকারী। তাঁর প্রচেষ্টাকে প্রশংসা ক'রতে হয়। কিন্তু তাঁর খাম-খেয়ালী ও একগুয়েমির জন্য আমার সঙ্গে তাঁর মতের অনৈক্য হয়।...... এ'র মাঝে একদিন গোপালদা আমাকে জয়পুর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ ডক্টর কে. এন. পুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আলাপে খুসী হই। তাঁকে নিয়ে একদিন আমরা 'যজ্ঞস্থল' দেখ্‌তে যাই। এই স্থানে মহারাজা প্রথম জয়সিং কর্ত্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানটি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল। অদূরে অনত্যুচ্চ একটি পাহাড় আর তারই মাথায় একটি মন্দির দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যজ্ঞবেদীর আর কিছুই এখন বিদ্যমান নেই। যে জায়গাটিতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় সেই জায়গার চিহ্নমাত্র র'য়েছে। তবে যজ্ঞ স্তম্ভটি এখনো মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি জয়পুর শহরের বাইরে প্রায় দুই মাইলের মধ্যে—অম্বরে যাবার পথে।

এদিকে দুর্গাপূজা আসন্ন! খুব তোড়যোড় চল্‌ছে! গোপালদা তখন অতি-বেশী ব্যস্ত! তিনি না থাক্‌লে সত্যিই কোনো কাজ যেন সুসম্পন্ন হ'তে চায় না। পূজো উপলক্ষে বিদ্যারত্নের 'আলমগীর' অভিনয় হবে! তারই মহড়া পুরাদস্তর চ'ল্‌ছে! আমি শ্রোতা, দর্শক ও সমালোচক! আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখার্জ্জী নাট্যপরিচালক। তাঁরই উৎসাহ খুব বেশী! আবার তার চেয়ে বেশী

উৎসাহ দেখি শ্রীযুক্তা মুখার্জ্জীর ও তাঁদের মেয়ে শ্রীমতী নিভা ওয়ালেলকারের। নাটকখানি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়। এই সূত্রে প্রিন্সিপাল মুখার্জ্জীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে। লোকটি অতি সরল ও অমায়িক। নিজে শিল্পী ব'লে বাসভবনটি ছবির মতো ক'রে সাজিয়েছেন! সবটাই যেন ফিট্‌ফাট্-ছিম্‌ছাম্। দাঁড়িয়ে এক দণ্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়! কেউ যদি তাঁর বাড়ীতে যায় তবে বড়ো-বেশী খুসী হন।

শ্রীযুক্তা মুখার্জ্জীর স্বভাবটি মধুর। খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন রাগ্‌তেই জানেন না। তাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের সঙ্গে পূর্ব্বেই আমার আলাপ ছিলো। রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিতা বীণা দাস এঁর অপর এক কন্যা। ইংরেজী সাহিত্যে বেণীবাবুর প্রগাঢ় জ্ঞান অথচ কথায়বার্ত্তায় বা চালচলনে তার কোনোই আভাস পাওয়া যায় না। অতি সাদাসিদে ধরণের লোক। যখনি শুনি শ্রীযুক্তা মুখার্জ্জী তাঁর মেয়ে তখনি তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে কতোকটা ধারণা আমার হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপে ও কথায়বার্ত্তায় আমি খুবই প্রীত হই। শ্রীমতী নিভার বিবাহ হয় জয়পুর রাজ্যের এক সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—প্রিয়দর্শন ও স্বাস্থ্যবান যুবক। নিভা যদিও একটু ultra-modern ধরণের তথাপি তার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি যে সন্তুষ্ট হই সেকথা অস্বীকার ক'রতে পারিনে। মেয়েটি বেশ forward আর যে-কোনো কাজেই খুব উৎসাহী।……সপ্তমী পূজোর দিন 'আলমগীর' অভিনয় হয়। তার কয়েক দিন পূর্ব্বেই আমার চক্ষুপীড়ার সূচনা হয়। সেজন্য আমার আর অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয় না। শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জী ও অন্যান্য সকলেই আমার অনুপস্থিতির দরুণ খুব দুঃখিত হন। এদিকে ব্যাধি উত্তরোত্তর বেড়েই

চলে। বিজয়ার দিন যন্ত্রনার মাত্রা এতো বেড়ে যায় যে মনে হয় আত্মহত্যা ক'রে যন্ত্রণার অবসান করি। ডাঃ পি. রায় আমার চিকিৎসার ভার নেন। একমাস কাল অসহনীয় যন্ত্রনা ভোগের পর কতোকটা উপশম বোধ করি। হিতৈষী বন্ধুরা সকলেই পরামর্শ দেন দিল্লীতে গিয়ে উত্তর-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ এস. এন. মিত্রকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা ক'রাতে। বন্ধুদের সদ্‌যুক্তি উপেক্ষা না ক'রে দিল্লী ব'লে রওনা হই।

* * * *

আমার দিল্লী-যাওয়া এই প্রথম। প্রাতে গাড়ী ষ্টেশন-প্লাটফরমে গিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই হোটেলওয়ালাদের দালালরা এসে সেঁকে ধরে। আমি এক গুজরাটি দালালের খপ্পরে গিয়ে পড়ি। বাঙালী মেস একটা আছে শুনেছিলাম, কিন্তু সেটি কোথায় জানতাম না। যাহোক, ঐ গুজরাটি হোটেলেই দু'দিন কাটাতে হয়। থাক্‌বার অসুবিধে বিশেষ ছিলো না, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে এতো বেশী যে কোনোরকমে একবেলা ওদের পাক-করা অন্নব্যঞ্জনাদি গলাধঃকরণ ক'রতাম আর এক-বেলা খেতাম দোকানের খাবার-টাবার। হোটেলটি কিন্তু Queen's Parkএর ঠিক ওপরেই। বাস, ট্রাম, রেলষ্টেশন ইত্যাদি সবই কাছাকাছি। যেদিন আমি দিল্লীতে গিয়ে পৌছি সেই দিনই আমার পূর্ব্ব-পরিচিত ডাঃ শৈলেন সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি ডাঃ এস. এন. মিত্রের বরাবর একখানা পরিচয়-পত্র দেন। ডাঃ মিত্র দরিয়াগঞ্জের Shroff's Eye Hospital-এর চীফ্‌ মেডিক্যাল অফিসার। পরদিন প্রাতে আটটায় হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। চোখ পরীক্ষা হ'য়ে গেলে তিনি আমাকে আবার তিনমাস পরে দেখা ক'রতে বলেন। তাঁর ব্যবস্থামতো ওষুধপত্র ব্যবহার করি। ইত্যবসরে আমার এক

সহাধ্যায়ী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে বেঙ্গলী মেসে বন্ধুহিসেবে কয়েকদিনের জন্য থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেয়। গুজরাটি হোটেল থেকে ঐ মেসে এসে অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। চোখ পরীক্ষার ব্যাপারটা শেষ হ'য়ে যাওয়ায় আমি অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হই। তখন দিল্লী ফোর্ট দেখবার ইচ্ছা মনে জাগে।

একদিন বিকেলে বেঙ্গলীস্কুলের একজন শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে ফোর্ট দেখতে যাই। ফোর্টের বাইরেই দু'আনা দিয়ে টিকেট কিনতে হয়। ফোর্টটি লাল পাথরের—সম্রাট আকবরের সময়ে নির্ম্মিত, চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। আগ্রা ফোর্টও ঐ ধরণের। শুধু এলাহাবাদ ফোর্টটি ভিন্ন ধরণের। ক'ল্‌কাতার ফোর্ট উইলিয়ম এলাহাবাদ ফোর্টের অনুকরণে নির্ম্মিত। প্রবেশমুখেই দেখি একটি গোরা সৈন্য শান্ত্রীর কাজ ক'রছে। পথের দুইধারে দোকানীরা তাদের পরিপাটী-ক'রে সাজানো দোকান খুলে ব'সে আছে আর দর্শকদের প্রলুব্ধ ক'রবার জন্য কতোরকম বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে! আমরা কোনো প্রলোভনেই ভুল্‌লাম না! সেটা পেরিয়ে একটা বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা। তারপর আর-একটা ফটক। ঐ ফটক পার হবার সময় পাশপোর্ট দরকার। সেটা সহজেই পাওয়া যায়। এ'র পর ফোর্টের মিউজিয়াম দেখি। সেটাকে পুরাতন অস্ত্রাগার বলা চলে। অনেক রকমের অস্ত্রশস্ত্র সেখানে রক্ষিত হ'য়েছে।

সে-সব দেখা হ'য়ে যাবার পর আমরা দরবার-হ'লে উপস্থিত হই। সম্রাট যেখানে ব'সে দরবার ক'রতেন সে স্থানটি দেখি। একটা শ্বেত পাথরের বেদী র'য়েছে! সেখানে ব'সে সম্রাট প্রজাদের অভিযোগ শুন্‌তেন। হল্‌টির সিলিং কারুকার্য্যখচিত। একবার জাঠেরা দিল্লী ফোর্ট আক্রমন করে এবং একজায়গায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সে

পোড়াদাগ এখনো আছে। তার সংস্কার করা হয় নি। দর্শকেরা তাই দেখে সেকালের ঐতিহাসিক সত্যের প্রমাণ খুঁজে পায়। বেগম সাহেবারা গরমের সময় যে-সব জায়গায় ব'সে বিশ্রাম ক'রতেন সেগুলো দেখি। সবই মার্ব্বেল পাথরের। দেখে-শুনে যখন ওখান থেকে বেরিয়ে আসি তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বাতের রোগী আমি! অনেকটা হাঁটাহাঁটি, ওপর-নীচে করা ইত্যাদিতে পা ব্যথা হ'য়ে জ্বর হয়। সারারাত্রি বড়ই কষ্ট পাই। ঐ মেসে প্রফুল্ল চ্যাটার্জ্জী নামে এক যুবক থাকতো। সে National Call নামে ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা অফিসের লাইনো-অপারেটর। কি জানি কেন, আমার প্রতি ঐ যুবক বিশেষ আকৃষ্ট হয়। সে-ই ডাক্তার ডেকে আনে, ওষুধপত্র কিনে এনে দেয়। ডাঃ শৈলেন সেন আমাকে দেখেন। T. B. Specialist কিনা! তাই ডাঃ সেন আমার বুকে-পিঠে খুব ক'রে ষ্টেথেসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করেন! বুকের কোনো দোষ পান না। রোগ ধরা পড়ে—Rheumatic fever এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্রও দেয়া হয়। কয়েকমাত্রা ওষুধেই অসুখ সেরে যায়।

দিন দুই পরে একটু সুস্থ হ'য়ে যাই ডাঃ সুধীন সেনের সঙ্গে দেখা ক'রতে। ইনি দিল্লীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো Pathologist ও Bactriologist—এ'র কথা প্রায়ই গোপালদা'র মুখে শুন্‌তে পেতাম। ইনি এক আপনভোলা মানুষ। তাঁর লেবরীটরিতে নানারকমের লোকের আনাগোনা দেখ্‌লাম। অভিনয়-সঙ্গীতাদির দিকে এঁর প্রচণ্ড ঝোঁক। সুতরাং ঐ তত্ত্বের লোক প্রায়ই আস্‌তো ওঁর কাছে। গোপালদার খাতিরে আমার সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে আলাপ করেন বটে, কিন্তু যে ছবিটি ওঁর সম্বন্ধে আমার সাম্‌নে ধরা হ'য়েছিলো তার সঙ্গে বাস্তবের খুব বেশী সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাইনে। হয়তো সেটার পরিচয়ও

পাওয়া যেতো যদি আরো-কয়েকবার মেলামেশার সুযোগ ঘ'টতো।

চোখের অসুখের জন্য এবারকার মতো আর বেশী ঘোরাঘুরি করা সঙ্গত মনে ক'রলাম না। সম্রাট শাহ্‌জাহান্‌-নির্ম্মিত বিরাট জুম্মা মস্‌জিদ দেখে এসেই দেখাশুনার কাজ শেষ করি। দু'একদিন পরেই জয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করি। প্রত্যাবর্ত্তনের পথেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হই। জয়পুরে ফিরে গিয়ে জ্বরটা যায়, কিন্তু ভীষণবেগে বাত আক্রমন করে। এই বাতে দেড়মাসকাল শয্যাশায়ী থাকি। স্থানীয় চিকিৎসকেরা ব্যাধির কিছুই উপশম ক'রতে পারেন না। শেষটায় 'ঝর্‌রা' লাগানো হয়। এই 'ঝর্‌রা' হ'লো আমাদের দেশের চাঁদসীর ডাক্তারের মতো। আট-দশদিন ধ'রে এই ওষুধ ব্যবহার করায় ব্যাধির অবসান হয়।

* * * *

কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত নবগৌরবাবু ওরফে মাষ্টারমশাই আমাকে ধ'রে বসেন, ব্যাবসা ক'রতে হবে! ইনি জয়পুর বাঙালী সমাজে 'মাষ্টারমশাই' ব'লেই সুপরিচিত। পূর্ব্বে ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কোনোকারণে ঐ পদত্যাগ ক'রে জয়পুরে আসেন ব্যাবসার সঙ্কল্প নিয়ে, কিন্তু ব্যাবসার বদলে তাঁকে প্রাইভেট টিউসনি ক'রেই আয়-উপার্জ্জন ক'রতে হয়। সেই থেকে ইনি 'মাষ্টারমশাই'। ইনি ব'ল্‌লেন, উত্তর ভারতে দিল্লীই সবচেয়ে বড়ো জায়গা সুতরাং ব্যাবসার প্রশস্ত ক্ষেত্র। তাই প্রস্তাব করেন দিল্লীতে গিয়ে ব্যাবসা ক'রতে হবে, মূলধন তাঁরই। আমি বরাবরই অর্থহীন, অথচ ব্যাবসার বাতিকটা পুরাদস্তরই আছে। তাই ব্যাবসার সুযোগ যখনি এসেছে তখনি পূর্ব্বাপর চিন্তা না ক'রে সম্মত হ'য়ে গেছি! এবারো তাই মাষ্টারমশাইয়ের প্রস্তাবে আমাকে

রাজী হ'তে হ'লো। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি একটা ভালো দিন দেখে মাষ্টারমশাই ও আমি রাত্রের গাড়ীতে দিল্লী ব'লে রওনা হই। সটান গিয়ে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই বেঙ্গলী মেসে গিয়ে উঠি। বড়োদিনের ছুটি! তাই ঐ সময় মেসে বহুলোকের সমাগম। খাটিয়া বিহনে মেঝেতেই শয্যা রচনা ক'রে আমরা দুজনায় রাত্রি কাটিয়ে দিই। পরদিন সকালে উঠে দিল্লী চকে যাই। এ-বাজার, সে-বাজার ঘুরি! তখনো স্থির হয়নি কোন্ ব্যাবসার পত্তন করা যেতে পারে। মুদীখানার দিকে মাষ্টারমশাইয়ের ঝোঁক! সুতরাং সেই লাইনেই চেষ্টা ক'রতে হবে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু মুস্কিল হ'লো—যখন মেসের ম্যানেজার বাবু জানিয়ে দিলেন যে আমাদের স্থান ওখানে হবে না, কারণ মেস পূর্ব্বেই ভর্‌তি হ'য়ে আছে। কি করা যায়? আরো দু'একটি মেস দেখা হয়, কিন্তু সীট্ মিল্‌লো না। মাষ্টারমশাই একটু হিসেবী লোক! তবু খরচা ক'রতে তিনি গররাজী নন! মেসের কোনো সন্ধান না পেয়ে আমরা চেষ্টায় থাকি কোনো একটা ছোটো বাড়ী বা একটা কুঠ্‌রী যদি ভাড়া পাওয়া যায়! যদি তা' পাওয়া যায় তবে একটি 'বয়' রেখে কোনো-প্রকারে কাজ চলিয়ে নেয়া যাবে!

একটা ছোটো বাড়ীর সন্ধানও পাই, কিন্তু ইত্যবসরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে যায় এক মহাপুরুষের দর্শন। ইনি যথার্থই 'মহাপুরুষ'। যে বাড়ীতে বেঙ্গলী মেস তারই নীচের তলায় রাস্তার ধারে একটি অতি-ক্ষুদ্র কুঠ্‌রীতে ইনি একটি মুদীখানা খুলে ব'সে আছেন। পঞ্চাশ টাকা মূলধনে তাঁর মুদীখানার পত্তন! আমাদের সঙ্কল্পের কথা অবগত হ'য়ে তিনি উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন। বলেন, "কুচ্-পরোয়া নেই দাদা! থাক্‌বার-খাবার জন্য আপনাদের কোনো চিন্তা নেই! আমার ওখানেই আপনাদের থাকা-খাওয়া চ'ল্‌বে। ঘরের ভাড়া

তো লাগবেই না। খাবার জন্য অতি সামান্য খরচা লাগবে। তারপর ব্যাবসার কথা! কোনো চিন্তা নেই! এ শর্ম্মা থাক্‌লে কোনো কিছু ভাবতে হবে না দাদা! আজই আপনাদের বিছানাপত্র নিয়ে মেস ছেড়ে আমার ওখানে গিয়ে উঠুন।" আমরা তো হাতে স্বর্গ পেলাম! সেই দিনই সন্ধ্যায় আমরা মহাপুরুষের আশ্রমে গিয়ে উঠি। এঁর আসল নাম মনীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী। প্রথম দফায় যখন উক্ত আশ্রমে উপস্থিত হই তখন ন্যাকার হবার উপক্রম হয়। চারিদিক থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ ঠেলে উঠ্‌তে থাকে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর ক'রে উঠ্‌তে পারি নে কোত্থেকে এই দুর্গন্ধ আস্‌ছে আর কিসের এই দুর্গন্ধ! গাঙ্গুলী মশাই ওরফে 'মহাপুরুষ' আলো জাল্‌লে দেখি, রাশি রাশি আবর্জ্জনা সেই পুরাতন জীর্ণ কুঠুরীটির এদিক-ওদিক ছড়ানো র'য়েছে। আমি স্বভাবতঃই একটু পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় লোক। এই সব দেখে আমার বিতৃষ্ণা বোধ হয়। কিন্তু উপায় কি? সেই আশ্রয়ই তো আমাকে গ্রহণ ক'রতে হবে!

ঘরখানির মধ্যে তিনখানা ভাঙা খাটিয়া! একখানিতে 'মহাপুরুষের' মলিন দুর্গন্ধযুক্ত শয্যা আর দু'খানির ওপর দু'চারটে ভাঙা সুট্‌কেশ এবং কয়েকটি ভাঙা এসরাজ, সেতার ও বাঁয়া-তব্‌লা প'ড়ে আছে! বুঝলাম, গান-বাজনার সখ আছে! তাঁর শ্রীমুখ-নিসৃত বাণী থেকে প্রকাশ পায় তিনি একজন ওস্তাদ। তাঁর গুরুভাই যিনি তাঁরই বাড়ীতে ঐ ঘরটা তাঁকে অম্‌নি ছেড়ে দেয়া হ'য়েছে। গুরুভাইটি লক্ষপতি, দিল্লী শহরের ওপর বহু বাড়ীর মালিক। সেই ক্ষুদ্র দোকান ঘরটিও উক্ত গুরুভাইয়ের দেয়া। এ ছাড়া, মূলধন পঞ্চাশ টাকাও তিনিই দিয়েছেন। মোটের ওপর, সঙ্গীতের গুণপনার জন্যই হোক অথবা বড়ো-লোকের মোসাহেবির জন্যই হোক, ইনি এই অনুগ্রহের অধিকারী হন। এঁকে আমি 'মহাপুরুষ' আখ্যায়

অভিহিত ক'রেছি—তার সুসঙ্গত কারণও আছে। আমরা জানি, মহাপুরুষেরা কোনো-না-কোনো যোগে সিদ্ধি লাভ ক'রে থাকেন। ইনি একাধারে তাম্রকূট, গঞ্জিকা, মদ্য, চরস, চণ্ডু, ভাঙ্, গুলী, আফিং—এই অষ্ট সিদ্ধিযোগে সিদ্ধপুরুষ। এসবই মহাপুরুষের আত্মচরিত বর্ণনায় প্রকাশ পায়। এ ছাড়া, আর-একটি কথা যা' তিনি ব'ল্‌লেন তা' অপর কোনো মহাপুরুষের চরিত-কথায় পাওয়া যায় না! ইনি সগৌরবে প্রকাশ ক'রলেন, আপন গর্ভধারিণীকে ইনি ঘৃণা ক'রতেন এবং তাঁর স্বর্গারোহণের সংবাদে একটুও বিচলিত হন নি বা তাঁর শ্রাদ্ধ-তর্পনাদি করেন নি—যথারীতি মাছ-মাংস আহার ক'রেছেন, পান-টান যা' ক'রবার সবই ক'রেছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বয়স তখন এঁর সাতান্ন বৎসর। এঁর নাকি বিয়েও হ'য়েছিলো এবং একটি কন্যা সন্তানও জন্মগ্রহণ ক'রেছিলো। কন্যাটির জন্মের পরেই স্ত্রী মারা যায় এবং কন্যাটি তার মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হ'তে থাকে। তার পরেই ইনি দেশ-ছাড়া! বহুকাল পরে শুন্‌তে পান, মেয়েটির বিয়ে হ'য়েছে, ছেলেপিলেও হ'য়েছে। একবার নাকি হঠাৎ স্নেহ উথ্‌লে ওঠায় মেয়েকে দেখ্‌তে যান। তারপরে ফিরে এসে আর বাংলায় ফেরেন নি। ধ'রতে গেলে সংসারে তাঁর কেউই নেই! কি জানি কেন লোকটা বাঙালী হ'য়েও বাঙালীর ওপর, বাঙালী জাতির ওপর, বাঙালী সমাজের উপর বিষম চটা! প্রথমে দিল্লীতে এসে নাকি অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ বাঙালীর কাছে ঘোরাঘুরি করেন সমাজে একটু পরিচিত হবার জন্য। তাঁরা সকলেই ওঁকে ভাগিয়ে দেন! পরে অ-বাঙালীদের সাহায্যেই উনি সুপরিচিত হন! অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজা, নবাব প্রভৃতির দরবারে সঙ্গীতে যথেষ্ট কৃতিত্বও অর্জ্জন করেন! অর্থাগমও নাকি যথেষ্ট হয়, কিন্তু কিছুই রাখেন নি! যাহোক, এবম্‌কথিত সঙ্গীত-

কলাবিশারদ ও অষ্টসিদ্ধিযোগসম্পন্ন সেই মহাপুরুষের আশ্রমে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়। যে সময়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, সে সময়ে তিনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শুধু ভাঙ্‌ আর গুলী এই দু'টিতেই জীবনের শেষ দিকটা উৎসর্গ ক'রেছেন। ভাত প্রায়ই খান না। খাওয়ার মধ্যে দু'বেলা একটু ক'রে দুধ খান আর রাতে পশ্চিমদেশীয় প্রথায় নিজে রুটি তৈরী ক'রে খান।

মাষ্টারমশাইয়ের টিউসনির তাগিদে আর থাকবার উপায় ছিলো না। আমাকে দিল্লীর 'বাজার স্টাডি' ক'রবার জন্য একটি টাকা হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে উক্ত মহাপুরুষের আশ্রমে রেখে জয়পুরে ফিরে যান। যাবার সময় আশ্বাস দিয়ে যান, জয়পুরে পৌছেই টাকা পাঠাবেন। কয়েকদিন কেটে যায়, তথাপি টাকাও আসে না, চিঠিও পাইনে! পর পর দু'খানা চিঠি লিখেও জবাব পাইনে! এই দেখে 'মহাপুরুষের' মেজাজ যায় বিগ্‌ড়ে। তিনি তো যা' তা' ব'লতে সুরু ক'রলেন। এতে আমি খুবই অপ্রতিভ হই। প্রথম প্রথম মাষ্টারমশাইয়ের কথামতো 'বয়' খুঁজতে লেগে গিয়েছিলাম, কিন্তু দু'খানা চিঠির জবাব না পেয়ে আমি একটু ভীত হ'য়েই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করি। রান্না-বান্না ক'রে খাওয়া আমার পোষায় না। ব'লতে কি, ও তত্ত্বটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিলো। মাষ্টারমশাই চ'লে যাবার পর যে-কয়দিন আমাকে দিল্লীতে থাকতে হয় সে-কয়টা দিন যে কিভাবে কাটে তা' এক অন্তর্যামীই জানেন। 'মহাপুরুষের' মেজাজ অমনিই রুক্ষ, তারপর এই ব্যাপারে তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠেন। 'বাজার স্টাডি' আমার মাথায় উঠে যায়। আমার তখন 'ত্রাহি মাং মধুসূদন' অবস্থা! কি ক'রে ফিরে যাই—এ'ই তখন আমার একমাত্র চিন্তা। বেঙ্গলী মেসের

সেই প্রফুল্ল আমাকে কিছু ধার দেয়, তাই অবলম্বন ক'রে কোনো রকমে জয়পুরে ফিরে যাই।

আমার এই 'বাজার স্টাডির' অভিজ্ঞতার কথা জীবনে কখনো ভুল হবে না। কিন্তু খুবই বিস্ময় বোধ ক'রলাম, যখন মাষ্টারমশাই আমাকে দেখে একটু অনুযোগের সুরে ব'ল্‌লেন, "আপনি বড়ো অসহিষ্ণু! এ'রই মধ্যে ফিরে এলেন?" জবাবে আমার ব'লবার কিছু ছিলো না। তাই শুধু একটু হাস্‌লাম। মনে মনে ব'ল্‌লাম—দোষ মাষ্টারমশাইয়েরো নয়, আমারো নয়, দোষ আমার ব্যাবসা-বাতিকের! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার! আমি হ'লাম তাই। আমার পয়সা নেই, কড়ি নেই, সহায় নেই, সম্বল নেই, অথচ বাতিকটা খুবই আছে! এটা কি হাস্যকর ব্যাপার নয়? পরের কথায় নেচে ওঠাকে মানসিক ব্যাধি বলা যেতে পারে। আমি সেইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত! ব্যাবসার স্বপ্ন দেখ্‌লাম অনেক, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করা হ'লো না! সর্ব্বত্রই দেখা যায়, কারোও মানসিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ একটু মজা লুটতে চায়! অবশ্য মাষ্টারমশাই সে শ্রেণীর লোক নন। তাঁর উদ্দেশ্য সত্যিই সাধু ছিলো, আমারই গ্রহ দোষে সব ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

এবারে দিল্লীতে গিয়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের সন্ধান ক'রবার সুযোগ ঘ'টে ওঠে নি। বাসনা খুবই প্রবল ছিলো, দৈহিক অবস্থাও প্রতিকূলে ছিলো না, শুধু 'বাজার স্টাডি'র ব্যাপারে জড়িত হ'য়েই কিছু হ'লো না! সময় সময় অন্তর-দেবতাকে নিজের ব্যথা জানাতে গিয়ে বলি—'ঠাকুর, আমাকে গৃহহারা ক'রলে, সুখ-শান্তি নিলে, অথচ এই অহেতুক বাতিকটা রেখে দিলে কেন?"

(২০)

জয়পুরে গোপালদা' বাদে অপর এক ব্যক্তির সঙ্গেও আমার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সে হ'লো বর্ম্মাশেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—নাম ধ্রুবকিশোর দে। লোকটি খুব উদার ও সামাজিক। সে আমাকে আপন অগ্রজের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি ক'রতো। যে-সময় সে লক্ষ্ণৌয়ে বদলী হয়, তখন আমাকে বলে সঙ্গে যেতে। আমি তার প্রস্তাবে সম্মতি দিই। জয়পুরে প্রায় বছর দুই কেটে যায়! আর ভালো লাগে না! নতুন কোনো স্থানে যাবার জন্য প্রাণ ছট্ফট্ ক'রছিলো। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আমার মেয়েকে নিয়ে ধ্রুবকিশোরের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি। রাত্রির গাড়ীতে রওনা হ'য়ে সকালে আগ্রায় পৌছি। মহারাজা হোটেলে গিয়ে উঠি। স্নানাহার সেরে আমরা প্রথমেই যাই তাজমহল দেখ্তে। যমুনাতীরে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল! কিন্তু যমুনা আর সে যমুনা নেই! এখন বদ্ধজলের একটা রেখামাত্র! তাজমহল থেকে অনেকটা দূর! আগ্রা শহরটা কিন্তু বড়োই নোংরা! তাই দূর থেকে তাজমহল দেখে মনে হয়—গোবরে পদ্ম ফুল ফুটে আছে। সম্রাট শাহ্জাহানের অমর কীর্ত্তি এই তাজমহল। পৃথিবীর তাৎকালিক সপ্তমাশ্চর্য্যের অন্যতম! আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এই তাজমহলের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু খবর রাখেন।

সম্রাট শাহ্জাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের সমাধিমন্দির এই বিরাট শ্বেত সৌধ—প্রেমের জলন্ত নিদর্শন, প্রেমনিষ্ঠার মূর্ত্ত প্রতীক! তাজমহল দেখ্তে গিয়ে সত্যিই মনে হয়, এ'র আশ-পাশ সবটাই

যেন প্রেম-সৌরভে আমোদিত। এ'র পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা এমনই যে এখান থেকে ফিরে যেতে মন চায় না। প্রেমের জ্যোতি যেন সর্ব্বত্র বিস্ফুরিত! তাজমহলের এধার-ওধার দেখ্তে দেখ্তে ক্ষণিকের জন্য আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। মনে মনে বলি—"সম্রাট, তোমার ছিলো অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, অপ্রতিহত ক্ষমতা, তাই তুমি অগণিত অর্থব্যয়ে এই বিরাট শ্বেত মর্ম্মরের সৌধ নির্ম্মাণ ক'রে সমগ্র জগতের কাছে তোমার পত্নী-প্রেমের গৌরব বিঘোষিত ক'রলে! কিন্তু তোমার এই কীর্ত্তি যে-সকল পর্য্যটক দূরদূরান্ত থেকে দেখ্তে আসেন তাঁদের মধ্যে হয়তো অনেকে যথার্থ প্রেমিক, স্বর্গতা সহধর্ম্মিনীর প্রতি তাঁদের প্রেমনিষ্ঠা যথেষ্টই আছে, অথচ তা' জগৎকে দেখাবার সামর্থ্য তাঁদের নেই। পত্নী-প্রেম মধুর ও পবিত্র। এ বস্তুটি হৃদয়ের অন্তস্থলে সযত্নে রেখে অনুভব ক'রতে হয়। ব্যক্ত করায় এ'র মাধুর্য্য বরং ক্ষুন্নই হয়। কিন্তু হে সম্রাট, তোমার সবই শোভা পায়। অবশ্য এই সমাধি-সৌধ নির্ম্মাণ ক'রে তুমি জগৎকে দেখিয়ে গেছো ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য আর দিয়ে গেছো মোগলজাতির মার্জ্জিত রুচির পরিচয়। একথা সকলেই স্বীকার ক'রবে। যতোদিন তাজমহলের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাক্‌বে, ততোদিন তোমার কীর্ত্তি-কাহিনীও বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সমুজ্জল হ'য়ে বিরাজ ক'রবে।"

তাজমহলের চারিদিকে ঘুরে দেখি আর এই সব মনে মনে আলোচনা করি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই জুতো খুলতে হয়। সাম্‌নেই দুইটি কবর দেখ্তে পাই। আমাদের জানিয়ে দেয়া হয়—একটি মমতাজের, অপরটি শাহ্জাহানের। দর্শকদের মধ্যে কতো যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা র'য়েছেন! কেউ বা তাজমহল হর্ম্ম্যপ্রাঙ্গনে, কেউ বা সাম্‌নের লোহিত মৎস্যপরিশোভিত ক্ষুদ্র জলাশয়-

গুলির ধারে, কেউ বা পার্শ্বস্থিত উদ্যানে হৃষ্টচিত্তে ভ্রমণে রত। তাজমহলের অভ্যন্তরভাগ তথনো আমাদের দেখা শেষ হয় নি। আমার মেয়ের আনন্দ যেন ধরে না! দেশে গিয়ে সমবয়স্কাদের কাছে তাজমহলের গল্প সে ব'ল্‌তে পারবে—এই তার আনন্দের হেতু! সে আমাকে বলে—"আচ্ছা বাবা, আমার ইতিহাসে তাজমহলের যে ছবি আছে এ তাজমহল তো তার মতো নয়! বলনা, বাবা এমন কেন হয়?" আমি বলি,—"যে-হেতু সেটা ছবি আর এটা আসল!" মেয়ে হো-হো ক'রে হেসে ওঠে!

আমরা দেখে-শুনে নেবে আস্‌বো এমন সময় আমাদের সঙ্গের গাইড্‌টি বলে, "বাবুজী, অস্‌লী যো কবর হৈ বহ্‌ তো অভ্‌তক্‌ দেখাই নহী! আইয়ে বহ্‌ দেখ্‌ বাইয়ে।" ভাবি সে আবার কি? এই তো সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর সমাধি দেখা হ'লো তবে যেটা দেখলাম সেটা কি নকল? যা'হোক, গাইডের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নাবি। দেখি ঘোর অন্ধকার! লণ্ঠনের আলো জ্বালা আছে! সেখানে ব'সে আছেন সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট কয়েকজন মুসলমান সাধু—ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে রত। একব্যক্তি আলো ধ'রে সমাধির চারিপাশে আমাদের দেখাতে এগিয়ে এলেন। ব'ল্‌লেন, পূর্ব্বে যে সকল মণি-মুক্তা, হীরা-জহরৎ সমাধিগাত্রে খচিত ছিলো তাদেরই দীপ্তিতে সব দীপ্যমান থাকৃতো, লণ্ঠনের আলোর প্রয়োজন হ'তো না! বহুমূল্য পাথরগুলি যে খুঁদে উঠিয়ে নেয়া হ'য়েছে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন র'য়েছে। যারা ঐ সব নিয়েছে তাদের মতো দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-তস্কর জগতে বিরল! দেখা শেষ হ'লে সমাধিস্থলে কিছু পয়সা দিয়ে আমরা প্রস্থান করি। ফটক পেরিয়ে বাইরে এসে টোঙায় উঠি।

তাজমহল থেকে আমরা বরাবর আগ্রা ফোর্টে এসে উপস্থিত হই। দিল্লীর মতো এখানেও টিকেট কিনে ফোর্টে ঢুকতে হয়। প্রথম ফটকটি পেরিয়েই প্রকাণ্ড এক চত্বরে পৌছি। চত্বরটি দরবার-হলের সাম্‌নে। এখানকার-দরবার হল, সিস্‌মহল, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম প্রভৃতি সবই অম্বর-রাজপ্রাসাদেরই মতো। শোনা যায়, আগ্রা ও দিল্লীর অনুকরণেই অম্বরের রাজপ্রাসাদাভ্যন্তরস্থ মহলগুলি তৈরী। সম্রাট আকবরের সময়েই লালপাথরের এই আগ্রা ফোর্ট নির্ম্মিত হয়। সেকালে দিল্লী অপেক্ষাও আগ্রার প্রাধান্য বেশী ছিলো। হিন্দু মহিষীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিলো। তাঁদের স্নানের ঘাট, তাঁদের পূজোর ঘর, তাঁদের আহারের বন্দোবস্ত—সবটায়ই হিন্দুয়ানী বজায় ছিলো। যোধাবাঈয়ের স্নানের ঘাটটি দেখে তাই মনে হ'লো। এক বৃদ্ধ মুসলমান আমাদের সব দেখিয়ে দিলেন। আগ্রা ফোর্টে কতো যে গুপ্ত কুঠুরী আছে তার ইয়ত্তা নেই। সম্রাজ্ঞীদের স্নানাগার, বিশ্রামাগার সবই দেখ্‌লাম। এখনকার মতো সেকালে জলের কল আবিষ্কৃত হয় নি অথবা Drainage System-এর প্রচলনও হয় নি। কিন্তু তবু জল-নিষ্কাশনের যে সুবন্দোবস্ত তাঁরা ক'রেছিলেন সেটা প্রশংসারই যোগ্য। সম্রাট-সম্রাজ্ঞীরা গোলাপজলে স্নান ক'রতেন! মোগল আমলের কীর্ত্তিকলাপ দেখে মনে হয়, সত্যি এঁদের মতো ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ অপর কোনো শাসনকালেই কেউ করেন নি। সেই বৃদ্ধ শেষটায় ফোর্টের এক প্রান্তে আমাদের নিয়ে যায়। সেখানে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। সেই প্রকোষ্ঠে নাকি বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জাহান বন্দীজীবন যাপন ক'রেছেন। তাঁর পরিচর্য্যার ভার ছিলো তাঁর প্রিয়তমা কন্যা জাহানারার ওপর। সম্রাটের উপাসনার জন্য নিকটেই এক মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হয়। সে-সব দেখে তিনশো বছর পূর্ব্বের একটা ছবি মনে ভেসে ওঠে!

একদিন সম্রাটের নাকি বাসনা হয়, তিনি তাজমহল দেখ্‌বেন। জাহানারা বৃদ্ধ পিতাকে এক খোলা বারান্দায় নিয়ে আসেন। সেখানে একটি প্রাচীর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর বসানো ছিল। মেয়েরা কপালে যে টিপ্‌ ব্যবহার করে ঐ পাথরগুলি ঠিক সেই আকারের। সেই সকল পাথরের মধ্যে একটি পাথরের সাম্‌নে বৃদ্ধ পঙ্গু সম্রাটকে ধ'রে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। তার মধ্যে তিনি তাজমহল দেখেই হঠাৎ প'ড়ে যান আর তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ'র সত্যাসত্য জানি নে। তবে গাইড্‌দের মুখে এই গল্প শুন্‌তে পাওয়া যায়! আমরাও একে-একে ঐ প্রাচীরগাত্রস্থ একটি ক্ষুদ্র পাথরের মধ্যে ওখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরস্থিত তাজমহলের সমগ্র অবয়বটি দেখ্‌তে পাই! এই ব্যাপারটা দেখে আমাদের বিস্ময় ও পুলকের পরিসীমা রইলো না! এখান থেকেও অমূল্য রত্নরাজি সেই সকল দস্যু-তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হ'য়েছে! যাহোক, এইসব দেখেশুনে মনে হ'লো, মোগল আমলেই রাজৈশ্বর্য্যের পূর্ণ পরিণতি হ'য়েছিলো। কিন্তু কালপ্রবাহে সবই ওলট পালট হ'য়ে যায়! এখন যেটুকু মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তাকে শুধু ইট-পাথরের কঙ্কাল বলা চলে! কোথায় সে মণিমুক্তাহীরাজহরৎ, কোথায় সে অতুল ঐশ্বর্য্য, কোথায় সে অননুকরনীয় শিল্পসম্ভার? সর্ব্বগ্রাসী কাল তাদের হরণ ক'রেছে!

গাইড্‌কে ও টোঙাওয়ালাকে বিদায় ক'রে দিয়ে যথম হোটেলে ফিরি তখন বেলা অনুমান দেড়টা। বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটের সময় হোটেলে এসে উপস্থিত হন ধ্রুবকিশোরের কয়েকজন অফিসের বন্ধু। তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের সকলকে নিয়ে গেলেন এক রেস্তোঁরায়। সেখানে বিলেতী কায়দায় আহারাদির ব্যবস্থা হয়। এ সব আমার বা আমার মেয়ের পছন্দসই নয়। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে

তাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগদান ক'রতে হয়। লক্ষ্ণৌয়ের গাড়ী ছিলো সন্ধ্যার পরে। সুতরাং রেস্তোঁরা থেকে ফিরে আমরা আর হোটেলে বেশী দেরী ক'রলাম না। তখনই হোটেলের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুট্‌ দিই। ষ্টেশনে যখন এসে পৌছি তখন দেখি, গাড়ী ছাড়তে মাত্র দু'-চার মিনিট বাকী আছে! ধ্রুবকিশোরের বন্ধুরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসেছিলেন। তাঁরাই টিকেট কেনা, মালপত্র গাড়ীতে উঠিয়ে দেয়া—সব কাজই তাড়াতাড়ি সেরে দেন। আমরাও গাড়ীতে গিয়ে উঠি আর গাড়ীও ছেড়ে দেয়।

গাড়ীখানা বরাবর লক্ষ্ণৌ যাবে! পরদিন ভোরে গিয়ে সেখানে পৌছবে! তিনখানা বেঞ্চে আমরা তিনটে বিছানা পেতে নিই। কিছুদূর যাবার পরই সকলে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত্রি দু'টোয় যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখি কানপুরে এসে গেছি! সেখানে ঘণ্টা তিনেক গরমে প'চ্‌তে হয়। মাঝে আমার মেয়ের খুব তৃষ্ণা পায়। ধ্রুবকিশোর গিয়ে কল থেকে জল নিয়ে আসে। সময় যেন আর কাটে না! বহুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়বার সিটি পড়ে। তখন ভোরের অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে! কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে। যুক্তপ্রদেশে বহু ছোটো ছোটো জিলা শহর আছে। কানপুর-লক্ষ্ণৌয়ের মাঝামাঝি একটি জিলা শহর আছে। সেখানে যখন গাড়ী এসে থামে তখন সকাল হ'য়ে গেছে, মাঠে চাষীদের কাজ ক'রতে দেখা যাচ্ছে! এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা লক্ষ্ণৌয়ের কাছাকাছি এসে পৌছে গেছি। লক্ষ্ণৌ একটা বিরাট জংসন। ষ্টেশনটি সুদৃশ্য। আমার মনে হয়, ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনে এই রকম বিরাট ষ্টেশন খুব কমই আছে। প্লাটফরমে গিয়ে গাড়ী ঢুকতেই কুলীদের দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি সুরু হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে নানা হোটেলের প্রতিনিধিরা

এসে তাদের কার্ড দেখিয়ে লেক্চার জুড়ে দেয়। ধ্রুবকিশোর আগে যখন লক্ষ্ণৌয়ে আস্তো তখন বেঙ্গলী হোটেলেই উঠ্তো। সুতরাং এবারো সেই হোটেলেই উঠ্বার ইচ্ছে। হোটেলটি ষ্টেশনের সামনেই! কুলীর মাথায় মালপত্র দিয়ে ঐটুকু পথ আমরা হেঁটেই চলি।

ষ্টেশন থেকে লক্ষ্ণৌ শহরের বহির্দৃশ্যটা অতি মনোরম ব'লেই মনে হয়। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। বেঙ্গলী হোটেলের প্রবেশ-দ্বারেই দেখি, একখানি টেবিলের ওপর খাতাপত্র বিছানো র'য়েছে আর তার সাম্নে চেয়ারে ব'সে ম্যানেজারবাবু কি যেন লিখ্ছেন! আমরা যেতেই তেতলায় একখানা ঘর আমাদের জন্য খুলে দেয়া হয়। ঘরখানির মধ্যে কয়েকখানা গদি-আঁটা চেয়ার, সোফা, কৌচ প্রভৃতি আছে। ফ্যান, লাইট—সবই আছে। পাশেই বাথরুম ও পায়খানা! ক'ল্কাতার মতো ড্রেন পায়খানা! প্রথমে আমার মেয়ে, তারপর আমরা দু'জন প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সেরে নিই। ওপরেই আমাদের খাবার দিয়ে যায়। আহার্য্যগুলি সুপাচ্য ও সুস্বাদু। বেশ পরিতোষ সহকারেই আহার করি। আহারাদির পর অল্পক্ষণের জন্য একটু ঘুমিয়ে নিই—দু'দিনের পথশ্রান্তির কতোকটা লাঘব হয়। তারপর রোদ প'ড়তেই একখানা টোঙা ভাড়া ক'রে রিসলদারবাগ পার্কে ধ্রুবকিশোরের পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাসায় যাই। বাড়ীর ভেতরে আমার মেয়ে যেতেই ব্রজেনবাবুর স্ত্রী তাকে স্নেহাদরে আপ্যায়িত করেন। আমরা এসে বেঙ্গলী হোটেলে উঠেছি জেনে ব্রজেনবাবু অনুযোগ করেন। ব্রজেনবাবু লোকটি নিতান্ত মন্দ নন। তিনি হিন্দু মিউচুয়াল এসিওরেন্সের তরফ থেকে সমগ্র যুক্ত-প্রদেশের চীফ্ এজেন্ট নিযুক্ত হ'য়ে লক্ষ্ণৌয়ে সপরিবারে বসবাস করেন। ভদ্রলোকটি খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ, মস্তকটি কেশবিরল কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ঘনকৃষ্ণ

লোমে আবৃত! সর্ব্বদাই প্রায় খালি-গায়ে থাকেন। বাইরে থেকে 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' ব'লেই মনে হয়। তবে তিনি যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আহারাদি বিষয়ে তিনি নিরামিষাশী। একখানা মোটরগাড়ীও তাঁর আছে। তবে ব'ল্তে গেলে সেটা একটা show, কেন না নিতান্ত কোনো উচ্চপদস্থ, অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কাছে তাঁর স্বার্থসংক্রান্ত ব্যাপারে যাবার দরকার হ'লেই শুধু গাড়ীখানি গ্যারেজ থেকে বা'র করা হয়। অবশ্য ব্যবসায়ীকে এই রকম হিসেব ক'রেই চ'ল্তে হয়! বেশ-ভূষার পারিপাট্য তাঁর আদৌ নেই। তিনি বেশ সামাজিক ও আপ্যায়নগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রবাসজীবনেও তাঁর আতিথেয়তা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য।

ব্রজেনবাবুর বাড়ীর পাশেই একটি বৌদ্ধমন্দির আছে। সেই মন্দিরের যিনি আচার্য্য তিনি একজন বাঙালী। তিনি চিরকুমার, সন্ন্যাসী। পূর্ব্বজীবনে তিনি বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ মন্দির-সংলগ্ন একটি ছোটো বাড়ী আছে। ব্রজেনবাবু আচার্য্য মহারাজকে ব'লে ঐ বাড়ীটি আমাদের জন্য ঠিক ক'রে দেন। ধ্রুবকিশোর জয়পুর থেকে আসবার পূর্ব্বেই তার পরিবার দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। কেন না ঐ সময় প্রায়ই তাকে রিলিভিংয়ে কাজ ক'রতে হয়। লক্ষ্ণৌ তার হেড্কোয়ার্টারস্ হ'লেও নানাস্থানে তাকে ঘুরতে হ'তো। আমার মেয়ে ও আমি ঐ বাড়ীতে রইলাম। মেয়ে প্রায় সর্ব্বদাই ব্রজেনবাবুর বাড়ীতে থাকে। ঐ বাড়ীর মেয়েরা ওকে খুব ভালোবাসে। এ বাড়ীর রান্নাঘর আর ও বাড়ীর রান্নাঘর একেবারে পাশাপাশি। তাই রান্না ক'রবার সময় কোনোপ্রকার অসুবিধে হ'লেই আমার মেয়ে তার 'রাণীদি' বা 'কমলাদি'র কাছে জিজ্ঞেস্ ক'রে নেয়। এই রকম ক'রে কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই বেশ রান্না শিখে ফেলে। অথচ লক্ষ্ণৌয়ে

এসেই রান্নায় তার হাতেখড়ি! মাঝে মাঝে ধ্রুবকিশোর লক্ষ্ণৌয়ে এসে দু'চার দিন থাকতো, আবার কোথাও রিলিভিংয়ে যেতো, আবার আসতো—এই রকম চ'লছিলো।

এদিকে আমি লক্ষ্ণৌয়ের Pioneer কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে ঢুকবার চেষ্টা করি। কে এক মিঃ ঘোষ ছিলেন উক্ত বিভাগের কর্ণধার। তিনি বলেন, "একটা বড়ো অসুবিধে হ'চ্ছে, আপনি ছিলেন সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, দৈনিক পত্রিকার অভিজ্ঞতা আপনার নেই! তা' ছাড়া, এ কাগজখানির আভ্যন্তরীন অবস্থা শোচনীয়, কোন্ সময় থাকে আর কোন্ সময় থাকে না—এই রকমের অবস্থা!" তাঁর মিষ্ট কথায় তুষ্ট হ'য়ে আমাকে ফিরে আসতে হয়! আর কোনোও চেষ্টা ওখানে করি নি। বেশ চিন্তা ক'রে দেখলাম, আমার উপার্জ্জনক্ষেত্র ক'লকাতা ছাড়া আর কোনো স্থান নয়। তাই শেষ সিদ্ধান্ত ক'রলাম, আর বৃথা কালক্ষেপ ক'রে ফল নেই, ক'লকাতায়ই ফেরা যাক্। তবে যাবার আগে লক্ষ্ণৌয়ের দর্শনীয় যা কিছু দেখে যেতে হবে!

(২১)

লোকে বলে—Lucknow is a city of parks and lawns. বাস্তবিক এতো বেশী পার্ক বোধ হয় ভারতের অপর কোনো শহরে নেই। শহরটি সুরম্য অট্টালিকাপূর্ণ। রাস্তাঘাটগুলি অতি সুশ্রী। বসবাসের পক্ষে অতি মনোরম স্থান। বাড়ীভাড়া অন্যান্য শহরের তুলনায় অল্পই ব'লতে হবে। খাবার-দাবার, তরী-তরকারী খুবই সস্তা! আর-একটা সুবিধে এই যে নিজের ঘরে ব'সেই সব কিছু পাওয়া যায়। কানপুর-এলাহাবাদের মতো হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা এখানে নেই! বরং মুসলমানদেরই 'সিয়া-সুন্নী' সম্প্রদায় দু'টির মধ্যে প্রায়ই গোলযোগ বাধতে দেখা যায়। লক্ষ্ণৌয়ে দেখবার মতো আছে—জু, কাউন্সিল হাউস্, লাট-প্রাসাদ, মেডিক্যাল কলেজ, ইউনিভারসিটী, রেলওয়ে ষ্টেশন ইত্যাদি। আর ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধে বলতে হ'লে ইমামবাড়া ও রেসিডেন্সীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। ওখানকার 'জু' দেখা হয় দু'দিন। একদিন আমি একা দেখে আসি, আর-একদিন আমার মেয়েকে নিয়ে দেখতে যাই। সেদিন ব্রজেনবাবু তাঁর গাড়ীতে ক'রে আমাদের নিয়ে যান। সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই 'জু'টি তৈরী! ক'লকাতার 'জু' খুব বড়ো, কিন্তু এমন সুন্দর ব্যবস্থা সেখানে নেই। সিংহ ও বাঘের স্থান দু'টি অতি চমৎকার। সিংহের স্থানটিতে কৃত্রিম পাহাড় আর বাঘের স্থানটিতে কৃত্রিম বন! নানাশ্রেণীর বানর দেখতে পাওয়া যায় এই 'জু'তে। আর একটা ব্যাপার হ'চ্ছে—এটা পার্কেরও কাজ করে। সকালে-বিকেলে লোকে এ'র মধ্যে বেড়ায় বা ব'সে বিশ্রাম করে। অবারিত দ্বার—ক'লকাতার মতো পয়সা দিয়ে ঢুকতে হয় না।

আমি চ'লে যাবো শুনে ধ্রুবকিশোর ও ব্রজেনবাবু একদিন আমাদের সকলকে নিয়ে ইমামবাড়া ও রেসিডেন্সী দেখাতে নিয়ে যায়। হুগলীর ইমামবাড়াও দেখেছি আর লক্ষ্ণৌয়ের ইমামবাড়াও দেখলাম। তফাৎ অনেক! এ এক বিরাট ব্যাপার! শোনা যায়, অযোধ্যার তৎকালীন নবাব অত্যন্ত পরদুঃখকাতর ছিলেন। বহু দীন-দুঃখী, অভাবগ্রস্ত লোককে অন্নদান ক'রবার ব্যবস্থা তিনি এক অভিনব উপায়ে করেন। ইমামবাড়ার যে বিরাট সৌধ সেটা বারবার ভেঙে ফেলে তবে শেষটায় তাঁর মনের মতো ক'রে তৈরী করান। এতে বহু লোক অনেকদিন ধ'রে কাজের মজুরী পায়। ফলে, তাদের অভাব-অনটন আর বিশেষ থাকে না। দূর থেকে মনে হয় ইমামবাড়া বেশী উঁচু নয়, বস্তুতঃ খুবই উঁচু। এতোগুলি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠ্‌তে হয় যে পা ভেঙে আসে! খানিকটা উঠেই খুব হাঁপাতে হয়। অতি কষ্টে যখন ছাদের ওপরে উঠ্‌তে সক্ষম হই তখন দিক্‌দিগন্তের দৃশ্য দেখে দুঃখকষ্টের অনেকটা লাঘব হয়! বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে আসে। শোনা যায়, ঐ অতি বিরাট ছাদটি নাকি কড়ি-বরগাহীন। ঐ ছাদের ওপর নবাবের বেগমদের লুকোচুরি খেলবার অনেকগুলি ঘুলঘুলি আছে। অনেকটা গোলকধাঁধার মতো! নীচে নেবে এসে সেকালের অনেক নিদর্শন দেখ্‌তে পাই—গালিচা, কাঁচে-প্রস্তুত আলোর ঝাড় ইত্যাদি। ওখান থেকে বেরিয়ে আসি রেসিডেন্সীতে। এই রেসিডেন্সী হ'লো ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কুঠী। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানেও ধ্বংসলীলা চলে। সেই সব ধ্বংসকীর্ত্তি সাধারণকে দেখাবার জন্য গভর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্ববিভাগ সুবন্দোবস্ত ক'রেছেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা কুঠীর অনেক ঘর তোপের মুখে উড়িয়ে দেয়—সে সব এখনো সেই ভাবেই রেখে দেয়া আছে। এই স্থানটি হ'য়েছে এখন বেড়াবার

একটা সুন্দর স্থান। গরমকালের সকালের দিকে ও সন্ধ্যার পর এখানে বহু লোক বেড়াতে আসে। স্থানটি আবার ঠিক গোমতীর ওপরেই। ওখানে একটা ব্রিজ আছে। লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটিতে যেতে হ'লে ঐ ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হয়। ঐ সব দেখে আমরা বাসার দিকে ফিরে আসি! লক্ষ্ণৌ ভারতীয় সঙ্গীত কলাবিদ্যার কেন্দ্রস্থান। ওখানে একটি সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ও সুধীজনবিদিত ভাতখণ্ডেজী। ফিরবার পথে সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদৃশ্য হর্ম্ম্য দৃষ্টিগোচর হয়। যখন বাসায় ফিরি তখন বেলা অনুমান এগারোটা হবে। অসহনীয় গরম! বাড়ীর চাকর আগেই স্নানের জল তুলে রেখেছিলো, তাই রক্ষা! নইলে কষ্টের অবধি থাক্‌তো না!

* * * *

শুনেছিলাম, আমাদের দেশস্থ প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল জোয়ারদার লক্ষ্ণৌয়ে কোনো এক কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। ক্রমে জান্‌তে পারি, তিনি ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। অধ্যাপনায় খুব সুনাম অর্জ্জন ক'রেছেন। একদিন রিসলদারবাগের দু'টি ছেলেকে সঙ্গে ক'রে তাঁর বাড়ীতে যাই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দিতে ঐ ছেলেদের বারণ করি—উদ্দেশ্য, এতোদিন পরে দেখে তিনি আমায় চিন্‌তে পারেন কিনা দেখতে চাই। বাল্যকালে পাঠ্যাবস্থায় আমি তাঁর স্নেহের পাত্র ছিলাম। বহুকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই! এতোকাল পরে হঠাৎ দেখে না চিন্‌তেও পারেন! নিতান্ত কৌতূহলবশেই আমার পরিচয় দিতে নারাজ হই। যখন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি তাঁর লাইব্রেরী ঘরে ছিলেন। বাইরে এসে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে সেই ঘরে নিয়ে বসান। একথা-সেকথার পর একটি ছেলের কাছে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস

করেন। সে বলে—"ইনি আপনাকে চেনেন!" অধ্যাপক জোয়ারদার এতে একটু বিস্ময় বোধ করেন। আমি তখন বলি,—"ননীদা,' আপনি আমাকে বিশেষভাবেই চেনেন, তবে অনেককাল দেখাসাক্ষাৎ না হওয়ায় ও চেহারারও অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়ায় আপনি আমাকে চিন্‌তে পারছেন না! আপনাকেও হয়তো আমি চিন্‌তে পারতাম না যদি না জান্‌তাম যে আপনি এখানে কোনো এক কলেজে কাজ করেন।"

তারপর আমার নাম ব'ল্‌তেই তিনি আমাকে চিনে ফেলেন এবং পূর্ব্বের সেই পল্লী জীবনের অনেক কথাই আমাদের উভয়ের মধ্যে আলোচিত হয়। আমাকে পূর্ব্বের মতোই স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আপ্যায়িত করেন। ননীদার স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি ক্রিশ্চিয়ানমতে এক মার্কিন মহিলার পানিগ্রহণ করেন। তাঁকেও দেখলাম, তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগ হয় নি অথবা ননীদা' ইচ্ছে ক'রেই লজ্জায় বা সঙ্কোচে আলাপ করিয়ে দেন নি। তাঁর বাড়ীর আদবকায়দা, খানাপিনা, সবই সাহেবী ধরণের। তবে তিনি বাঙালী বেশভূষারই পক্ষপাতী, অন্ততঃ বাইরের আবরণটা ঐ রকম!...সেদিনকার মতো আমরা ফিরে আসি। পরে একদিন আমি একা তাঁর বাড়ীতে যাই। তিনি তাঁর লেখা-টেখা দেখান! তিনি বর্ত্তমানে মহাভারত, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা ক'রছেন! একদিন তিনিও আমার বাসায় আসেন। উঠ্‌বার সময় অনুরোধ জানান আমার মেয়েকে নিয়ে যেন একদিন তাঁর বাসায় যাই। কিন্তু দেশে ফিরবার আগে নানাকারণে বিব্রত থাকায় তাঁর সে অনুরোধ আমি রাখ্‌তে পরি নি।

লক্ষ্ণৌয়ে ছিলাম মাত্র দু'মাস। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা আবার গরমকাল —এপ্রিল ও মে। ও দেশের গরম যে কি বস্তু তা' বাংলা দেশের লোকেরা ঠিকমতো ধারণা ক'রে উঠতে পারে না। বিশেষ ক'রে

যারা অভ্যস্ত নয় তাদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই! ওদেশে 'লু' ছোটে। 'লু' একটা গরম হাওয়া—এ'র উৎপত্তিস্থল রাজপুতানার থর মরুভূমি। কিন্তু জয়পুরে প্রায় দু'বছর কাটিয়ে এলাম অথচ লক্ষ্ণৌয়ের মতো গরম-ভোগ সেখানে ক'রতে হয় নি। বেলা ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘরের বাইরে যাবার উপায় নেই! তবে যেদিন 'অন্ধী' অর্থাৎ বৃষ্টিহীন ঝড় উঠ্‌তো সেদিন একটু ঠাণ্ডা হ'তো। ওদেশের প্রত্যেক লোকই পকেটে একটা ক'রে খোসাছাড়া পেঁয়াজ রেখে দেয়। পেঁয়াজ নাকি 'লু'র প্রতিষেধক। পকেটের ঐ পেঁয়াজ শুকিয়ে গেলেই বুঝতে হবে আর ভয় নেই। ঐ সময় প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই খস্‌খসের পর্দ্দা! তার ওপর মাঝে মাঝেই জল ছিটিয়ে দিতে হয়। তা' থেকে মনমাতানো একটা সুগন্ধ বা'র হয় আর গরমের মাত্রা আশ্চর্য্যরকম ক'মে যায়!

আমি যে বাড়ীতে ছিলাম সেখানে খস্‌খস্ বা পাখা কোনো কিছুরই বন্দোবস্ত ছিলো না। আমার মেয়ে ব্রজেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে পাখার তলায় বেশ ঠাণ্ডায় থাকতো। কিন্তু আমার যন্ত্রণার লাঘব হবার কোনোই উপায় ছিলো না। দুপুরে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দিতে হ'তো। আহারাদির পর আমি শিয়রে একটা টবে ক'রে জল রাখ্‌তাম। তক্তপোষের ওপর একখানা মাদুর পাতা ছিলো। একখানা বড়ো গামছা ভিজিয়ে তার ওপর বিছিয়ে নিয়ে শু'তাম আর একখানা বড়ো গামছা ভিজিয়ে গায়ের ওপর দিতাম। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে দু'খানাই একেবারে শুকিয়ে যেতো, আবার ভিজিয়ে নিতাম! এই রকম ক'রতে হ'তো বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত! ঐ সময় কলের জলে স্নান ক'রবার উপায় ছিলো না। কল খুলে তার নীচে ব'স্‌লেই গা পুড়ে যেতো। তবে টবে ক'রে জল কিছুক্ষণ রাখবার পর ঠাণ্ডা হ'তো। সেই জলে স্নান ক'রতাম। দু'মাস এই

দুঃসহ কষ্ট ভোগ ক'রবার পর জুনমাসের প্রথম হপ্তায় এক সন্ধ্যায় পাঞ্জাব এক্স্‌প্রেসযোগে মেয়েকে নিয়ে বাংলার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করি। ষ্টেশনে আমাদের See off ক'রতে এসেছিলো ধ্রুবকিশোর আর বিজয় বাবু নামে আমাদেরই এক প্রতিবেশী। ধ্রুবকিশোরের ঋণ জীবনে শুধ্‌তে পারবো না! পরের জন্য কে কবে এতোটা ক'রে থাকে? লক্ষ্ণৌয়ে থাকাকালীন সে আমার জন্য যা' ক'রেছে আপন সহোদর তার চেয়ে বেশী করে না!

(২২)

পুরোপুরি দু'বছর পরে দেশে ফিরছি! স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের পুলক আমার মেয়ের প্রতি গতিচ্ছন্দে ফুটে উঠ্‌ছে! আমার মাঝে হরষ-বিষাদের একটা সংমিশ্রণ অনুভব ক'রছি, কেন না একদিকে ঘরে ফেরার আনন্দ, অপর দিকে বন্ধুদের ছেড়ে যাবার ব্যথা আমার ছিলো। বন্ধু-ভাগ্যটা নাকি আমার খুবই আছে—অনেকে বলে। সেটা মিথ্যেও নয়। প্রবাসজীবনে আমি যে-সকল বন্ধুর প্রীতি-ভালোবাসা লাভ ক'রেছি তারা আমার নিতান্ত 'আপনার জন' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ভালোবাসা আভিধানিক শব্দমাত্র নয়, ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ সত্যরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। 'গোপালদা' 'ধ্রুবকিশোর,' 'শৈলেন'—এরা সকলেই আমার দরদী বন্ধু! এদের কাছ থেকে আমি যে সত্যিকার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছি তা' যদি আমি ভুলে যাই তবে আমাতে ও পশুতে প্রভেদ কি? অযাচিতভাবে কতো উপকারই না পেয়েছি ওদের কাছ থেকে! কিন্তু আমার কাছ থেকে তারা কি পেয়েছে তা' তারাই ব'ল্‌তে পারে! তবে লাভের অংশটা যে আমারি বেশী এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।......সিটি প'ড়তেই ধ্রুবকিশোর ও বিজয় বাবু আমাকে প্রণাম ক'রে গাড়ী হ'তে নেবে যায়।

গাড়ী প্লাটফরম্‌ ছেড়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে প'ড়েছে, তখনো দেখি ওরা দাঁড়িয়ে! গাড়ীতে বাঙালীযাত্রী আমি আর আমার মেয়ে ছাড়া কেউ ছিলো না। তবে গাড়ীতে স্থানের কোনোই অসুবিধে হয় নি। একখানা বেঞ্চের অর্দ্ধেকটা জুড়ে বিছানা পেতে আমরা ব'সেছি! পাঞ্জাব এক্স্‌প্রেস্‌! তীরের মতো ছুটছে! অযোধ্যায় যখন এসে

পৌঁছি তখন রাত্রি অনুমান বারোটা। এই ষ্টেশন থেকে অনেক যাত্রী গাড়ীতে ওঠে তবে তাদের অধিকাংশই বিনামাশুলের যাত্রী! যাত্রীদের মধ্যে একটি ছোক্‌রাকে দেখেই কেন যেন আমার মন বিতৃষ্ণায় ভ'রে ওঠে! কুৎসিত আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু কুরূপ সজ্জার বাহুল্যে কী যে রুচিবহির্ভূত হ'য়ে ওঠে এ যেন একে দেখ্‌বার আগে আর কখনো বুঝিনি। কালো জৌলুসহীন গায়ের রঙে পাউডারের সাদা যেন দাঁত খিঁচিয়ে তাকে উপহাস ক'রছে। গালভর্‌তি পান বেরিয়ে-আসা দু'টো দাঁতকে যেন রক্তলিপ্ত শ্বাপদের দাঁতের মতো ক'রে তুলেছে! কোটরগত দু'টো চোখে স্বাস্থ্যের কোনো দীপ্তিই নেই! গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবীর ঝিলিমিলির ফাঁকে ফাঁকে বুকের হাড়গুলো যেন কে কার আগে ফুটে বেরুবে তার জন্য বাজি রেখেছে! মাথার চুলের বিরলতা ও কটাভাব তার সুগন্ধি তৈলপ্রলেপকে যেন ঠাট্টা ক'রছে! পরণে অতি-মিহি ধুতি, পায়ে দামী জুতো—সবই যেন তার শ্রীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রেছে! মাঝে মাঝে এক একবার যখন মনের কোনো গোপন আনন্দের তাগিদে সে তান ধ'রছিলো তখন সেই সুরের বেসুরো ধারা আমাকে পাগল ক'রে তুল্‌ছিলো! যখন এই অপরূপ সুর-সাধনায় সে মুখ খুল্‌ছিলো তখন রক্তিম দন্তপংক্তি দেখে মনটা ঘৃণায় যেন রি-রি ক'রছিলো। আমি দেখেছি, মানুষকে সকল অবস্থায় সহ্য ক'রবার মতো শিক্ষা আমার প্রকৃতিতে ঘটে নি!

এ ছোক্‌রাটি যা ক'রছিলো তার মাঝে তার গানটুকুতে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো' ধরণের ভাব! সে হয়তো কোনো শেঠজীর ভাগ্যবান্‌ পুত্র! রূপ না পেলেও 'রূপেয়াকা ওয়াস্তে' যে আত্মপ্রকাশ পেয়েছিলো তাতে ঐ বসনভূষণের বীভৎস বাহুল্যে শুধু

গান কেন, নৃত্যও মস্‌গুল হ'তে পারতো! দশজনের অকিঞ্চণতা যখন মনের মাঝে দাহ সৃষ্টি করে না, নিজের প্রাচুর্য্যে প্রাণ আবেগময় হ'য়ে ওঠে, তখন নিজের পরিবেশের সর্ব্বত্র কী যেন একটা ছন্দ জাগ্রৎ হ'য়ে যা-কিছু অসঙ্গত ও অসম্পূর্ণ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মুছে ফেলে দেয়! আর এই আবেগধর্ম্মের মজাটাই এই যে এতে এমন একটা গভীর আত্মপ্রত্যয়ের জাগরণ ঘ'টে থাকে যে পারিপার্শ্বিক মহিমার তুলনায় নিজের অগৌরব চোখেই পড়ে না। বিপুল পুলক-স্রোত যেন অশোভনতাকে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লে যায়! নইলে ধনীর জীবনে বিলাস ও ব্যাভিচারের পথ বেয়ে যে হীন রুচিবোধ আর আনন্দের নামে যে কুৎসিত মত্ত প্রমোদ নেবে আসে তার তিরোধান এতোদিন ঘ'টে যেতো! প্রাথমিক অবস্থা পেরিয়ে সভ্যতা কতোদূর অগ্রসর হ'য়েছে, কিন্তু আজও রুচির সার্ব্বভৌমিক জাগৃতি এলো না! কখনো দারিদ্র্যের কশাঘাত, কখনো বা ধনীর প্রাচুর্য্যের পঙ্কিলতা তাকে পর্য্যুদস্ত ক'রে তোলে! কলাকে আশ্রয় ক'রে চিত্ত-লোকের তৃপ্তি তার কিরণচ্ছটায় বিকসিত হ'য়ে ওঠে—একথা শুনেছি বহুবার, কিন্তু আমার বিশ্বাস তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তির অস্বস্তিই মানুষের মাঝে কলাসৃষ্টির অদ্ভুত উত্তেজনা এনে দেয় আর তাতে ক'রেই নৃত্যের নামে লম্ফ-ঝম্ফ, চিত্রের নামে তুলিকার অনর্থক বর্ণ-নিক্ষেপ!

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এ'র মাঝেই ঐ সজ্জিত ধনী দুলালের সাথে রীতিমতো আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন। আমি তাঁর এমন হৃদ্য আত্মীয়তা সৃষ্টি ক'রবার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেলাম! মানুষের বাইরের রূপ বা বেশভূষা ইনি যেন চোখেই দেখেন না। এ লোকটি হয়তো মানুষের মাঝে সেই আত্মমমত্ব লক্ষ্য ক'রেছেন যাকে পেলে ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হ'য়ে যায়। ভদ্রলোকের উচ্ছ্বাসের মাঝেও উচ্চাঙ্গের

সঙ্গতি। যা-কিছু বলেন, যা-কিছুর আভাস দেন তার মাঝে বেশ গোছালো সাবলীল একটা বিচারনিষ্ঠতা ফুটে বেরোয়। আমি তখন শুনছি—"আচ্ছা বাপ্, তুম্ তো তুম্‌কো মাইয়াকো খোয়ায়া, অভ্ তুম্‌কো কোন্ দেখ্‌তী হৈ?" উত্তরে বেশ করুণ ভাষায় জবাব এলো, "বাপুজী হৈ, ফুপু হৈ, চাচী হৈ—ইয়ে সবকোই মুঝে বহুৎ প্যার করতে হৈঁ! তভ্‌ভী হরবকৃত্ মুঝে মাইয়াকো ইয়াদ আতা হৈ। মৈ ছোটাসে দুবলা হুঁ অর্ মুঝ্‌কো দেখ্‌নেভী বুরা লাগ্‌তা হৈ। কুছ কাম করণেভী নহী সক্‌তা হুঁ। মগর কল্‌কত্তামে হমারা যে business হৈ বহ্ দেখ্‌নেকে লিয়ে অভ্ মুঝে জানে পড়েগা।" আমাদের প্রত্যেকের মনেই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়া একটা বিশ্বগণ্ডী লুকিয়ে থাকে তার মাঝে বাইরের যে বস্তু কখনো কখনো অপ্রীতিকররূপে দেখা দেয় তার সাথে আবার নবরসের মিষ্টতায় ঘনিষ্ঠতা জন্মে!

এই ছোক্‌রাও যেন আমার মনটির কোনো এক রহস্যপথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে একেবারে ঠিক ভেতরটিতে আসন পেতে নিলো! একবার যখন তাকে ভালো লাগ্‌লো তারপর যেন তার রূপহীনতা আর বাভৎস হ'য়ে চোখে লাগ্‌লো না—বিবাদ-ব্যথার কোনো দরদীর সন্ধান পেলেই আমাদের চিত্ততাপও যেন মনের অবসাদ-বিরাগ সব-কিছুকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিয়ে যায়! কী একটা সহানুভূতি সারা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌লো! প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব'লছিলেন, "অভ্ এক কাম কীজিয়ে বাপ্। দেখো, সারা দুনিয়ামে আদমী সব কিত্‌নে দুখ্ পাতা হৈ! উস্‌কো সাথ্ তুম্‌হারা দিল্ মিলায়া দোও। উসিসে সব কুছ্ দুখ্ চলা জায়গা!" ও তখন বলে "দেনেকে লিয়ে মেরা কুছ্‌ভী নহী! ক্যা দেগা বহ

জীবনভর্ কুছ্‌ভী যো নহী পায়া?" এ কথাটা আমার যে কী ভালো লাগ্‌লো! এ ছেলেটি তার বিদ্যাহীনতার কথা ব'লেছে, কিন্তু বুঝ্‌লাম দুঃখের মূল্যে ও যে শিক্ষা লাভ ক'রেছে তার তুলনা হয় না!

আমি যা পারিনে অন্যে তা' পারলে একটা বিদ্বেষ উদ্রিক্ত হ'য়ে ওঠে! নিজের দুর্ব্বলতা নিজের কাছে ধরা প'ড়বার চেয়ে খেদকর আর কিছু হ'তে পারে না! এ ছেলেটার সাথে ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোক যে সহজ প্রীতিতে আলাপ ক'রে চ'লেছেন এতে তাঁর একটা বিশেষ মহিমা শরতের সাদা মেঘে-ঢাকা রবির মতো ম্লান স্নিগ্ধতায় কিছুকাল মুহ্যমান থেকে হঠাৎ যেন ছড়িয়ে প'ড়লো! আর আমি তাঁর পাশে কালো তমসার টুক্‌রোটির মতো ব'সে রইলাম। জীবনে আলো-আঁধার বা'র থেকে না ভেতর থেকে এসে আমাদের চিত্তকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তোলে তা' কিন্তু চিরদিনই জটিল প্রশ্ন হয়ে রইলো—সহজভাবে আমরা ব'লে ফেলি, মনের আঁধার বড়ো গোল পাকিয়ে তোলে। কিন্তু বাইরের সমাগমও তো একেবারে নস্যাৎ ক'রবার মতো নয়! আমি যে ঐ হিন্দুস্থানী প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির মতো স্ফূর্ত্তিযুক্ত চিত্তে আলোকোৎসব ঘটাতে পারিনে এতে মনের অপরাধ আছেই তো! আবার বারবার ক'রে যে বাইরের সংস্পর্শ ঘটে তা' রোধ করি কি ক'রে? দীর্ঘদিন যে পরিবেশে, যে বিশেষ রুচিতে আমার দিন কেটেছে তাতে কুৎসিতকে কুৎসিততর ক'রে দেখা আর উপহাস করা যেন সহজতম কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো! মনের মধুর বৃত্তিও শুধু পারিপার্শ্বিকতার বিষে আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে! নিজের জীবনের অপূর্ণতা, নীচতা আর অনাত্মীয়তা আমাকে বড়ো পীড়িত ক'রে তুল্‌লো। আমি শুধু এই দু'টি বিপরীত বয়োধর্ম্মীর সহজ হৃদ্যতা ঈর্ষাদগ্ধচিত্তে উপভোগ ক'রতে লাগলাম! যখন গাড়ী বেনারস

ষ্টেশনে এসে পৌছে তখন মুখ বাড়িয়ে শুধু খুঁজ্‌তে থাকি যদি কোনো বিদেশী বাঙালী বান্ধব সহযাত্রী হয়! ওখানে বাঙালীর আবির্ভাব যেরূপ ঘ'টেছে তাতে আমার আশাপূরণ অসম্ভব হবে না—এ যেন বিশেষ ধারণা হ'য়ে গেলো।

আমি যেদিকে তাকিয়ে ছিলাম তার বিপরীত দিক থেকে মচ্‌মচ্‌ ক'রে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি বাঙালী, সুবেশী। বয়সে প্রবীন—একটা স্নিগ্ধ মানবত্বের কিরণমালা ঠিক যেন তাঁকে ঘিরে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে! আমি অতি সহজেই মিলে যেতে পারতাম যদি না আমার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা বিষ লুকিয়ে থাকৃতো যা অনর্থক সন্দেহ ক'রে মানুষের সহৃদয়তাকে প্রলাপের মতো ক'রে দেখে! তাইতো যখন সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও ধনী দুলাল সহস্র অবান্তর কিন্তু রসময় ব্যক্তিগত জীবন-বিবৃতিতে মস্‌গুল, আমি তখন শুধু নীরব একাকিত্বের ভারী বোঝা ব'য়ে সময় কাটাচ্ছি! আমার যেন কী হ'য়েছে! যেন একঘ'রে হ'য়ে শুধু নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মিলে-মিশে আত্মীয় হবার স্বপ্ন দেখে দেখে সময় কাটাচ্ছিলাম, কিন্তু তবু আমার দূরত্বের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রবার মতো যেন যোগ্যতা আমার নেই! দূর হ'তে তাই নবাগত ভদ্রলোককে মনে মনে কামনা ক'রছিলাম, কিন্তু তাঁকে পাশে বসিয়েও সহজে আলাপ জমাতে পারলাম না। তাঁকে ঘিরে এমন একটা শ্রী ও সমীহার ভাব র'য়েছে যে তাঁকে না মেনে উপায় নেই। একটা মন ব'ল্‌ছিলো—'এঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব সহজ ক'রে নাও'। আর একটা মন তখন ব'ল্‌ছিলো—'ওরে বাস্‌রে! এঁর সাথে আলাপ জমানো?' আমার ভাগ্য যেন হঠাৎ প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো—ভদ্রলোক নিজের থেকেই আলাপ আরম্ভ ক'রলেন! পরিচয়ে জানালেন, তিনি ওখানকার একজন

ডাক্তার। তাঁর সব আলোচনার খুঁটিনাটি আজ মন থেকে লোপ পেয়েছে।

তবে একটা কথা আজও মনের মাঝে স্পষ্ট খুঁজে পাই। সেটা হ'চ্ছে তাঁর কথা ব'ল্‌বার অপূর্ব্ব ভঙ্গী। সাধারণ লোক হ'য়েও মানুষের মাঝে সম্মানের আসন পেতে এঁর একটুও দেরী হয় না। তাঁর মুখে গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি! এদিকে যে হাওড়ার কাছাকাছি এসে প'ড়েছি সে খেয়ালই নেই। আমার মেয়ে ঘুমিয়ে ছিলো। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যেতেই আমাকে জিজ্ঞেস করে, "বাবা, এখন আমরা কোন্ ষ্টেশনে এসে পৌছবো?" মেয়ের এই প্রশ্নে আমার চমক ভাঙ্‌লো। আমি বলি, "তাইতো মা, আমার তো খেয়ালই নেই! দেখি, কোথায় এলাম?" বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি আমরা বালি ষ্টেশন ছাড়িয়ে গেছি! ওই যে বেলুড়ের নতুন কারখানাটা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে লিলুয়াও ছেড়ে যায়! যে যার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নেয়। আমরাও আমাদের বাক্স-বিছানা এক জায়গায় গুছিয়ে রেখে কুলীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। গাড়ী গিয়ে প্লাট্‌ফরমে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই কুলীপ্রভুদের ছুটোছুটি সুরু হয়েছে। গাড়ী গিয়ে ষ্টেশনে থামে। বহু যাত্রী নেবে যায়। ভিড় একটু ক'মে গেলে আমরা নেবে পড়ি। কুলী মালপত্র নিয়ে আমাদের সাথে বাইরে আসে। কুলীর পাওনা চুকিয়ে দিয়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে দাদার বাসায় গিয়ে উঠি। যেদিন ক'ল্‌কাতায় পৌছি তার দু'দিন পরেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানির যুদ্ধ ঘোষিত হয়। আরো মাসকয়েক পরে জাপান মার্কিন ও বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।